রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক চৌদ্দ বৎসর বয়সে
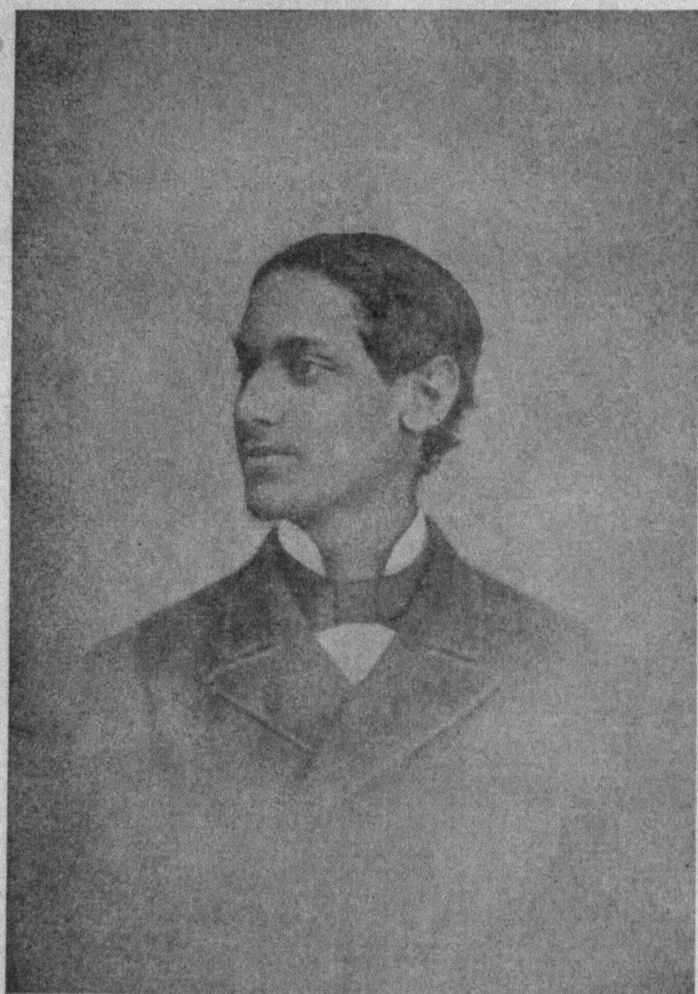
রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথ

সতেরো বৎসর বয়সে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অচলিত সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

সূচীপত্র

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ভূমিকা

আমার রচনার আবর্জিত অংশ অনেক দিন আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছিলুম। তার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক। এক সময়ে বালক ছিলুম, তখনকার রচনার স্বাভাবিক অপরিণতি দোষের নয়, কিন্তু সাহিত্যসভায় তাকে প্রকাশ্যতা দিলে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তার লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, তার মধ্যে যে একটা বয়স্কের অভিমান দেখা দেয় সেটা হাস্যকর, কেননা সেটা কৃত্রিম। স্বাভাবিক হবার শক্তি পরিণত বয়সের, সে বয়সে ভুলচুক থাকতে পারে নানা রকমের, কিন্তু অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেকে পরের মুখোশে হাস্যকর করে তোলা তার ধর্ম নয়— অন্তত আমি তাই অনুভব করি। যে বয়স থেকে নিজের পরিচয় আমি নিজের স্বভাবেই প্রতিষ্ঠিত উপলব্ধি করেছি সেই বয়স থেকেই আমি সাহিত্যিক দায়িত্ব নিজের ব'লে স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বিচারসভায় আত্মসমর্পণ করতে আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম।

প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার জন্যেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে। প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছোয় নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাস্‌পোর্ট্‌ পেয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে কবির কৈশোর ও যৌবনের রচনা কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশকালানুক্রমে সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে "অচলিত-সংগ্রহ"। এই গ্রন্থগুলি অধিকাংশই পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। বর্তমানেও এগুলি আর চলিত ছিল না; অপরিণত রচনা মনে করিয়া কবি এগুলি বর্জন করিয়াছিলেন, এবং এই "অচলিত" রচনাগুলি আর প্রচলিত না হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে সুতীব্র বিরাগ তিনি নানা উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলী-প্রকাশের উদ্যোগকালেও তিনি একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

'বিশ্বভারতী-গ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলী আমার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ, যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে, কিন্তু তার চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতের ঘ'ষে-যাওয়া তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্তযুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করবে বসে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না। কেননা, যে বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ করবার মতো আব্রু নেই।'...

কবির সকল রচনা প্রকাশ করিতে উৎসুক বন্ধুদের পরিহাস করিয়া কিছুকাল পূর্বে একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন—

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারি দিক হতে গর্জন করি উঠে,
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে ?
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।'

ইতিহাস বুড়ো বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা—
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয় খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালো-মন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।
সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপা-যন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণ-পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা!

এই রচনাগুলি সম্বন্ধে কবির বিতৃষ্ণা ও ঔদাসীন্য কিরূপ সুগভীর তাহাই জানাইবার জন্য এই পত্র ও কবিতা উদ্‌ধৃত করিলাম; এগুলি পুনঃপ্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই। এখন আমাদের তরফ হইতে কৈফিয়ৎস্বরূপ দু-একটা কথা বলি।

ইতিহাসের খাতিরেই যে এই বর্জিত রচনাগুলি পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়াছি তাহা নয়— যদিও তাহা করিলেও অন্যায় হইত বলিয়া মনে করি না; এই রচনাগুলি যে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়াই প্রয়োজনীয়, যে বয়সে এগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন সে বয়সের পক্ষে আদৌ বিস্ময়কর নয়, এমন নহে; এগুলির রচনাকালে বাংলা-সাহিত্য উৎকর্ষের যে পর্যায়ে ছিল তাহার পক্ষে এগুলির অধিকাংশই পরম বিস্ময়, এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন রবীন্দ্রনাথকে জয়মাল্য পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাব-ঐশ্বর্যের দিক দিয়াও এগুলি যে রচয়িতার দীনতাই ঘোষণা করিতেছে, এমন কথা অনেক পাঠকই মনে করেন না। এ-রচনাগুলির ‘শিল্প-আবরণ’ আজ ‘জীর্ণ’ মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহার বাণী যে সম্পূর্ণ ‘অর্থভ্রষ্ট’, রসহীন ‘মরুপ্রদেশ’, কবির

এ কথা মানিয়া না লইবার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন্ অংশ বর্জনীয়, কোন্ দান শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহার বিচার-ভার কবিকে দিলে সুবিচার হইবে মনে করি না, আমরা নিজেরাও সে ভার গ্রহণ করি নাই— ভাবী কালের উপরে রাখিয়াই এই গ্রন্থগুলি সংকলন করা হইল।

এই খণ্ড -সম্পাদনায় সহযোগিতা করিয়া শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই খণ্ডের ভূমিকা ও গ্রন্থপরিচয় তাঁহাদের রচনা।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

এই খণ্ডগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বর্জিত রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অচলিত সংগ্রহ'। ইহার দুই ভাগ; পুস্তক বা পুস্তিকা আকারে যেগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং লেখকের ইচ্ছায় পরবর্তীকালে আর মুদ্রিত হয় নাই। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা অনবধানবশতই কোনো পুস্তকসংগ্রহে স্থান পায় নাই, এই অংশে তেমন রচনাও থাকিবে। দুই-একটি পুস্তক পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত বা পরিবর্জিত-পরিবর্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিরও মূল সংস্করণ এই অংশে স্থান পাইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগে সেই সকল রচনা থাকিবে যাহা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার গৌরব লাভ করে নাই। ইহার অধিকাংশই লেখক স্বয়ং বর্জন করিয়াছেন, তবে কয়েকটি এমন রচনাও আছে যাহা নিতান্ত ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছে।

রচনাবলীতে এই উভয় শ্রেণীর বর্জিত রচনা সংকলন করার বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক যুক্তি দিয়াছেন, সকল যুক্তি মানিয়া লইয়াও যে আমরা তাঁহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিতেছি তাহার একমাত্র কারণ— এই রচনাবলীকে সমগ্র রচনাবলী করার ঐকান্তিক ইচ্ছা। অপরিপুষ্ট ও অবাঞ্ছিত রচনার প্রকাশে আর যাহারই ক্ষতি হউক, রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। তা ছাড়া, বহু পাঠককে আমরা আক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; এগুলি এখন অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। তাঁহাদের আক্ষেপ-মোচনও এই পরিশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশের অন্যতম কারণ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারি দিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার

পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে ; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যাঁরা বাইরে থেকে সন্ধান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না। মনের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যখন ফুল ফোটায় ফল ফলায় তখন সেইটের আবেগ ও বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ। তার মাঝে মাঝে সময় আসে যখন ফলন যায় কমে, যখন হাওয়ার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রেরণা হয় ক্ষীণ। তখন ইতস্তত যে ফসলের চিহ্ন দেখা দেয় সে আগেকার কাটা শস্যের পোড়ো বীজের অঙ্কুর। এই অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উঞ্ছবৃত্তির ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যাঁরা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা। কিন্তু ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।

'ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক, কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

'আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা, রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব কিছুকে নির্বিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিত্তের যে-একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।

'একেবারে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে নিয়েই আঁট করে তোড়া বাঁধতে হবে এ কথা আমি বলি নে। একটা আদর্শ আছে সেটা নিছক পয়লা শ্রেণীর আদর্শ নয়, সেটা সাধারণ চলতি শ্রেণীর আদর্শ। তার মধ্যে পরস্পরের মূল্যের কমিবেশি আছে। রেলগাড়িতে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয়, কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা সকলেই রক্ষা করেছে। যারা অসম্পূর্ণ, কারখানা-ঘরের বাইরে তাদের আনা উচিত হয় না। কিন্তু তারা যে অনেক এসে পড়েছে তা এই বইয়ের গোড়ার দিকের কবিতাগুলি দেখলে ধরা পড়বে। কুয়াশা যেমন বৃষ্টি নয়, এরাও তেমনি কবিতা নয়। যাঁরা পড়বেন তাঁরা এই-সব কাঁচা বয়সের অকালজাত অঙ্গ-হীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় তো হাসবেন তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভই শেষ নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই বইয়ে যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।

'সাহিত্যরচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। তাদের সবাইকে একত্রে এলোমেলো বাড়তে দিলে সবারই ক্ষতি হয়। মনে আছে এক সময়ে বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয় নি। তিনি আমার যে-সব গানকে তলব দিয়ে বিচারকক্ষে দাঁড় করিয়ে-ছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার 'পরে। তারা সেই পরিণতি পায় নি যার জোরে গীতসাহিত্য-সভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের সরিয়ে আনতে গেলে ইতিহাস আপন পুরাতন দাবির দোহাই পেড়ে আপত্তি পেশ করে।

'আজ যদি আমার সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত হয়ে থাকে তবে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি আপন আপন স্থান পাবে এ

কথা মানা যেতে পারে। তারা সবাই মিলেই সমষ্টির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কেবল যাদের মধ্যে পরিণতি ঘটে নি তারা কোনো-এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়; সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।'

উপরের উদ্‌ধৃতির মধ্যেই এই-সকল অপরিণত, অপরিপক্ক রচনার জন্য পাঠকসমাজের কাছে কবির কৈফিয়ৎ আছে। অচলিত ভাগের বিবিধ খণ্ডগুলির জন্য এই কৈফিয়ৎ বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য।

বর্তমান খণ্ডে 'কবি-কাহিনী', 'বন ফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কাল-মৃগয়া', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'নলিনী' ও 'শৈশবসঙ্গীত' মুদ্রিত হইল। প্রত্যেকটিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই খণ্ডের পরিশিষ্টে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল; এই পুস্তকের বর্তমান সংস্করণ মূল রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত পাঠভেদ সম্বন্ধে এখানে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রিকার সহিত মিলাইয়া এই পুস্তকের স্থানে স্থানে স্পষ্ট মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য।

পৃ. ১০৯, পঙ্‌ক্তি ১৬—

পুস্তকে 'উল্লাসে হৃদয় আর উঠে না নাচিয়া!' আছে। আমরা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে মুদ্রিত পাঠ 'উল্লাসে শোণিত রাশি উঠে না নাচিয়া!' গ্রহণ করিয়াছি।

কবি-কাহিনী

কবি-কাহিনী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

ও

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

মেছুয়াবাজার-রোডের ৪১ সংখ্যক ভবনে

সরস্বতী যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩৫।

কবি-কাহিনী।

প্রথম সর্গ

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।
একাকী আপন মনে সরল শিশুটি
তোমারি কমল-বনে করিত গো খেলা,
মনের কত কি গান গাহিত হরষে,
বনের কত কি ফুলে গাঁথিত মালিকা।
একাকী আপন মনে কাননে কাননে
যেখানে সেখানে শিশু করিত ভ্রমণ ;
একাকী আপন মনে হাসিত কাঁদিত।
জননীর কোল হোতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা—
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
বিজন কুলায়ে বসি গাহিত বিহঙ্গ,
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি,
কামিনীর গাছ হোতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা !
প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণকিরণে

বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু-জলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
নিশা তারে ঝিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,
স্নেহময়ী মাতা যথা সুপ্ত শিশুটির
মুখপানে চেয়ে চেয়ে করেন চুম্বন।
প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
উষা তার সুখনিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে।
এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা-বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
কবির বালক-কাল হইল বিগত।

—

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল
কহিত প্রকৃতিদেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরমবারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।
তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।
যখনি রজনীমুখ উজলিত শশী,
সুপ্ত বালিকার মত যখন বসুধা
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে,
বসিয়া তটিনীতীরে দেখিত সে কবি—
স্নান করি জোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশ, হাসে নিম্নে স্রোতস্বিনী;
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে।
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে—
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি-পানে,
কাঁটা খোঁচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের 'পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্রচক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র

পড়ি দেয় সমুদয় জগতের 'পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত ;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন ;
ওই শুভ্র নদীজলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশসলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ ;
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,
জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সেই কবি ভাবিত কত কি।
হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা-পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবীদেবী, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু-হৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত সমীরণ
হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্ব্বতগহ্বর,
সকলি কবির ছিল সাধের বসতি।
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল
কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কনককিরণময় উষার জলদে

একাকী পাখীর সাথে গাইতে কি গীত
তাই শুনি যেন তার ভাঙ্গিত গো ঘুম !
অনন্ত-তারা-খচিত নিশীথগগনে
বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর গান,
তাহাই শুনিয়া যেন বিহ্বলহৃদয়ে
নীরবে আকাশ পানে রহিত চাহিয়া।
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীরতলে বাজাইত বাঁশী
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।
নিশার আঁধার-কোলে জগৎ যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে
তখন সে কবি উঠি তুষারমণ্ডিত
সমুচ্চ পর্ব্বতশিরে গাইত একাকী
প্রকৃতিবন্দনাগান মেঘের মাঝারে।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না,
কেবল আকাশব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
এক দৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
কেবল, পর্ব্বতশৃঙ্গ করিয়া আঁধার,
সরল পাদপরাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান ;
কেবল সুদূর বনে দিগন্তবালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনিরূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর গীতি-সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সমুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথবায়ু কাঁপাত পল্লব।
গম্ভীরে গাইত কবি— "হে মহাপ্রকৃতি,
কি সুন্দর, কি মহান্ মুখশ্রী তোমার,

শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতিদেবি
কি কবিতা লিখেছ যে জলন্ত অক্ষরে,
যত দিন রবে প্রাণ পড়িয়া পড়িয়া
তবু ফুরাবে না পড়া ; মিটিবে না আশ !
শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্বচরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন !
সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,
দুরন্ত শিশুর মত অনন্ত আকাশে
করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন,
স্তনদানে পুষ্ট করি তুমি তাহাদের
অলঙ্ঘ্য সখ্যের ডোরে দিলে গো বাঁধিয়া।
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সে কি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায় ;
এ মহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হোয়ে রহে অনন্ত আকাশে !
অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সময়,
যা ভাবিতে পৃথিবীর কীট মানুষের
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হোয়ে পড়ে ভয়ে সঙ্কুচিত,
তাহাই তোমার দেবি সাধের আবাস।
তোমার মুখের পানে চাহিতে হে দেবি

ক্ষুদ্র মানবের এই স্পর্দ্ধিত জ্ঞানের
দুর্ব্বল নয়ন যায় নিমীলিত হোয়ে।
হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেখি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা!
প্রকৃতি জননি ওগো, তোমার স্বরূপ
যত দূর জানিবারে ক্ষুদ্র মানবেরে
দিয়াছ গো অধিকার সদয় হইয়া,
তত দূর জানিবারে জীবন আমার
করেছি ক্ষেপণ আর করিব ক্ষেপণ।
ভ্রমিতেছি পৃথিবীর কাননে কাননে—
বিহঙ্গও যত দূর পারে না উড়িতে
সে পর্ব্বতশিখরেও গিয়াছি একাকী;
দিবাও পশে নি দেখি যে গিরিগহ্বরে,
সেখানে নির্ভয়ে আমি করেছি প্রবেশ।
যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বতচূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা-দেশে,
তুষারসঙ্ঘাতরাশি পড়েছে খসিয়া

শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।
অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর 'পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকসিত।
এমন নীরবে বায়ু যেতেছে বহিয়া,
নীরবতা ঝাঁ ঝাঁ করি গাইছে কি গান—
মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।
কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষায়,
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত
আধঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি!
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ-বালারে—
যে দিকে দক্ষিণবধূ ফেলেন নিশ্বাস,
সে দিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সে দিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সে দিকে বসন্ত-লক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া।
কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমাশর্ব্বরী—
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্ব্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথলে জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটীর।
হে প্রকৃতিদেবি তুমি মানুষের মন
কেমন বিচিত্র ভাবে রেখেছ পূরিয়া,
করুণা, প্রণয়, স্নেহ, সুন্দর শোভন—
ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য্য আদি সমুচ্চ মহান্—
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি ভয়ানক ভাব,
নিরাশা মরুর মত দারুণ বিষণ্ণ—

তেমনি আবার এই বাহির জগৎ
বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত।
তোমার বিচিত্র কাব্য-উপবন হোতে
তুলিয়া সুরভি ফুল গাঁথিয়া মালিকা,
তোমারি চরণতলে দিব উপহার!"
এইরূপে সুনিস্তব্ধ নিশীথ-গগনে
প্রকৃতি-বন্দনা-গান গাইত সে কবি।

দ্বিতীয় সর্গ

"এত কাল হে প্রকৃতি করিনু তোমার সেবা,
তবু কেন এ হৃদয় পূরিল না দেবি?
এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?
মনের মন্দির মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া—
কত দিন বল দেবি রহিবে এমন শূন্য,
তা হোলে ভাঙিয়ে যাবে এ মনোমন্দির!
কিছু দিন পরে আর দেখিব সেখানে চেয়ে
পূর্ব্ব হৃদয়ের আছে ভগ্ন-অবশেষ,
সেই ভগ্ন-অবশেষে— সুখের সমাধি'পরে
বসিয়া দারুণ দুখে কাঁদিতে কি হবে?
মনের অন্তর-তলে কি যে কি করিছে হুহু,
কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে,
সে শূন্য পূরাতে দেবি ঘুরেছি পৃথিবীময়
মরুভূমে তৃষাতুর মৃগের মতন।
কত মরীচিকা দেবী করেছে ছলনা মোরে,
কত ঘুরিয়াছি তার পশ্চাতে পশ্চাতে,

অবশেষে শ্রান্ত হয়ে তোমারে শুধাই দেবি
এ শূন্য পূরিবে না কি কিছুতে আমার ?
উঠিছে তপন শশী, অস্ত যাইতেছে পুনঃ,
বসন্ত শরত শীত চক্রে ফিরিতেছে ;
প্রতি পদক্ষেপে আমি বাল্যকাল হোতে দেবি
ক্রমে ক্রমে কত দূর যেতেছি চলিয়া—
বাল্যকাল গেছে চলে, এসেছে যৌবন এবে,
যৌবন যাইবে চলি আসিবে বার্দ্ধক্য—
তবু এ মনের শূন্য কিছুতে কি পূরিবে না ?
মন কি করিবে হুহু চিরকাল তরে ?
শুনিয়াছিলাম কোন্ উদাসী যোগীর কাছে—
'মানুষের মন চায় মানুষেরি মন ;
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল,
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর,
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা বিশাল মনুষ্য-হৃদি—
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।'
শুনিয়া, প্রকৃতিদেবি, ভ্রমিনু পৃথিবীময় ;
কত লোক দিয়েছিল হৃদি উপহার—
আমার মর্ম্মের গান যবে গাহিতাম দেবি
কত লোক কেঁদেছিল শুনিয়া সে গীত।
তেমন মনের মত মন পেলাম না দেবি,
আমাব প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ,
তাইতে নিরাশ হোয়ে আবার এসেছি ফিরে,
বুঝি গো এ শূন্য মন পূরিল না আর।"
এইরূপ কেঁদে কেঁদে কাননে কাননে কবি
একাকী আপন-মনে করিত ভ্রমণ।

সে শোক-সঙ্গীত শুনি কাঁদিত কাননবালা,
নিশীথিনী হাহা করি ফেলিত নিশ্বাস,
বনের হরিণগুলি আকুল নয়নে আহা
কবির মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
"হাহা দেবি একি হোলো, কেন পূরিল না প্রাণ"
প্রতিধ্বনি হোতো তার কাননে কাননে।
শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা ঝরিতেছে মৃদু মৃদু,
উঠিতেছে কুলু কুলু জলের কল্লোল,
সেথানে গাছের তলে একাকী বিষণ্ণ কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া—
তৃষিত হরিণশিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখপানে চলিয়া যাইত।
শীতরাত্রে পর্ব্বতের তুষারশয্যার 'পরে
বসিয়া রহিত স্তব্ধ প্রতিমার মত,
মাথার উপরে তার পড়িত তুষারকণা,
তীব্রতম শীতবায়ু যাইত বহিয়া।
দিনে দিনে ভাবনায় শীর্ণ হোয়ে গেল দেহ,
প্রফুল্ল হৃদয় হোলো বিষাদে মলিন,
রাক্ষসী স্বপ্নের তরে ঘুমালেও শান্তি নাই,
পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত
এক দিন অপরাহ্ণে বিজন পথের প্রান্তে
কবি বৃক্ষতলে এক রয়েছে শুইয়া,
পথ-শ্রমে শ্রান্ত দেহ, চিন্তায় আকুল হৃদি,
বহিতেছে বিষাদের আকুল নিশ্বাস।
হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে,
"কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।

তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময় ?
কি দুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ ?"
গভীর নিশ্বাস ফেলি গম্ভীরে কহিল কবি,
"প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা ?"
একে একে কত কথা কহিল বালিকা কাছে,
যত কথা রুদ্ধ ছিল হৃদয়ে কবির—
আগ্নেয় গিরির বুকে জ্বলন্ত অগ্নির মত
যত কথা ছিল কবি কহিলা গম্ভীরে।
"নদ নদী গিরি গুহা কত দেখিলাম, তবু
প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না দেবি।"
বালার কপোল বাহি নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির-সম পড়িল ঝরিয়া,
সেই এক অশ্রুবিন্দু অমৃতধারার মত
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন ;
দেখি সে করুণবারি নিরশ্রু কবির চোখে
কত দিন পরে হোলো অশ্রুর উদয়।
শ্রান্ত হৃদয়ের তরে যে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে
পাগল ভ্রমিতেছিল হেথায় হোথায়—
আজ যেন একটুকু আশ্রয় পাইল হৃদি,
আজ যেন একটুকু জুড়ালো যন্ত্রণা।
যে হৃদয় নিরাশায় মরুভূমি হোয়েছিল
সেথা হোতে হোলো আজ অশ্রু উৎসারিত।
শ্রান্ত সে কবির মাথা রাখিয়া কোলের 'পরে,
সরলা মুছায়ে দিল অশ্রুবারিধারা।
কবি সে ভাবিল মনে, তুমি কোথাকার দেবী
কি অমৃত ঢালিলে গো প্রাণের ভিতর !
ললনা তখন ধীরে চাহিয়া কবির মুখে
কহিল মমতাময় করুণ কথায়,—
"হোথায় বিজন বনে দেখেছ কুটীর ওই,
চল পান্থ ওইখানে যাই দুজনায়।

বন হোতে ফল মূল আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণের শয্যা দিব আমি বিছাইয়া,
সুখনিদ্রা-কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।
হরিণশাবক এক আছে ও গাছের তলে,
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক।
দূরে সরসীর ধারে আছে এক চারু কুঞ্জ,
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন।
কত পাখী ডালে ডালে সারাদিন গাইতেছে,
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখী এক আছে মোর সে যে কত গায় গান—
নাম ধোরে ডাকে মোরে 'নলিনী' 'নলিনী'।
যা আছে আমার কিছু সব আমি দেখাইব,
সব আমি শুনাইব যত জানি গান—
আসিবে কি পান্থ ওই বনের কুটীরমাঝে?"
এতেক শুনিয়া কবি চলিল কুটীরে।
কি সুখে থাকিত কবি, বিজন কুটীরে সেই
দিনগুলি কেটে যেত মুহূর্ত্তের মত—
কি শান্ত সে বনভূমি, নাই লোক নাই জন,
শুধু সে কুটীরখানি আছে এক ধারে।
আঁধার তরুর ছায়ে— নীরব শান্তির কোলে
দিবস যেন রে সেথা রহিত ঘুমায়ে।
পাখীর অস্ফুট গান, নির্ঝরের ঝরঝর
স্তব্ধতারে আরো যেন দিত মিষ্ট করি।
আগে এক দিন কবি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে
অরণ্যে অরণ্যে একা করিত ভ্রমণ,

এখন দুজনে মিলি ভ্রমিয়া বেড়ায় সেথা,
দুই জন প্রকৃতির বালক বালিকা।
সুদূর কাননতলে কবিরে লইয়া যেত
নলিনী, সে যেন এক বনেরি দেবতা।
শ্রান্ত হোলে পথশ্রমে ঘুমাত কবির কোলে,
খেলিত বনের বায়ু কুন্তল লইয়া,
ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিত কবি—
মুখে যেন লিখা আছে আরণ্য কবিতা।
"একি দেবি কলপনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের 'পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি দুইটি হৃদয়ে মিলি,
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা এক ইচ্ছা দুজনার,
এক ভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয় সে কি গো সুখের মিল—
এ জনমে ভাঙ্গিবে না তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
এক সাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুই জনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হোয়ে—
কিছু ভয় করি নাকো— বিহ্বল প্রণয়ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া।
তাই হোক্— হোক্ দেবি আমাদের দুই জনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।

মজি স্বপনের ঘোরে হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"
নিশীথে একেলা হোলে এইরূপ কত গান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত-প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস-কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া।
বিষাদ যতই হয় দারুণ অন্তরভেদী,
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!
মরমের ভার-সম হৃদয়ের কথাগুলি
কত দিন পারে বল চাপিয়া রাখিতে?
এক দিন ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া
অশান্ত বালক-মত কহিল কত কি!
অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি।
কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা!
এই কথাগুলি যেন পড়িল বালিকা ধীরে—
"কত ভাল বাসি বালা কহিব কেমনে!
তুমিও সদয় হোয়ে আমার সে প্রণয়ের
প্রতিদান দিও বালা এই ভিক্ষা চাই।"
গড়ায়ে পড়িল ধীরে বালিকার অশ্রুজল,
কবির অশ্রুর সাথে মিশিল কেমন—

স্কন্ধে তার রাখি মাথা কহিল কম্পিত স্বরে,
"আমিও তোমারে কবি বাসি না কি ভাল ?"
কথা না স্ফুরিল আর, শুধু অশ্রুজলরাশি
আরক্ত কপোল তার করিল প্লাবিত।
এইরূপ মাঝে মাঝে অশ্রুজলে অশ্রুজলে
নীরবে গাইত তারা প্রণয়ের গীত।
অরণ্যে দুজনে মিলি আছিল এমন সুখে
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন—
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু,
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
আলুলিত চুলগুলি সাজাইয়া বনফুলে
ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
একথা ওকথা লয়ে কি যে কি কহিত বালা
কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত।
কভু বা মুখের পানে সে যে কি রহিত চেয়ে,
ঘুমায়ে পড়িত যেন হৃদয় কবির।
কভু বা কি কথা লয়ে সে যে কি হাসিত হাসি,
তেমন সরল হাসি দেখে নি কেহই।
আঁধার অমার রাত্রে একাকী পর্ব্বতশিরে
সেও গো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর
পর্ব্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া,
তাহারো হৃদয় যেন নদীর তরঙ্গ-সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব—
করিত সে ছুটাছুটি, কিছুতে সে ডরিত না,
এমন দুরন্ত মেয়ে দেখি নি ত আর !
কবি যা কহিত কথা শুনিত কেমন ধীরে,
কেমন মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
বনদেবতার মত এমন সে এলোথেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,

কখনো এমন শান্ত প্রভাতের বায়ু যথা
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত।
কিন্তু, কল্পনা, যদি কবির হৃদয় দেখ
দেখিবে এখনো তাহা পূর্ণ হয় নাই।
এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢালো' ভালবাসা হৃদয়ে আমার।"
প্রেমের অমৃতধারা এত যে করেছে পান,
তবু মিটিল না কেন প্রণয়পিপাসা?
প্রেমের জোছনাধারা যত ছিল ঢালি বালা
কবির সমুদ্র-হৃদি পারে নি পূরিতে।
স্বাধীন বিহঙ্গ-সম, কবিদের তরে দেবি
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র-সম আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবি নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তার আকুল বিলাপে।
কবির সমুদ্র বুক পূরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।"
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি,
"আরো দাও ভালবাসা হৃদয়ে ঢালিয়া।
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা।"
শুনিয়া কবির কথা কাতরে কহিল বালা,
"যা ছিল আমার কবি দিয়েছি সকলি—
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমার প্রেমে দেছি বিসর্জ্জন।

তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর,
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।"
সে কথা শুনিয়া কবি কহিল কাতর স্বরে,
"প্রাণের শূন্যতা তবু ঘুচিল না কেন?
ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি,
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?
সারাদিন সাধ যায় শুনাই মনের কথা,
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া?
সারাদিন সাধ যায় দেখি ও মুখের পানে,
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা?
সাধ যায় এ জীবন প্রাণ ভোরে ভাল বাসি,
বেসেও প্রাণের শূন্য ঘুচিল না কেন?
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পূরিবে না প্রাণের শূন্যতা।
একি দেবি! একি তৃষ্ণা জ্বলিছে হৃদয়ে মোর,
ধরার অমৃত যত করিয়াছি পান,
প্রকৃতির আছে যত অতুল সৌন্দর্যরাশি,
প্রণয়ের আছে যত সুধা হোতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি,
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া—
শুধু দেবি পৃথিবীর হলাহল আছে যত
তাহাই করি নি পান মিটাতে পিপাসা!
শুধু দেবি ঐশ্বর্য্যের কনকশৃঙ্খল দিয়া
বাঁধি নাই আমার এ স্বাধীন হৃদয়!
শুধু দেবি মিটাইতে মনের বীরত্ব-গর্ব্ব
লক্ষ মানবের রক্তে ধুই নি চরণ!
শুধু দেবি এ জীবনে নিশাচর বিলাসেরে
সুখ-স্বাস্থ্য অর্ঘ্য দিয়া করি নাই সেবা!
তবু কেন হৃদয়ের তৃষা মিটিল না মোর,
তবু কেন ঘুচিল না প্রাণের শূন্যতা?

শুনেছি বিলাসসুরা বিহ্বল করিয়া হৃদি
ডুবাইয়া রাখে সদা বিস্মৃতির ঘুমে!
কিন্তু দেবি— কিন্তু দেবি— এত যে পেয়েছি কষ্ট,
বিস্মৃতি চাই নে তবু বিস্মৃতি চাই নে!—
সে কি ভয়ানক দশা, কল্পনাও শিহরে গো—
স্বর্গীয় এ হৃদয়ের জীবনে মরণ!
আমার এ মন দেবি হোক্ মরুভূমি-সম
তৃণলতা-জল-শূন্য অনন্ত প্রান্তর,
তবুও তবুও আমি সহিব তা প্রাণপণে,
বহিব তা যত দিন রহিব বাঁচিয়া,
মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন পর্য্যটিব,
হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।
প্রেম ভক্তি স্নেহ আদি মনের দেবতা যত
যতনে রেখেছি আমি মনের মন্দিরে,
তাঁদের করিতে পূজা ক্ষমতা নাইক ব'লে
বিসর্জ্জন করিবারে পারিব না আমি।
কিন্তু ওগো কলপনা আমার মনের কথা
বুঝিতে কে পারিবেক বল দেখি দেবি?
আমার ব্যথার মর্ম্ম কারে বুঝাইবে বল—
বুঝাইতে না পারিলে বুক যায় ফেটে।
যদি কেহ বলে দেবি 'তোমার কিসের দুখ,
হৃদয়ের বিনিময়ে পেয়েছ হৃদয়,
তবে কাল্পনিক দুখে এত কেন ম্রিয়মাণ?'
তবে কি বলিয়া আমি দিব গো উত্তর?
উপায় থাকিতে তবু যে সহে বিষাদজ্বালা
পৃথিবী তাহারি কষ্টে হয় গো ব্যথিত—
আমার এ বিষাদের উপায় নাইক কিছু,
কারণ কি তাও দেবি পাই না খুঁজিয়া।
পৃথিবী আমার কষ্ট বুঝুক্ বা না বুঝুক্,
নলিনীরে কি বলিয়া বুঝাইব দেবি?

তাহারে সামান্য কথা গোপন করিলে পরে
হৃদয়ে কি কষ্ট হয় হৃদয় তা জানে।
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া!
আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।
বুকের যেখানে তারে রাখিতে চাই গো আমি
সেখানে পাই নে যেন রাখিতে তাহারে—
তাইতে অন্তর বুক এখনো পূরিতেছে না,
তাইতে এখনো শূন্য রয়েছে হৃদয়।"
কবির প্রণয়সিন্ধু ক্ষুদ্র বালিকার মন
রেখেছিল মগ্ন করি অগাধ সলিলে—
উপরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা কত কি বহিয়া যেত
নিম্নে তার কোলাহল পেত না শুনিতে,
প্রণয়ের অবিচিত্র নিয়তনৃত্যন তবু
তরঙ্গের কলধ্বনি শুনিত কেবল,
সেই একতান ধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া তার
হৃদয় পড়িয়াছিল ঘুমায়ে কেমন!
বনের বালিকা আহা সে ঘুমে বিহ্বল হোয়ে
কবির হৃদয়ে রাখি অবশ মস্তক
স্বর্গের স্বপন শুধু দেখিত দিবস রাত্তি,
হৃদয়ের হৃদয়ের অনন্ত মিলন।
বালিকার সে হৃদয়ে সে প্রণয়মগ্ন হৃদে,
অবশিষ্ট আছিল না এক তিল স্থান—
আর কিছু জানিত না, আর কিছু ভাবিত না,
শুধু সে বালিকা ভাল বাসিত কবিরে।
শুধু সে কবির গান কত যে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর।
শুধু সে কবির নেত্র কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি
বিকীরিত, তাই হেরি হইত বিহ্বল!

শুধু সে কবির কোলে ঘুমাতে বাসিত ভাল,
কবি তার চুল লয়ে করিত কি খেলা।
শুধু সে কবিরে বালা শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি — কত কি কথা অর্থ নাই যার,
কিন্তু সে কথায় কবি কত যে পাইত অর্থ
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়—
সেই অর্থহীন কথা, হৃদয়ের ভাব যত
প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।
একদিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া—
"নলিনি! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী!
আর একবার বালা কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখীর কবিতা!
রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ!
এইখানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ
ওই মধুমুখখানি করিব চুম্বন।"
এতেক কহিয়া কবি নীরবে চলিয়া গেল
গোপনে মুছিয়া ফেলি নয়নের জল।
বালিকা নয়ন তুলি নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।
অনিমিষ নেত্র ক্রমে করিয়া প্লাবিত
একবিন্দু দুইবিন্দু ঝরিল সলিল।
বাহুতে লুকায়ে মুখ কাতর বালিকা
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে করিল রোদন।
হা-হা কবি কি করিলে, ফিরে দেখ, ফিরে এস,
দিও না বালার হৃদে অমন আঘাত—
নীরবে বালার আহা কি বজ্র বেজেছে বুকে,
গিয়াছে কোমল মন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া!

হা কবি অমন কোরে অনর্থক তার মনে
কি আঘাত করিলে যে বুঝিলে না তাহা ?
এত কাল সুখস্বপ্নে ডুবায়ে রাখিয়া মন,
এত দিন পরে তাহা দিবে কি ভাঙ্গিয়া ?
কবি ত চলিয়া যায়— সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে,
আঁধারে কাননভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু,
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে !
তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ণ সঙ্গীত—
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি,
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।
একবার কবি শুধু চাহিল কুটীরপানে,
কাতরে বিদায় মাগি বনদেবী-কাছে
নয়নের জল মুছি— যে দিকে নয়ন চলে
সে দিকে পথিক কবি যাইল চলিয়া।

সঙ্গীত

কেন ভালবাসিলে আমায় ?
কিছুই নাইক গুণ, কিছুই জানি না আমি,
কি আছে ? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয় !
যা আমার ছিল সাধ্য সকলি করেছি আমি
কিছুই করি নি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার ?
গেলে যদি, গেলে চলি, যাও যেথা ভাল লাগে—
একবার মনে কোরো দীন অধীনারে।

ভ্রমিতে ধরার মাঝে কত ভালবাসা পাবে,
তাতে যদি ভাল থাক তাই হোক্ তবে—
তবু একবার যদি মনে কর নলিনারে
যে দুখিনী, যে তোমারে এত ভালবাসে !
কি করিলে মন তব পারিতাম জুড়াইতে
যদি জানিতাম কবি করিতাম তাহা !
আমি অতি অভাগিনী জানি না বলিয়া যেন
বিরক্ত হোয়ো না কবি এই ভিক্ষা দাও !
না জানিয়া না শুনিয়া যদি দোষ করে থাকি,
ক্ষুদ্র আমি, ক্ষমা তবে করিয়ো আমারে—
তুমি ভাল থেকো কবি, ক্ষুদ্র এক কাঁটা যেন
ফুটে না তোমার পায়ে ভ্রমিতে পৃথিবী।
জননি, কোথায় তুমি রেখে গেলে দুহিতারে ?
কত দিন একা একা কাটালাম হেথা,
একেলা তুলিয়া ফুল কত মালা গাঁথিতাম,
একেলা কাননময় করিতাম খেলা !
তোমার বীণাটি ল'য়ে, উঠিয়া পর্ব্বতশিরে
একেলা আপন মনে গাইতাম গান—
হরিণশিশুটি মোর বসিত পায়ের তলে,
পাখীটি কাঁধের 'পরে শুনিত নীরবে।
এইরূপ কত দিন কাটালেম বনে বনে,
কত দিন পরে তবে এলে তুমি কবি !
তখন তোমারে কবি কি যে ভালবাসিলাম
এত ভাল কাহারেও বাসি নাই কভু।
দূর স্বরগের এক জ্যোতির্ম্ময় দেব-সম
কত বার মনে মনে করেছি প্রণাম।
দূর থেকে আঁখি ভরি দেখিতাম মুখখানি,
দূর থেকে শুনিতাম মধুময় গান।
যে দিন আপনি আসি কহিলে আমার কাছে
ক্ষুদ্র এই বালিকারে ভালবাস তুমি,

সে দিন কি হর্ষে কবি   কি আনন্দে কি উচ্ছ্বাসে
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মোর ফেটে গেল যেন।
আমি কোথাকার কেবা!   আমি ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র,
স্বর্গের দেবতা তুমি ভালবাস মোরে?
এত সৌভাগ্য, কবি,   কখনো করি নি আশা—
কখনো মুহূর্ত্ত-তরে জানি নি স্বপনে।
যেথায় যাও-না কবি,   যেথায় থাক-না তুমি,
আমরণ তোমারেই করিব অর্চ্চনা।
মনে রাখ নাই রাখ,   তুমি যেন সুখে থাক
দেবতা! এ দুখিনীর শুন গো প্রার্থনা।

তৃতীয় সর্গ

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি!
তুষারস্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ণকণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে।
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি প্রকৃতির গীত—
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়
সে মনের তন্ত্রী যেন হোয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হোলো দশা—
যে প্রকৃতি-শোভা-মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইক দেবতা যেন মন্দিরমাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্দ্ধন

প্রকৃতির রূপচ্ছটা দ্বিগুণ করিয়া ;
সে না হোলে অমাবস্যানিশির মতন
সমস্ত জগৎ হোত বিষন্ন আঁধার।

...

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা, নীরব রজনী।
অরণ্যের অন্ধকারময় গাছগুলি
মাথার উপরে মাখি রজত জোছনা,
শাখায় শাখায় ঘন করি জড়াজড়ি,
কেমন গম্ভীর ভাবে রোয়েছে দাঁড়ায়ে।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসীবক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভপ্রতিবিম্বশোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন !
লীলাময়ী প্রবাহিণী চলেছে ছুটিয়া,
লীলাভঙ্গ বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙ্গে চুরে কত শত ধরিছে মূরতি।
গাইছে রজনী কিবা নীরব সঙ্গীত !
কেমন নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর—
শুধু দূর-শৃঙ্গ হোতে ঝরিছে নির্ঝর,
শুধু এক পাশ দিয়া সঙ্কুচিত অতি
তটিনীটি সর সর যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্তবায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কত বার আমি
গম্ভীর অরণ্যে একা কোরেছি ভ্রমণ।
স্নিগ্ধ রাত্রে গাছপালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।

দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানি না কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া উঠে গো কেমন!
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাই না তা খুঁজি!
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে,
পুরাণো সুখের স্মৃতি উঠে নি উথলি!
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায় নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবা নিশি তার
হৃদয়ের এক দিক শূন্য হোয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কি গো কখনো
ফেলে নাই মর্ম্মভেদী একটি নিশ্বাস?
কত স্থানে আজ রাত্রে নিশীথপ্রদীপে
উঠিছে প্রমোদধ্বনি বিলাসীর গৃহে।
মুহূর্ত্ত ভাবে নি তারা আজ নিশীথেই
কত চিত্ত পুড়িতেছে প্রচ্ছন্ন অনলে।
কত শত হতভাগা আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মত জীবনের সুখ
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলাই হা হা করি বেড়ায় ভ্রমিয়া!

...

ঝোপে-ঝাপে ঢাকা ওই অরণ্যকুটীর।
বিষণ্ণ নলিনীবালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া!

জানি না কেমন কোরে বালার বুকের মাঝে
সহসা কেমন ধারা লেগেছে আঘাত—
আর সে গায় না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায় না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমে না বালা কাননে কাননে।
বিজন কুটীরে শুধু পরণশয্যার 'পরে
একেলা আপন মনে রয়েছে শুইয়া।
যে বালা মুহূর্ত্তকাল স্থির না থাকিত কভু,
শিখরে নির্ঝরে বনে করিত ভ্রমণ—
কখনো তুলিত ফুল, কখনো গাঁথিত মালা,
কখনো গাইত গান, বাজাইত বীণা—
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির!
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ!
এক দিন, দুই দিন, যেতেছে কাটিয়া ক্রমে—
মরণের পদশব্দ গণিছে সে যেন!
আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয় গো মরণ।
এ দিকে পৃথিবী ভ্রমি সহিয়া ঝটিকা কত
ফিরিয়া আসিছে কবি কুটীরের পানে,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যথা জ্বলিয়া পুড়িয়া পাখী
সন্ধ্যায় কুলায়ে তার আইসে ফিরিয়া।
বহুদিন পরে কবি পদার্পিল বনভূমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা!
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাইছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি।
অধীরে চলিল কবি কুটীরের পানে—
দুয়ারের কাছে গিয়া দুয়ারে আঘাত দিয়া
ডাকিল অধীর স্বরে, নলিনী! নলিনী!
কিছু নাই সাড়া শব্দ, দিল না উত্তর কেহ,

প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা রয়েছে পড়ি—
বেষ্টিত বিতন্ত্রী বীণা লূতাতন্তুজালে।
ভ্রমিল আকুল কবি কাননে কাননে,
ডাকিয়া সমুচ্চ স্বরে, নলিনী! নলিনী!
মিলিয়া কবির সাথে বনদেবী উচ্চস্বরে
ডাকিল কাতরে আহা, নলিনী! নলিনী!
কেহই দিল না সাড়া, শুধু সে শবদ শুনি
সুপ্ত হরিণেরা ত্রস্ত উঠিল জাগিয়া।
অবশেষে গিরিশৃঙ্গে উঠিল কাতর কবি,
নলিনীর সাথে যেথা থাকিত বসিয়া।
দেখিল সে গিরি-শৃঙ্গে, শীতল তুষার-'পরে,
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লানমুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধনিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।
একটি হরিণশিশু খেলা করিবার তরে
কভু বা অঞ্চল ধরি টানিতেছে তার,
কভু শৃঙ্গ দুটি দিয়া সুধীরে দিতেছে ঠেলি,
কভু বা অবাক্ নেত্রে রয়েছে চাহিয়া!
তবু নলিনীর ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিছে না,
নীরবে নিস্পন্দ হোয়ে রয়েছে ভূতলে।
দূর হোতে কবি তারে দেখিয়া কহিল উচ্চে,
"নলিনি, এয়েছি আমি দেখ্‌সে বালিকা।"
তবুও নলিনী বালা না দিয়া উত্তর
শীতল তুষার-'পরে রহিল ঘুমায়ে।
কবি সে শিখর-'পরে করি আরোহণ
শীতল অধর তার করিল চুম্বন—
শিহরিয়া চমকিয়া দেখিল সে কবি

না নড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস।
দেখিল না, ভাবিল না, কহিল না কিছু,
যেমন চাহিয়া ছিল রহিল চাহিয়া।
নিদারুণ কি যেন কি দেখিয়া তরাসে
নয়ন হইয়া গেল অচল পাষাণ।
কতক্ষণে কবি তবে পাইল চেতন,
দেখিল তুষারশুভ্র নলিনীর দেহ
হৃদয়জীবনহীন জড় দেহ তার
অনুপম সৌন্দর্য্যের কুসুম-আলয়,
হৃদয়ের মরমের আদরের ধন—
তৃণ কাষ্ঠ সম ভূমে যায় গড়াগড়ি!
বুকে তারে তুলে লয়ে ডাকিল "নলিনী",
হৃদয়ে রাখিয়া তারে পাগলের মত কবি
কহিল কাতর স্বরে "নলিনী" "নলিনী"!
স্পন্দহীন, রক্তহীন অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন।

...

তার পর দিন হোতে সে বনে কবিরে আর
পেলে না দেখিতে কেহ, গেছে সে কোথায়!
ঢাকিল নলিনীদেহ তুষারসমাধি—
ক্রমে সে কুটীরখানি কোথা ভেঙ্গে চুরে গেল,
ক্রমে সে কানন হোলো গ্রাম লোকালয়,
সে কাননে— কবির সে সাধের কাননে
অতীতের পদচিহ্ন রহিল না আর।

চতুর্থ সর্গ

"এ তবে স্বপন শুধু, বিম্বের মতন
আবার মিলায়ে গেল নিদ্রার সমুদ্রে !
সারারাত নিদ্রার করিনু আরাধনা—
যদি বা আইল নিদ্রা এ শ্রান্ত নয়নে,
মরীচিকা দেখাইয়া গেল গো মিলায়ে !
হা স্বপ্ন, কি শক্তি তোর, এ হেন মূরতি
মুহূর্ত্তের মধ্যে তুই ভাঙ্গিলি, গড়িলি ?
হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা—
সত্যের মতন গড়িলি প্রতিমা,
স্বপ্নের মতন তাহা ফেলিলি ভাঙ্গিয়া ?
কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে ?
না না, তাহা নয় কভু, নলিনী, সে কি গো
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত !
যাহার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যত কাল রব বেঁচে যার ভালবাসা
চিরকাল এ হৃদয়ে রহিবে অক্ষয়,
সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গপ্রতিমা,
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত
তরঙ্গের অভিঘাতে জন্মিল মিশিল ?
না না, তাহা নয় কভু, তা যেন না হয় !
দেহকারাগারমুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে
আমারই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চিরহাস্যময় তার প্রেমদৃষ্টি মেলি
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।

রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।
দেহকারাগারমুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয়সাথে মিশাব হৃদয়।
নলিনী, আছ কি তুমি, আছ কি হেথায়?
একবার দেখা দেও, মিটাও সন্দেহ!
চিরকাল তরে তোরে ভুলিতে কি হবে?
তাই বল্ নলিনী লো, বল্ একবার!
চিরকাল আর তোরে পাব না দেখিতে,
চিরকাল আর তোর হৃদয়ে হৃদয়
পাব না কি মিশাইতে, বল্ একবার।
মরিলে কি পৃথিবীর সব যায় দূরে?
তুই কি আমারে ভুলে গেছিস্ নলিনি?
তা হোলে নলিনি, আমি চাই না মরিতে।
তোর ভালবাসা যেন চিরকাল মোর
হৃদয়ে অক্ষয় হোয়ে থাকে গো মুদ্রিত—
কষ্ট পাই পাব, তবু চাই না ভুলিতে!
তুমি নাহি থাক যদি তোমার স্মৃতিও
থাকে যেন এ হৃদয় করিয়া উজ্জ্বল!
এই ভালবাসা যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?
যত কাল বেঁচে রব, রবে যা হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে না পালটিতে আঁখির পলক
ক্ষণস্থায়ী কুসুমের সুরভের মত
শূন্য এই বায়ুস্রোতে যাইবে মিশায়ে?
হিমাদ্রির এই শুষ্ক আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান,

বর্ত্তমান মিশিতেছে অতীতসমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে মানুষেরে অলক্ষিতভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া,
কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে
তাহার চরণ-চিহ্ন পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দ্দান্ত সময়স্রোত অবিরামগতি,
নূতন গড়ে নি কিছু, ভাঙ্গে নি পুরাণো।
বাহিরের কত কি যে ভাঙ্গিল চুরিল,
বাহিরের কত কি যে হইল নূতন,
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি—
আগেও আছিল যাহা এখনো তা আছে,
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই!
বরষে বরষে দেহ যেতেছে ভাঙ্গিয়া,
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর,
নলিনীরে ভালবাসি তবুও তেমনি।
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন
তার হৃদয়ের মূর্ত্তি ছিল এ হৃদয়ে,
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে,
মরমের মর্ম্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙ্গিবারে এ জনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকানো সে ধন!
ভেবেছিনু এক বার এই-যে বিষাদ
নিদারুণ তীব্র স্রোতে বহিছে হৃদয়ে

এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙ্গিবে চূরিবে—
পারে নি ভাঙিতে কিন্তু এক তিল তাহা,
যেমন আছিল মন তেমনি রয়েছে!
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে,
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি যে আছে বল,
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী।
গাও গো বিহগ তব প্রমোদের গান,
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি!
প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলেবেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতিদেবি
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য, দেবি, তোমার এ রাজে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
তোমার আশ্বাসবাক্যে হে প্রকৃতিদেবি,
সংশয় কখন আমি করি না স্বপনে!
বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
গাও গো মনের সাধে প্রমোদের গান!
পাখীরা মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত,
কানন ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু,
উপত্যকাময় যবে ফুটিয়াছে ফুল,
তখন তোদের আর কিসের ভাবনা?
দেখি চিরহাস্যময় প্রকৃতির মুখ,
দিবানিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা!
সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে,

সমস্ত জগৎ যবে গাহে গো সঙ্গীত,
তখন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে
ক্ষুদ্রতম আপনার মনের বিষাদে
সমস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস না বসি!
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কি গো আর?
ধীরে ধীরে দূর হোতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।
একেক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ
মনে হয় আমারি তা প্রাণের রাগিণী—
সেই রাগিণীর মত আমার এ প্রাণ,
আমার প্রাণের মত যেন সে রাগিণী!
কখন বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর,
এমনি স্বপনময় এমনি অস্ফুট—
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে!"

ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্দ্ধক্যে আসি হোলো উপনীত!
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে!
মনে হোত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী
হিমাদ্রি হোতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্!
নেত্র তাঁর বিকীরিত কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,

দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন
খুলিয়া দিত গো নিজ অভেদ্য দুয়ার।
যেন কোন দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্রলোকে কোরেছে স্থাপিত—
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন
কহিত কাতর স্বরে ঢাকিয়া নয়ন,
"এ কি রে অনন্ত কাণ্ড, পারি না সহিতে!"
সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া,
কি গান গাইছে কবি, শুন কলপনা।
কি "সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার জায়া! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষারশুভ্র মস্তক তোমার!
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীতবায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ণ নিশ্বাস!
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদচূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোলো
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব!
সাড়াশব্দ নাই মুখে, অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া!
কি মহান্! কি প্রশান্ত! কি গম্ভীর ভাব!
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া

স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব ওগো হিমালয়
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি
গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার !
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্যমনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ !
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে, হোয়ে হতজ্ঞানপ্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া।
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কত বার আইল ফিরিয়া !
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া
কত কাল আইল রে, গেল কত কাল
হিমাদ্রি তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে।
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয়গিরি

মানুষসৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এইখানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ?
যা দেখিছ যা দেখেছ তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি উঠে নি শিহরি ?
কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া !
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতাশৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্কশৃঙ্খল তার অলঙ্কাররূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায় !
দাসদের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা !
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন !
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু !
সবল, সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল—
দুর্ব্বল, বলের পদে আত্ম বিসর্জ্জিতে !
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খলরাশি দিবে গো ভাঙ্গিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্ব্বলে কোথা সাহায্য করিবে—
দুর্ব্বলে অধিকতর করিতে দুর্ব্বল

বল তার— হিমগিরি, দেখিছ কি তাহা ?
সামান্ত নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময়পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার !
কত রক্তমাখা ছুরি হাসিছে হরষে,
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে !
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে,
উপেক্ষা ঘৃণায় মাখা কুঞ্চিত অধর
পরঅশ্রুজলে ঢালে হাসিমাখা বিষ !
পৃথিবী জানে না গিরি হেরিয়া পরের জ্বালা,
হেরিয়া পরের মর্ম্মদুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়নজলে মিশাতে নয়নজল -
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !
প্রেম ? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তিধামে ?
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে ?
প্রেমে পাপ বলে যারা, প্রেম তারা চিনে ?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম-অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভাল বাসে যারা
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা,
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই—
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে !
কেহ বা রতনময় কনকভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,

অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্নসন্ধান!
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু
সমস্ত পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস!
সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব!
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি—
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ।
এ অশান্তি কবে দেব হবে দূরীভূত!
অত্যাচার-গুরুভারে হোয়ে নিপীড়িত
সমস্ত পৃথিবী, দেব, করিছে ক্রন্দন!
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায়!
কবে, দেব, এ রজনী হবে অবসান?
স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী!
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
নাইক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা—
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল-অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,

কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস!
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত!
হিমাদ্রি, মানুষসৃষ্টি-আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে
তবে বল কবে, গিরি, হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে—
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসে নি এখনো
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বলি গো আমি হে প্রকৃতিদেবি
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এ যে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত, দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষচিতে ত্যজিতে জীবন!"

সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্ব্বরা।

উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়। যিনি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে,
ব্যাধশরে নিপতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন!
কবির প্রাচীননেত্রে পৃথিবীর শোভা
এখনও কিছুমাত্র হয় নি পুরাণো?
এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে
একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ।
বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি, গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাটদেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হোত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃদেব!
জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির!
সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশঃ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।
প্রতিরাত্রে গিরিশিরে জোছনায় বসি
আনন্দে গাইত কবি সুখের সঙ্গীত।
দেখিতে পেয়েছে যেন স্বর্গের কিরণ,
শুনিতে পেয়েছে যেন দূর স্বর্গ হোতে,
নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান।
প্রবাসী যেমন আহা দূর হোতে যদি
সহসা শুনিতে পায় স্বদেশ-সঙ্গীত,
ধায় হরষিত চিতে সেই দিক্ পানে,
একদিন দুইদিন যেতেছে যেমন

চলেছে হরষে কবি, যেই দেশ হোতে
স্বদেশসঙ্গীতধ্বনি পেতেছে শুনিতে।
এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া!
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস!
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রুজলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত!
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হুহু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস!
সমাধি উপরে তার তরুলতাকুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল!
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

বন-ফুল

বন-ফুল।

কাব্যোপন্যাস।

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

শ্রী মতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ;

২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট;—কলিকাতা।

১২৮৬ সাল।

বন-ফুল।

—

প্রথম সর্গ

চাই না জ্ঞেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতাম বনের কোলে!

—

দীপনির্ব্বাণ

নিশার আঁধার রাশি করিয়া নিরাস
রজতসুষমাময় প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে, শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান!
শিরোপরি চন্দ্র সূর্য্য, পদে লুটে পৃথ্বীরাজ্য
মস্তকে স্বর্গের ভার করিছে বহন;
তুষারে আবরি শির ছেলেখেলা পৃথিবীর
ভ্রূক্ষেপে যেন সব করিছে লোকন।
কত নদী কত নদ কত নির্ঝরিণী হ্রদ
পদতলে পড়ি তার করে আস্ফালন!
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে দেখে রয় স্তব্ধ হয়ে,
অবাক্ হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন!

...

চৌদিকে পৃথিবী ধরা নিদ্রায় মগন,
তীব্র শীতসমীরণে দুলায়ে পাদপগণে
বহিছে নির্ঝরবারি করিয়া চুম্বন,
হিমাদ্রিশিখরশৈল করি আবরিত
গভীর জলদরাশি তুষার বিভায় নাশি
স্থির ভাবে হেথা সেথা রহেছে নিদ্রিত।
পর্ব্বতের পদতলে ধীরে ধীরে নদী চলে
উপলরাশির বাধা করি অপগত,
নদীর তরঙ্গকুল সিক্ত করি বৃক্ষমূল
নাচিছে পাষাণতট করিয়া প্রহত!
চারি দিকে কত শত কলকলে অবিরত
পড়ে উপত্যকা-মাঝে নির্ঝরের ধারা।
আজি নিশীথিনী কাঁদে আঁধারে হারায়ে চাঁদে
মেঘ-ঘোমটায় ঢাকি কবরীর তারা।

...

কল্পনে! কুটীর কার তটিনীর তীরে
তরুপত্র-ছায়ে-ছায়ে পাদপের গায়ে গায়ে
ডুবায়ে চরণদেশ স্রোতস্বিনীনীরে?
চৌদিকে মানববাস নাহিক কোথায়,
নাহি জনকোলাহল গভীর বিজনস্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
কুসুমভূষিত বেশে কুটীরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকামালা প্রসারিয়া কর,
কুসুমস্তবকরাশি দুয়ার-উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটীরভিতর!
কুটীরের এক পাশে শাখাদীপ[১] ধূমশ্বাসে
স্তিমিত আলোকশিখা করিছে বিস্তার।
অস্পষ্ট আলোক, তায় আঁধার মিশিয়া যায়—

---

১ হিমালয়ে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার শাখা অগ্নিসংযুক্ত হইলে দীপের ন্যায় জ্বলে, তথাকার লোকেরা উহা প্রদীপের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে।

ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর-দ্বার !
গভীর নীরব ঘর, শিহরে যে কলেবর !
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস শুদ্ধ হয়ে বয়—
বিষাদের অন্ধকারে গভীর শোকের ভারে
গভীর নীরব গৃহ অন্ধকারময় !
কে ওগো নবীনা বালা উজলি পরণশালা
বসিয়া মলিনভাবে তৃণের আসনে ?
কোলে তার সঁপি শির কে শুয়ে হইয়া স্থির
থেক্যে থেক্যে দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সঘনে—
সুদীর্ঘ ধবল কেশ ব্যাপিয়া কপোলদেশ,
শ্বেতশ্মশ্রু ঢাকিয়াছে বক্ষের বসন—
অবশ জ্ঞেয়ানহারা, স্তিমিত লোচনতারা,
পলক নাহিক পড়ে নিস্পন্দ নয়ন !
বালিকা মলিনমুখে বিশীর্ণা বিষাদদুখে,
শোকে ভয়ে অবশ সে সুকোমল-হিয়া।
আনত করিয়া শির বালিকা হইয়া স্থির
পিতার-বদন-পানে রয়েছে চাহিয়া।
এলোথেলো বেশবাস, এলোথেলো কেশপাশ
অবিচল আঁখিপার্শ্ব করেছে আবৃত !
নয়নপলক স্থির, হৃদয় পরাণ ধীর,
শিরায় শিরায় রহে স্তবধ শোণিত।
হৃদয়ে নাহিক জ্ঞান, পরাণে নাহিক প্রাণ,
চিন্তার নাহিক রেখা হৃদয়ের পটে !
নয়নে কিছু না দেখে, শ্রবণে স্বর না ঠেকে,
শোকের উচ্ছ্বাস নাহি লাগে চিত্ততটে !
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, সুধীরে নয়ন মেলি
ক্রমে ক্রমে পিতা তাঁর পাইলেন জ্ঞান !
সহসা সভয়প্রাণে দেখি চারিদিক পানে
আবার ফেলিল শ্বাস ব্যাকুলপরাণ—
কি যেন হারায়ে গেছে, কি যেন আছে না আছে,

শোকে ভয়ে ধীরে ধীরে মুদিল নয়ন—
সভয়ে অস্ফুট স্বরে সরিল বচন,
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী!"
চমকি উঠিল যেন নীরব রজনী!
চমকি উঠিল যেন নীরব অবনী!
উর্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে—
সহসা করণক্ষেপে সহসা উঠে রে কেঁপে,
সহসা জাগিয়া উঠে চলউর্মি সবে!
কমলার চিত্তবাপী সহসা উঠিল কাঁপি
পরাণে পরাণ এলো হৃদয়ে হৃদয়!
স্তবধ শোণিতরাশি আস্ফালিল হৃদে আসি,
আবার হইল চিন্তা হৃদয়ে উদয়!
শোকের আঘাত লাগি পরাণ উঠিল জাগি,
আবার সকল কথা হইল স্মরণ!
বিষাদে ব্যাকুল হৃদে নয়নযুগল মুদে
আছেন জনক তাঁর, হেরিল নয়ন।
স্থির নয়নের পাতে পড়িল পলক,
শুনিল কাতর স্বরে ডাকিছে জনক,
"কোথা মা কমলা মোর কোথা মা জননী!"
বিষাদে ষোড়শী বালা চমকি অমনি
(নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে) কহিল কাতর স্বরে
পিতার নয়ন-'পরে রাখিয়া নয়ন,
"কেন পিতা! কেন পিতা! এই-যে রয়েছি হেথা"—
বিষাদে নাহিক আর সরিল বচন!
বিষাদে মেলিয়া আঁখি বালার বদনে রাখি
এক দৃষ্টে স্থিরনেত্রে রহিল চাহিয়া!
নেত্রপ্রান্তে দরদরে, শোক-অশ্রুবারি ঝরে,
বিষাদে সন্তাপে শোকে আলোড়িত হিয়া!
গভীরনিশ্বাসক্ষেপে হৃদয় উঠিল কেঁপে,
ফাটিয়া বা যায় যেন শোণিত-আধার!

ওষ্ঠপ্রান্ত থরথরে কাঁপিছে বিষাদভরে
নয়নপলক-পত্র কাঁপে বার বার—
শোকের স্নেহের অশ্রু করিয়া মোচন
কমলার পানে চাহি কহিল তখন,
"আজি রজনীতে মা গো! পৃথিবীর কাছে
বিদায় মাগিতে হবে, এই শেষ দেখা ভবে!
জানি না তোমার শেষে অদৃষ্টে কি আছে—
পৃথিবীর ভালবাসা পৃথিবীর সুখ আশা,
পৃথিবীর স্নেহ প্রেম ভক্তি সমুদায়,
দিনকর নিশাকর গ্রহ তারা চরাচর,
সকলের কাছে আজি লইব বিদায়!
গিরিরাজ হিমালয়! ধবল তুষারচয়!
অয়ি গো কাঞ্চনশৃঙ্গ মেঘ-আবরণ!
অয়ি নির্ঝরিণীমালা! স্রোতস্বিনী শৈলবালা!
অয়ি উপত্যকে! অয়ি হিমশৈলবন!
আজি তোমাদের কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
আজি তোমাদের কাছে অন্তিম বিদায়।
কুটীর পরণশালা সহিয়া বিষাদজ্বালা
আশ্রয় লইয়াছিনু যাহার ছায়ায়—
স্তিমিত দীপের প্রায় এত দিন যেথা হায়
অন্তিমজীবনরশ্মি করেছি ক্ষেপণ,
আজিকে তোমার কাছে মুমূর্ষু বিদায় যাচে,
তোমারি কোলের পরে সঁপিব জীবন!
নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে, নহে তোমাদের তরে,
তোমাদের তরে চিত্ত ফেলিছে না শ্বাস—
আজি জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিব ত,
বাতাসে মিশাবে আজি অন্তিম নিশ্বাস!
কাঁদি না তাহার তরে, হৃদয় শোকের ভরে
হতেছে না উৎপীড়িত তাহারো কারণ।
আহা হা! দুখিনী বালা সহিবে বিষাদজ্বালা

আজিকার নিশিভোর হইবে যখন ?
কালি প্রাতে একাকিনী অসহায়া অনাথিনী
সংসারসমুদ্র-মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে !
সংসারযাতনাজ্বালা কিছু না জানিস্, বালা,
আজিও !— আজিও তুই চিনিস নে ভবে !
ভাবিতে হৃদয় জ্বলে,— মানুষ কারে যে বলে
জানিস্ নে কারে বলে মানুষের মন।
কার দ্বারে কাল প্রাতে দাঁড়াইবি শূন্যহাতে,
কালিকে কাহার দ্বারে করিবি রোদন !
অভাগা পিতার তোর জীবনের নিশা ভোর—
বিষাদ নিশার শেষে উঠিবেক রবি
আজ রাত্রি ভোর হলে ! কারে আর পিতা বলে
ডাকিবি, কাহার কোলে হাসিবি খেলিবি ?
জীবধাত্রী বসুন্ধরে ! তোমার কোলের 'পরে
অনাথা বালিকা মোর করিনু অর্পণ !
দিনকর ! নিশাকর ! আহা এ বালার 'পর
তোমাদের স্নেহদৃষ্টি করিও বর্ষণ।
শুন সব দিক্‌বালা ! বালিকা না পায় জ্বালা
তোমরা জননীস্নেহে করিও পালন !
শৈলবালা ! বিশ্বমাতা ! জগতের স্রষ্টা পাতা !
শত শত নেত্রবারি সঁপি পদতলে—
বালিকা অনাথা বোলে স্থান দিও তব কোলে,
আবৃত করিও এরে স্নেহের আঁচলে !
মুছ মা গো অশ্রুজল ! আর কি কহিব বলো !
অভাগা পিতারে ভোলো স্বপ্নের মতন !
আটকি আসিছে স্বর !— অবসন্ন কলেবর।
ক্রমশঃ মুদিয়া, মা গো, আসিছে নয়ন !
মুষ্টিবদ্ধ করতল, শোণিত হইছে জল,
শরীর হইয়া আসে শীতল পাষাণ !
এই— এই শেষবার— কুটিরের চারি ধার

দেখে লই! দেখে লই মেলিয়া নয়ান!
শেষবার নেত্র ভোরে এই দেখে লই তোরে
চিরকাল তরে আঁখি হইবে মুদ্রিত!
সুখে থেকো চিরকাল!— সুখে থেকো চিরকাল!
শান্তির কোলেতে বালা থাকিও নিদ্রিত!"
স্তবধ হৃদয়োচ্ছ্বাস! স্তবধ হইল শ্বাস!
স্তবধ লোচনতারা! স্তবধ শরীর!
বিষম শোকের জ্বালা— মূর্চ্ছিয়া পড়িল বালা,
কোলের উপরে আছে জনকের শির!
গাইল নির্ঝরবারি বিষাদের গান,
শাখার প্রদীপ ধীরে হইল নির্ব্বাণ!

দ্বিতীয় সর্গ

যেও না! যেও না!

দুয়ারে আঘাত করে কে ও পান্থবর?
"কে ওগো কুটীরবাসি! দ্বার খুলে দাও আসি!"
তবুও কেন রে কেউ দেয় না উত্তর?
আবার পথিকবর আঘাতিল ধীরে!
"বিপন্ন পথিক আমি, কে আছে কুটীরে?"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই—
তটিনী বহিয়া যায় আপনার মনে!
পাদপ আপন মনে প্রভাতের সমীরণে
দুলিছে, গাইছে গান সরসর স্বনে!

সমীরে কুটীরশিরে লতা দুলে ধীরে ধীরে
বিতরিয়া চারি দিকে পুষ্পপরিমল!
আবার পথিকবর আঘাতে দুয়ার-'পর—
ধীরে ধীরে খুলে গেল শিথিল অর্গল।
বিস্ফারিয়া নেত্রদ্বয় পথিক অবাক্ রয়,
বিস্ময়ে দাঁড়ায়ে আছে ছবির মতন।
কেন পান্থ, কেন পান্থ, মৃগ যেন দিক্‌ভ্রান্ত
অথবা দরিদ্র যেন হেরিয়া রতন!
কেন গো কাহার পানে দেখিছ বিস্মিত প্রাণে—
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিশ্বাস?
দারুণ শীতের কালে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরে ভালে,
তুষারে করিয়া দৃঢ় বহিছে বাতাস!
ক্রমে ক্রমে হয়ে শান্ত সুধীরে এগোয় পান্থ,
থর থর করি কাঁপে যুগল চরণ—
ধীরে ধীরে তার পরে সভয়ে সঙ্কোচভরে
পথিক অনুচ্চ স্বরে করে সম্বোধন—
"সুন্দরি! সুন্দরি!" হায়। উত্তর নাহিক পায়!
আবার ডাকিল ধীরে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
শব্দ চারি দিকে ছুটে, প্রতিধ্বনি জাগি উঠে,
কুটীর গম্ভীরে কহে "সুন্দরি! সুন্দরি!"
তবুও উত্তর নাই, নীরব সকল ঠাঁই,
এখনো পৃথিবী ধরা নীরবে ঘুমায়!
নীরব পরণশালা, নীরব ষোড়শী বালা,
নীরবে সুধীর বায়ু লতারে দুলায়!
পথিক চমকি প্রাণে দেখিল চৌদিক-পানে—
কুটীরে ডাকিছে কেও "কমলা! কমলা!"
অবাক্ হইয়া রহে, অস্ফুটে কে ওগো কহে?
সুমধুর স্বরে যেন বালকের গলা!
পথিক পাইয়া ভয়, চমকি দাঁড়ায়ে রয়,
কুটীরের চারি ভাগে নাই কোনজন!

এখনো অস্ফুটস্বরে 'কমলা! কমলা!' ক'রে
কুটীর আপনি যেন করে সম্ভাষণ!
কে জানে কাহাকে ডাকে, কে জানে কেন বা ডাকে,
কেমনে বলিব কেবা ডাকিছে কোথায়?
সহসা পথিকবর দেখে দণ্ডে করি ভর
'কমলা! কমলা!' বলি শুক গান গায়!
আবার পথিকবর হন ধীরে অগ্রসর,
'সুন্দরি! সুন্দরি!' বলি ডাকিয়া আবার!
আবার পথিক হায় উত্তর নাহিক পায়,
বসিল উরুর 'পরে সঁপি দেহভার!
সঙ্কোচ করিয়া কিছু পান্থবর আগুপিছু
একটু একটু ক'রে হন অগ্রসর!
আনমিত করি শিরে পথিকটি ধীরে ধীরে
বালার নাসার কাছে সঁপিলেন কর!
হস্ত কাঁপে থরথরে, বুক ধুক্ ধুক্ করে,
পড়িল অবশ বাহু কপোলের 'পর—
লোমাঞ্চিত কলেবরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরে,
কে জানে পথিক কেন টানি লয় কর!
আবার কেন কি জানি বালিকার হস্তখানি
লইলেন আপনার করতল-'পরি—
তবুও বালিকা হায় চেতনা নাহিক পায়—
অচেতনে শোক জ্বালা রয়েছে পাশরি!
রুক্ষ রুক্ষ কেশরাশি বুকের উপরে আসি
থেকে থেকে কাঁপি উঠে নিশ্বাসের ভরে!
বাঁহাত আঁচল-'পরে অবশ রয়েছে পড়ে
এলো কেশরাশি মাঝে সঁপি ডান করে।
ছাড়ি বালিকার কর ত্রস্ত উঠে পান্থবর
দ্রুতগতি চলিলেন তটিনীর ধারে,
নদীর শীতল নীরে ভিজায়ে বসন ধীরে
ফিরি আইলেন পুনঃ কুটীরের দ্বারে।

বালিকার মুখে চোকে শীতল সলিল-সেকে
সুধীরে বালিকা পুনঃ মেলিল নয়ন।
মুদিতা নলিনীকলি মরমহুতাশে জ্বলি
মুরছি সলিলকোলে পড়িলে যেমন—
সদয়া নিশির মন হিম সেঁচি সারাক্ষণ
প্রভাতে ফিরায়ে তারে দেয় গো চেতন।
মেলিয়া নয়নপুটে বালিকা চমকি উঠে
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ।
পিতা মাতা ছাড়া কারে মানুষে দেখে নি হা রে,
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন!
আঁচল গিয়াছে খ'সে, অবাক্ রয়েছে ব'সে
বিস্ফারি পথিক-পানে যুগল নয়ন!
দেখেছে কভু কেহ কি এহেন মধুর আঁখি?
স্বর্গের কোমল জ্যোতি খেলিছে নয়নে—
মধুর-স্বপনে-মাখা সারল্য-প্রতিমা-আঁকা
'কে তুমি গো?' জিজ্ঞাসিছে যেন প্রতিক্ষণে।
পৃথিবী-ছাড়া এ আঁখি স্বর্গের আড়ালে থাকি
পৃথ্বীরে জিজ্ঞাসে 'কে তুমি? কে তুমি'?
মধুর মোহের ভুল, এ মুখের নাই তুল—
স্বর্গের বাতাস বহে এ মুখটি চুমি!
পথিকের হৃদে আসি নাচিছে শোণিত রাশি,
অবাক্ হইয়া বসি রয়েছে সেথায়!
চমকি ক্ষণেক-পরে কহিল সুধীর স্বরে
বিমোহিত পান্থবর কমলাবালায়,
"সুন্দরি, আমি গো পান্থ দিক্‌ভ্রান্ত পথশ্রান্ত
উপস্থিত হইয়াছি বিজন কাননে!
কাল হতে ঘুরি ঘুরি শেষে এ কুটীরপুরী
আজিকার নিশিশেষে পড়িল নয়নে!
বালিকা! কি কব আর, আশ্রয় তোমার দ্বার
পান্থ পথহারা আমি করি গো প্রার্থনা।

জিজ্ঞাসা করি গো শেষে   মৃতে লয়ে ক্রোড়দেশে
কে তুমি কুটীরমাঝে বসি সুধাননা ?"
পাগলিনীপ্রায় বালা   হৃদয়ে পাইয়া জ্বালা
চমকিয়া বসে যেন জাগিয়া স্বপনে।
পিতার বদন-'পরে   নয়ন নিবিষ্ট ক'রে
স্থির হ'য়ে বসি রয় ব্যাকুলিত মনে।
নয়নে সলিল ঝরে,   বালিকা সমুচ্চ স্বরে
বিষাদে ব্যাকুলহৃদে কহে "পিতা— পিতা"।
কে দিবে উত্তর তোর,   প্রতিধ্বনি শোকে ভোর
রোদন করিছে সেও বিষাদে তাপিতা।
ধরিয়া পিতার গলে   আবার বালিকা বলে
উচ্চৈস্বরে "পিতা— পিতা", উত্তর না পায় !
তরুণী পিতার বুকে   বাহুতে ঢাকিয়া মুখে,
অবিরল নেত্রজলে বক্ষ ভাসি যায়।
শোকানলে জল ঢালা   সাঙ্গ হ'লে উঠে বালা,
শূন্য মনে উঠি বসে আঁখি অশ্রুময় !
বসিয়া বালিকা পরে   নিরখি পথিকবরে
সজল নয়ন মুছি ধীরে ধীরে কয়,
"কে তুমি জিজ্ঞাসা করি,   কুটীরে এলে কি করি—
আমি যে পিতারে ছাড়া জানি না কাহারে !
পিতার পৃথিবী এই,   কোনদিন কাহাকেই
দেখি নি ত এখানে এ কুটীরের দ্বারে !
কোথা হ'তে তুমি আজ   আইলে পৃথিবীমাঝ ?
কি ব'লে তোমারে আমি করি সম্বোধন ?
তুমি কি তাহাই হবে   পিতা যাহাদের সবে
'মানুষ' বলিয়া আহা করিত রোদন ?
কিম্বা জাগি প্রাতঃকালে   যাদের দেবতা ব'লে
নমস্কার করিতেন জনক আমার ?
বলিতেন যার দেশে   মরণ হইলে শেষে
যেতে হয়, সেথাই কি নিবাস তোমার ?—

নাম তার স্বর্গভূমি, আমারে সেথায় তুমি
ল'য়ে চল, দেখি গিয়া পিতায় মাতায়!
ল'য়ে চল দেব তুমি আমারে সেথায়।
যাইব মায়ের কোলে, জননীরে মাতা ব'লে
আবার সেখানে গিয়া ডাকিব তাঁহারে।
দাঁড়ায়ে পিতার কাছে জল দিব গাছে গাছে,
সঁপিব তাঁহার হাতে গাঁথি ফুলহারে!
হাতে ল'য়ে শুকপাখী বাবা মোর নাম ডাকি
'কমলা' বলিতে আহা শিখাবেন তারে!
লয়ে চল, দেব, তুমি সেথায় আমারে!
জননীর মৃত্যু হ'লে, ওই হোথা গাছতলে
রাখিয়াছিলেন তাঁরে জনক তখন!
ধবলতুষার ভার ঢাকিয়াছে দেহ তাঁর,
স্বরগের কুটীরেতে আছেন এখন!
আমিও তাঁহার কাছে করিব গমন!"
বালিকা থামিল সিক্ত হয়ে আঁখিজলে
পথিকেরো আঁখিদ্বয় হ'ল আহা অশ্রুময়,
মুছিয়া পথিক তবে ধীরে ধীরে বলে,
"আইস আমার সাথে, স্বর্গরাজ্য পাবে হাতে,
দেখিতে পাইবে তথা পিতায় মাতায়।
নিশা হ'ল অবসান, পাখীরা করিছে গান,
ধীরে ধীরে বহিতেছে প্রভাতের বায়!
আঁধার ঘোমটা তুলি প্রকৃতি নয়ন খুলি
চারি দিক ধীরে যেন করিছে বীক্ষণ—
আলোকে মিশিল তারা, শিশিরের মুক্তাধারা
গাছ পালা পুষ্প লতা করিছে বর্ষণ!
হোথা বরফের রাশি, মৃত দেহ রেখে আসি
হিমানীক্ষেত্রের মাঝে করায়ে শয়ান,
এই লয়ে যাই চ'লে, মুছে ফেল অশ্রুজলে—
অশ্রুবারিধারে আহা পূরেছে নয়ান!"

পথিক এতেক কয়ে মৃত দেহ তুলে লয়ে
হিমানীক্ষেত্রের মাঝে করিল প্রোথিত।
কুটীরেতে ধীরি ধীরি আবার আইল ফিরি,
কত ভাবে পথিকের চিত্ত আলোড়িত।
ভবিষ্যৎ-কলপনে কত কি আপন মনে
দেখিছে, হৃদয়পটে আঁকিতেছে কত—
দেখে পূর্ণচন্দ্র হাসে নিশিরে রজতবাসে
ঢাকিয়া, হৃদয় প্রাণ করি অবারিত—
জাহ্নবী বহিছে ধীরে, বিমল শীতল নীরে
মাখিয়া রজতরশ্মি গাহি কলকলে—
হরষে কম্পিত কায়, মলয় বহিয়া যায়
কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কুসুমের দলে—
ঘাসের শয্যার 'পরে ঈষৎ হেলিয়া পড়ে
শীতল করিছে প্রাণ শীত সমীরণ—
কবরীতে পুষ্পভার কে ও বাম পাশে তার,
বিধাতা এমন দিন হবে কি কখন?
অদৃষ্টে কি আছে আহা! বিধাতাই জানে তাহা
যুবক আবার ধীরে কহিল বালায়,
"কিসের বিলম্ব আর? ত্যজিয়া কুটীরদ্বার
আইস আমার সাথে, কাল বহে যায়!"
তুলিয়া নয়নদ্বয় বালিকা সুধীরে কয়,
বিষাদে ব্যাকুল আহা কোমল হৃদয়—
"কুটীর! তোদের সবে ছাড়িয়া যাইতে হবে,
পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয়।
হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি,
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়—
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়?
যাইব স্বরগভূমে, আহা হা! ত্যজিয়া ঘুমে

এতক্ষণে উঠেছেন জননী আমার—
এতক্ষণে ফুল তুলি গাঁথিছেন মালাগুলি,
শিশিরে ভিজিয়া গেছে আঁচল তাঁহার –
সেথাও হরিণ আছে, ফুল ফুটে গাছে গাছে,
সেখানেও শুক পাখী ডাকে ধীরে ধীরে !
সেথাও কুটীর আছে, নদী বহে কাছে কাছে,
পূর্ণ হয় সরোবর নির্ঝরের নীরে।
আইস ! আইস দেব ! যাই ধীরে ধীরে !
আয় পাখি ! আয় আয় ! কার তরে রবি হায়,
উড়ে যা উড়ে যা পাখি ! তরুর শাখায় !
প্রভাতে কাহারে পাখি ! জাগাবি রে ডাকি ডাকি
'কমলা !' 'কমলা !' বলি মধুর ভাষায় ?
ভুলে যা কমলা নামে, চলে যা সুখের ধামে,
'কমলা !' 'কমলা !' ব'লে ডাকিস নে আর।
চলিনু তোদের ছেড়ে, যা শুক শাখায় উড়ে—
চলিনু ছাড়িয়া এই কুটীরের দ্বার।
তবু উড়ে যাবি নে রে, বসিবি হাতের 'পরে ?
আয় তবে, আয় পাখি, সাথে সাথে আয়,
পিতার হাতের 'পরে আমার নামটি ধ'রে—
আবার আবার তুই ডাকিস্ সেথায়।
আইস পথিক তবে কাল ব'হে যায়।"
সমীরণ ধীরে ধীরে চুম্বিয়া তটিনীনীরে
দুলাইতে ছিল আহা লতায় পাতায়—
সহসা থামিল কেন প্রভাতের বায় ?
সহসা রে জলধর নব অরুণের কর
কেন রে ঢাকিল শৈল অন্ধকার ক'রে ?
পাপিয়া শাখার 'পরে ললিত সুধীর স্বরে
তেমনি কর-না গান, থামিলি কেন রে ?
ভুলিয়া শোকের জ্বালা ওই রে চলিছে বালা।
কুটীর ডাকিছে যেন 'যেও না—যেও না !'—

তটিনীতরঙ্গকুল   ভিজায়ে গাছের মূল
ধীরে ধীরে বলে যেন 'যেও না !   যেও না'—
বনদেবী নেত্র খুলি   পাতার আঙ্গুল তুলি
যেন বলিছেন আহা 'যেও না !—যেও না !'—
নেত্র তুলি স্বর্গ-পানে   দেখে পিতা মেঘযানে
হাত নাড়ি বলিছেন 'যেও না !—যেও না !'—
বালিকা পাইয়া ভয়   মুদিল নয়নদ্বয়,
এক পা এগোতে আর হয় না বাসনা—
আবার আবার শুন   কানের কাছেতে পুনঃ
কে কহে অস্ফুট স্বরে 'যেও না !—যেও না !'

তৃতীয় সর্গ

"যমুনার জল করে থল্ থল্
    কলকলে গাহি প্রেমের গান।
নিশার আঁচোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে
    সুধাকর খুলি হৃদয় প্রাণ :
বহিছে মলয় ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
    নুয়ে নুয়ে পড়ে কুসুমরাশি !
ধীরি ধীরি ধীরি ফুলে ফুলে ফিরি
    মধুকরী প্রেম আলাপে আসি !
আয় আয় সখি ! আয় দুজনায়
    ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা।
ফুলে ফুলে আলা বকুলের তলা,
    হেথায় আয় লো বিপিনবালা।

নতুন ফুটেছে মালতীর কলি,
　　ঢলি ঢলি পড়ে এ ওর পানে!
মধুবাসে ভুলি প্রেমালাপ তুলি
　　অলি কত কি-যে কহিছে কানে!
আয় বলি তোরে, আঁচলটি ভোরে
　　কুড়া-না হোথায় বকুলগুলি!
মাধবীর ভরে লতা নুয়ে পড়ে,
　　আমি ধীরি ধীরি আনি লো তুলি।
গোলাপ কত যে ফুটেছে কমলা,
　　দেখে যা দেখে যা বনের মেয়ে!
দেখ্‌সে হেথায় কামিনী পাতায়
　　গাছের তলাটি পড়েছে ছেয়ে।
আয় আয় হেথা, ওই দেখ্‌ ভাই,
　　ভ্রমরা একটি ফুলের কোলে—
কমলা, ফুঁ দিয়ে দে-না লো উড়িয়ে,
　　ফুলটা আমি লো নেব যে তুলে।
পারি না লো আর, আয় হেথা বসি
　　ফুলগুলি নিয়ে দুজনে গাঁথি!
হেথায় পবন খেলিছে কেমন
　　তটিনীর সাথে আমোদে মাতি!
আয় ভাই হেথা, কোলে রাখি মাথা
　　শুই একটুকু ঘাসের 'পরে—
বাতাস মধুর বহে ঝুরু ঝুর,
　　আঁখি মুদে আসে ঘুমের ভরে!
বল্‌ বনবালা এত কি লো জ্বালা!
　　রাত দিন তুই কাঁদিবি বসে!
আজো ঘুমঘোর ভাঙিল না তোর,
　　আজো মজিলি না সুখের রসে!
তবে যা লো ভাই! আমি একেলাই
　　রাশ্‌ রাশ্‌ করি গাঁথিয়া মালা।

তুই নদীতীরে কাঁদ্‌গে লো ধীরে
যমুনারে কহি মরমজ্বালা!
আজো তুই বোন! ভুলিবি নে বন?
পরণকুটীর যাবি নে ভুলে?
তোর ভাই মন কে জানে কেমন।
আজো বলিলি নে সকল খুলে?"
"কি বলিব বোন! তবে সব শোন্!"
কহিল কমলা মধুর স্বরে,
"লভেছি জনম করিতে রোদন
রোদন করিব জীবন ভোরে!
ভুলিব সে বন?— ভুলিব সে গিরি?
সুখের আলয় পাতার কুঁড়ে?
মৃগে যাব ভুলে— কোলে লয়ে তুলে
কচি কচি পাতা দিতাম ছিঁড়ে।
হরিণের ছানা একত্রে দুজনা
খেলিয়ে খেলিয়ে বেড়াত সুখে!
শিঙ ধরি ধরি খেলা করি করি
আঁচল জড়িয়ে দিতাম মুখে!
ভুলিব তাদের থাকিতে পরাণ?
হৃদয়ে সে সব থাকিতে লেখা?
পারিব ভুলিতে যত দিন চিতে
ভাবনার আহা থাকিবে রেখা?
আজ কত বড় হয়েছে তাহারা,
হয়ত আমার না দেখা পেয়ে
কুটীরের মাঝে খুঁজে খুঁজে খুঁজে
বেড়াতেছে আহা ব্যাকুল হয়ে!
শুয়ে থাকিতাম দুপরবেলায়
তাহাদের কোলে রাখিয়ে মাথা,
কাছে বসি নিজে গলপ কত যে
করিতেন আহা তখন মাতা!

গিরিশিরে উঠি করি ছুটাছুটি
হরিণের ছানাগুলির সাথে
তটিনীর পাশে দেখিতাম বসে
মুখছায়া যবে পড়িত তাতে !
সরসীভিতরে ফুটিলে কমল
তীরে বসি ঢেউ দিতাম জলে,
দেখি মুখ তুলে— কমলিনী দুলে
এপাশে ওপাশে পড়িতে ঢলে !
গাছের উপরে ধীরে ধীরে ধীরে
জড়িয়ে জড়িয়ে দিতেম লতা,
বসি একাকিনী আপনা-আপনি
কহিতাম ধীরে কত কি কথা !
ফুটিলে গো ফুল হরষে আকুল
হতেম, পিতারে কতেম গিয়ে !
ধরি হাতখানি আনিতাম টানি,
দেখাতেম তাঁরে ফুলটি নিয়ে !
তুষার কুড়িয়ে আঁচল ভরিয়ে
ফেলিতাম ঢালি গাছের তলে—
পড়িলে কিরণ, কত যে বরন
ধরিত, আমোদে যেতাম গলে !
দেখিতাম রবি বিকালে যখন
শিখরের শিরে পড়িত ঢোলে
করি ছুটাছুটি শিখরেতে উঠি
দেখিতাম দূরে গিয়াছে চোলে !
আবার ছুটিয়ে যেতাম সেখানে
দেখিতাম আরও গিয়াছে সোরে !
শ্রান্ত হয়ে শেষে কুটীরেতে এসে
বসিতাম মুখ মলিন কোরে !
শশধরছায়া পড়িলে সলিলে
ফেলিতাম জলে পাথরকুচি—

সরসীর জল উঠিত উথুলে,
শশধরছায়া উঠিত নাচি।
ছিল সরসীতে এক-হাঁটু জল,
ছুটিয়া ছুটিয়া যেতেম মাঝে,
চাঁদের ছায়ারে গিয়া ধরিবারে
আসিতাম পুনঃ ফিরিয়া লাজে।
তটদেশে পুনঃ ফিরি আসি পর
অভিমানভরে ঈষৎ রাগি
চাঁদের ছায়ায় ছুঁড়িয়া পাথর
মারিতাম— জল উঠিত জাগি।
যবে জলধর শিখরের 'পর
উড়িয়া উড়িয়া বেড়াত দলে,
শিখরেতে উঠি বেড়াতাম ছুটি—
কাপড়-চোপড় ভিজিত জলে!
কিছুই— কিছুই— জানিতাম না রে,
কিছুই হায় রে বুঝিতাম না।
জানিতাম হা রে জগৎমাঝারে
আমরাই বুঝি আছি কজনা!
পিতার পৃথিবী পিতার সংসার
একটি কুটীর পৃথিবীতলে
জানি না কিছুই ইহা ছাড়া আর—
পিতার নিয়মে পৃথিবী চলে!
আমাদেরি তরে উঠে রে তপন,
আমাদেরি তরে চাঁদিমা উঠে,
আমাদেরি তরে বহে গো পবন,
আমাদেরি তরে কুসুম ফুটে!
চাই না জেয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে।
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে,
শুকায়ে যেতেম বনের কোলে।

জানিব আমারি পৃথিবী ধরা,
খেলিব হরিণশাবক-সনে—
পুলকে হরষে হৃদয় ভরা,
বিষাদভাবনা নাহিক মনে।
তটিনী হইতে তুলিব জল,
ঢালি ঢালি দিব গাছের তলে।
পাখীরে বলিব 'কমলা বল্',
শরীরের ছায়া দেখিব জলে!
জেনেছি মানুষ কাহারে বলে।
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি রে হায় ভাল বাসিলে
কেমন আগুনে হৃদয় জ্বলে!
এখন আবার বেঁধেছি চুলে,
বাহুতে পরেছি সোনার বালা।
উরসেতে হার দিয়েছি তুলে,
কবরীর মাঝে মণির মালা!
বাকলের বাস ফেলিয়াছি দূরে—
শত শ্বাস ফেলি তাহার তরে,
মুছেছি কুসুম রেণুর সিঁদুরে
আজো কাঁদে হৃদি বিষাদভরে!
ফুলের বলয় নাইক হাতে,
কুসুমের হার ফুলের সিঁথি—
কুসুমের মালা জড়ায়ে মাথে
স্মরণে কেবল রাখিনু গাঁথি!
এলো এলো চুলে ফিরিব বনে
রুখো রুখো চুল উড়িবে বায়ে।
ফুল তুলি তুলি গহনে বনে
মালা গাঁথি গাঁথি পরিব গায়ে!
হায় রে সে দিন ভুলাই ভালো!
সাধের স্বপন ভাঙিয়া গেছে!

এখন মানুষে বেসেছি ভালো,
হৃদয় খুলিব মানুষ-কাছে !
হাসিব কাঁদিব মানুষের তরে,
মানুষের তরে বাঁধিব চুলে—
মাখিব কাজল আঁখিপাত ভ'রে,
কবরীতে মণি দিব রে তুলে।
মুছিনু নীরজা ! নয়নের ধার,
নিভালাম সখি হৃদয়জ্বালা !
তবে সখি আয় আয় দুজনায়
ফুল তুলে তুলে গাঁথি লো মালা !
এই যে মালতী তুলিয়াছ সতি !
এই যে বকুল ফুলের রাশি ;
জুঁই আর বেলে ভরেছ আঁচলে,
মধুপ ঝাঁকিয়া পড়িছে আসি !
এই হল মালা, আর না লো বালা—
শুই লো নীরজা ! ঘাসের 'পরে।
শুন্‌ছিস্ বোন ! শোন্ শোন্ শোন্ !
কে গায় কোথায় সুধার স্বরে !
জাগিয়া উঠিল হৃদয় প্রাণ !
স্মরণের জ্যোতি উঠিল জ্বলে !
ঘা দিয়েছে আহা মধুর গান
হৃদয়ের অতি গভীর তলে !
সেই-যে কানন পড়িতেছে মনে
সেই-যে কুটীর নদীর ধারে !
থাক্ থাক্ থাক্ হৃদয়বেদন
নিভাইয়া ফেলি নয়নধারে !
সাগরের মাঝে তরণী হতে
দূর হতে যথা নাবিক যত—
পায় দেখিবারে সাগরের ধারে
মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা ছায়ার মত !

তেমনি তেমনি উঠিয়াছে জাগি—
অস্ফুট অস্ফুট হৃদয়-'পরে
কি দেশ কি জানি, কুটীর দুখানি,
মাঠের মাঝেতে মহিষ চরে!
বুঝি সে আমার জনমভূমি
সেখান হইতে গেছিনু চলে!
আজিকে তা মনে জাগিল কেমনে
এত দিন সব ছিলুম ভুলে।
হেথায় নীরজা, গাছের আড়ালে
লুকিয়ে লুকিয়ে শুনিব গান,
যমুনাতীরেতে জ্যোছনার রেতে
গাইছে যুবক খুলিয়া প্রাণ!
কেও কেও ভাই? নীরদ বুঝি?
বিজয়ের[১] আহা প্রাণের সখা!
গাইছে আপন ভাবেতে মজি
যমুনা পুলিনে বসিয়ে একা!
যেমন দেখিতে গুণও তেমন,
দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো—
রূপে গুণে মাখা দেখি নি এমন,
নদীর ধারটি করেছে আলো।
আপনার ভাবে আপনি কবি
রাত দিন আহা রয়েছে ভোর।
সরল প্রকৃতি মোহনছবি
অবারিত সদা মনের দোর
মাথার উপরে জড়ান মালা—
নদীর উপরে রাখিয়া আঁখি
জাগিয়া উঠেছে নিশীথবালা
জাগিয়া উঠেছে পাপিয়া পাখী!

১ কমলাকে যিনি সংসারে আনেন।

আয় না লো ভাই গাছের আড়ালে
আয় আর একটু কাছেতে সরে
এই খানে আয় শুনি দুজনায়
কি গায় নীরদ সুধার স্বরে !"

গান।

"মোহিনী কল্পনে ! আবার আবার—
মোহিনী বীণাটি বাজাও না লো !
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার
হৃদয়ে শ্রবণে জীবনে ঢালো !
ভুলিব সকল— ভুলেছি সকল—
কমলচরণে ঢেলেছি প্রাণ !
ভুলেছি— ভুলিব— শোক-অশ্রুজল,
ভুলিছি বিষয়, গরব, মান !

শ্রবণ জীবন হৃদয় ভরি
বাজাও সে বীণা বাজাও বালা !
নয়নে রাখিব নয়নবারি
মরমে নিবারি মরমজ্বালা !

অবোধ হৃদয় মানিবে শাসন
শোকবারিধারা মানিবে বারণ,
কি যে ও বীণায় মধুর মোহন
হৃদয় পরাণ সবাই জানে—
যখনি শুনি ও বীণার স্বরে
মধুর সুধায় হৃদয় ভরে,
কি জানি কিসের ঘুমের ঘোরে
আকুল করে যে ব্যাকুল প্রাণে !

কি জানি লো বালা! কিসের তরে
হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া উঠে।
কি জানি কি ভাব ভিতরে ভিতরে
জাগিয়া উঠেছে হৃদয় পুটে!

অস্ফুট মধুর স্বপনে যেমন
জাগি উঠে হৃদে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি!
বাঁশরীর ধ্বনি নিশীথে যেমন
সুধীরে গভীরে মোহিয়া শ্রবণ
জাগায় হৃদয়ে কি জানি কেমন
কি ভাব কে জানে কিসের লাগি।
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত এ মনে,
দিয়াছে জাগায়ে ঘুমন্ত স্মরণে,
ঘুমন্ত পরাণ উঠেছে জাগি!

ভেবেছিনু হায় ভুলিব সকল
সুখ দুখ শোক হাসি অশ্রুজল
আশা প্রেম যত ভুলিব— ভুলিব—
আপনা ভুলিয়া রহিব সুখে!
ভেবেছিনু হায় কল্পনাকুমারী
বীণাস্বরসুধা পিইয়া তোমারি
হৃদয়ের ক্ষুধা রাখিব নিবারি
পাশরি সকল বিষাদ দুখে!

প্রকৃতিশোভায় ভরিব নয়নে,
নদীকলস্বরে ভরিব শ্রবণে
বীণার সুধায় হৃদয় ভরি!
ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়,
ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায়
ফেলে কি না ধরা নয়নবারি!

কই তা পারিনু শোভনা কল্পনে !
বিস্মৃতির জলে ডুবাইতে মনে !
আঁকা যে মূরতি হৃদয়ের তলে
মুছিতে লো তাহা যতন করি !
দেখ লো এখন অবারি হৃদয়
মরম-আধার হুতাশনময়,
শিরায় শিরায় বহিছে অনল
জলন্ত জ্বালায় হৃদয় ভরি !

প্রেমের মূরতি হৃদয়গুহায়
এখনো স্থাপিত রয়েছে রে হায় !
বিষাদ-অনলে আহুতি দিয়া
বলো তুমি তবে বলো কলপনে
যে মূরতি আঁকা হৃদয়ের সনে
কেমনে ভুলিব থাকিতে হিয়া।

কেমনে ভুলিব থাকিতে পরাণ
কেমনে ভুলিব থাকিতে জ্ঞেয়ান
পাষাণ না হলে হৃদয় দেহ !
তাই বলি বালা ! আবার— আবার
স্বর্গ হতে আনি অমৃতের ধার—
ঢাল গো হৃদয়ে সুধার স্নেহ।

শুকায়ে যাউক সজল নয়ান,
হৃদয়ের জ্বালা নিবুক হৃদে,
রেখো না হৃদয়ে একটুকু খান
বিষাদ বেদনা যেখানে বিঁধে।

কেন লো— কেন লো— ভুলিব কেন লো—
এত দিন যারে বেসেছিনু ভাল
হৃদয় পরাণ দেছিনু যারে—

স্থাপিয়া যাহারে হৃদয়াসনে
পূজা করেছিনু দেবতা-সনে
কোন্ প্রাণে আজি ভুলিব তারে !—

দ্বিগুণ জ্বলুক হৃদয়-আগুন।
দ্বিগুণ বহুক বিষাদধারা।
স্মরণের আভা ফুটুক দ্বিগুণ।
হোক হৃদিপ্রাণ পাগল পারা।

প্রেমের প্রতিমা আছে যা হৃদয়ে
মরমশোণিতে আছে যা গাঁথা—
শত শত শত অশ্রু বারিচয়ে
দিব উপহার দিব রে তথা।

এত দিন যার তরে অবিরল
কেঁদেছিনু হায় বিষাদভরে,
আজিও— আজিও— নয়নের জল
বরষিবে আঁখি তাহারি তরে।

এত দিন ভাল বেসেছিনু যারে
হৃদয় পরাণ দেছিনু খুলে—
আজিও রে ভাল বাসিব তাহারে,
পরাণ থাকিতে যাব না ভুলে।

হৃদয়ের এই ভগনকুটীরে
প্রেমের প্রদীপ করেছে আলা—
যেন রে নিবিয়া না যায় কখনো
সহস্র কেন রে পাই-না জ্বালা।

কেবল দেখিব সেই মুখখানি,
দেখিব সেই সে গরব হাসি।

উপেক্ষার সেই কটাক্ষ দেখিব,
অধরের কোণে ঘৃণার রাশি।

তবু কল্পনা কিছু ভুলিব না!
সকলি হৃদয়ে থাকুক গাঁথা—
হৃদয়ে, মরমে, বিষাদবেদনা
যত পারে তারে দিক না ব্যথা।

ভুলিব না আমি সেই সন্ধ্যাবায়,
ভুলিব না ধীরে নদী ব'হে যায়,
ভুলিব না হায় সে মুখশশী।
হব না— হব না— হব না বিস্মৃত,
যত দিন দেহে রহিবে শোণিত,
জীবন তারকা না যাবে খসি।
প্রেমগান কর তুমি কল্পনা!
প্রেমগীতে মাতি বাজুক বীণা!
শুনিব, কাঁদিব হৃদয় ঢালি!
নিরাশ প্রণয়ী কাঁদিবে নীরবে।—
বাজাও বাজাও বীণাসুধারবে
নব অনুরাগ হৃদয়ে জ্বালি!

প্রকৃতিশোভায় ভরিব নয়নে,
নদীকলস্বরে ভরিব শ্রবণে,
প্রেমের প্রতিমা হৃদয়ে রাখি।
গাও গো তটিনী প্রেমের গান,
ধরিয়া অস্ফুট মধুর তান
প্রেমগান কর বনের পাখী।"

কহিল কমলা "শুনেছিস্ ভাই
বিষাদে দুঃখে যে ফাটিছে প্রাণ!

কিসের লাগিয়া, মরমে মরিয়া
করিছে অমন খেদের গান ?
কারে ভাল বাসে ? কাঁদে কার তরে ?
কার তরে গায় খেদের গান ?
কার ভালবাসা পায় নাই ফিরে
সঁপিয়া তাহারে হৃদয় প্রাণ ?

ভালবাসা আহা পায় নাই ফিরে !
অমন দেখিতে অমন আহা !
নবীন যুবক ভাল বাসে কি রে ?
কারে ভাল বাসে জানিস্ তাহা ?

বসেছিনু কাল ওই গাছতলে
কাঁদিতে ছিলেম কত কি ভাবি—
যুবক তখনি সুধীরে আপনি
প্রাসাদ হইতে আইল নাবি ।

কহিল 'শোভনে ! ডাকিছে বিজয়,
আমার সহিত আইস তথা ।'
কেমন আলাপ ! কেমন বিনয় !
কেমন সুধীর মধুর কথা !

চাইতে নারিনু মুখপানে তাঁর,
মাটির পানেতে রাখিয়ে মাথা
শরমে পাশরি বলি বলি করি
তবুও বাহির হ'ল না কথা !

কাল হতে ভাই ! ভাবিতেছি তাই
হৃদয় হয়েছে কেমন ধারা !
থাকি থাকি থাকি উঠি লো চমকি,
মনে হয় কার পাইনু সাড়া !

কাল হ'তে তাই মনের মতন
বাঁধিয়াছি চুল করিয়া যতন,
কবরীতে তুলে দিয়াছি রতন,
চুলে সঁপিয়াছি ফুলের মালা,
কাজল মেখেছি নয়নের পাতে,
সোনার বলয় পরিয়াছি হাতে,
রজতকুসুম সঁপিয়াছি মাথে,
কি কহিব সখি! এমন জ্বালা!"

চতুর্থ সর্গ

নিভৃত যমুনাতীরে বসিয়া রয়েছে কি রে
কমলা নীরদ দুই জনে?
যেন দোঁহে জ্ঞানহত—নীরব চিত্রের মত
দোঁহে দোঁহা হেরে একমনে।

দেখিতে দেখিতে কেন অবশ পাষাণ হেন,
চখের পলক নাহি পড়ে।
শোণিত না চলে বুকে, কথাটি না ফুটে মুখে,
চুলটিও না নড়ে না চড়ে!

মুখ ফিরাইল বালা, দেখিল জোছনামালা
খসিয়া পড়িছে নীল যমুনার নীরে—
অস্ফুট কল্লোলস্বর উঠিছে আকাশ-'পর
অর্পিয়া গভীর ভাব রজনী-গভীরে!

দেখিছে লুটায় ঢেউ আবার লুটায়,
দিগন্তে খেলায়ে পুনঃ দিগন্তে মিলায়!
দেখে শূন্য নেত্র তুলি— খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি
জ্যোছনা মাখিয়া গায়ে উড়ে উড়ে যায়।

একখণ্ড উড়ে যায় আর খণ্ড আসে
ঢাকিয়া চাঁদের ভাতি মলিন করিয়া রাতি
মলিন করিয়া দিয়া সুনীল আকাশে।

পাখী এক গেল উড়ে নীল নভোতলে,
ফেনখণ্ড গেল ভেসে নীল নদীজলে,
দিবা ভাবি অতিদূরে আকাশ সুধায় পূরে
ডাকিয়া উঠিল এক প্রমুগ্ধ পাপিয়া।
পিউ, পিউ, শূন্যে ছুটে উচ্চ হতে উচ্চে উঠে—
আকাশ সে সূক্ষ্ম স্বরে উঠিল কাঁপিয়া।

বসিয়া গণিল বালা কত ঢেউ করে খেলা,
কত ঢেউ দিগন্তের আকাশে মিলায়,
কত ফেন করি খেলা লুটায়ে চুম্বিছে বেলা,
আবার তরঙ্গে চড়ি সুদূরে পলায়।

দেখি দেখি থাকি থাকি আবার ফিরায়ে আঁখি
নীরদের মুখপানে চাহিল সহসা—
আধেক মুদিত নেত্র অবশ পলকপত্র—
অপূর্ব্ব মধুর ভাবে বালিকা বিবশা!

নীরদ ক্ষণেক পরে উঠে চমকিয়া,
অপূর্ব্ব স্বপন হতে জাগিল যেন রে।
দূরেতে সরিয়া গিয়া থাকিয়া থাকিয়া
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে—

"সে কি কথা শুধাইছ বিপিনরমণী !
ভালবাসি কিনা আমি তোমারে কমলে ?
পৃথিবী হাসিয়া যে লো উঠিবে এখনি !
কলঙ্ক রমণী নামে রটিবে তা হ'লে ?

ও কথা শুধাতে আছে ? ও কথা ভাবিতে আছে !
ওসব কি স্থান দিতে আছে মনে মনে ?
বিজয় তোমার স্বামী বিজয়ের পত্নী তুমি
সরলে ! ও কথা তবে শুধাও কেমনে ?

তবুও শুধাও যদি দিব না উত্তর !—
হৃদয়ে যা লিখা আছে দেখাবো না কারো কাছে,
হৃদয়ে লুকান রবে আমরণ কাল !
রুদ্ধ অগ্নিরাশিসম দহিবে হৃদয় মম
ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া যাবে হৃদিগ্রন্থিজাল।

যদি ইচ্ছা হয় তবে লীলা সমাপিয়া ভবে
শোণিতধারায় তাহা করিব নির্ব্বাণ।
নহে অগ্নিশৈলসম জ্বলিবে হৃদয় মম
যত দিন দেহমাঝে রহিবেক প্রাণ !

যে তোমারে বন হতে এনেছে উদ্ধারি
যাহারে করেছ তুমি পাণি সমর্পণ
প্রণয় প্রার্থনা তুমি করিও তাহারি—
তারে দিও যাহা তুমি বলিবে আপন !

চাই না বাসিতে ভাল, ভাল বাসিব না।
দেবতার কাছে এই করিব প্রার্থনা—
বিবাহ করেছ যারে সুখে থাক লয়ে তারে
বিধাতা মিটান তব সুখের কামনা !"

"বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি"
কহিল কমলা তবে বিপিনকামিনী,
"কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখি নি।

এইটুকু জানি শুধু এইটুকু জানি,
দেখিবারে আঁখি মোর ভালবাসে যারে
শুনিতে বাসি গো ভাল যার সুধাবাণী—
শুনিব তাহার কথা দেখিব তাহারে!

ইহাতে পৃথিবী যদি কলঙ্ক রটায়
ইহাতে হাসিয়া যদি উঠে সব ধরা
বল গো নীরদ আমি কি করিব তায়?
রটায়ে কলঙ্ক তবে হাসুক না তারা।

বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহি না—
তাহারে বাসিব ভাল, ভালবাসি যারে!
তাহারই ভালবাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসে না ভাল, ভালবাসি যারে।"

নীরদ অবাক রহি কিছুক্ষণ পরে
বালিকারে সম্বোধিয়া কহে মৃদুস্বরে,
"সে কি কথা বল বালা, যে জন তোমারে
বিজন কানন হতে করিয়া উদ্ধার
আনিল, রাখিল যত্নে সুখের আগারে—
সে কেন গো ভালবাসা পাবে না তোমার?

হৃদয় সঁপেছে যে লো তোমারে নবীনা
সে কেন গো ভালবাসা পাবে না তোমার?"
কমলা কহিল ধীরে, "আমি তা জানি না।"
নীরদ সমুচ্চ স্বরে কহিল আবার—

"তবে যা লো দুশ্চারিণী ! যেথা ইচ্ছা তোর
কর্ তাই যাহা তোর কহিবে হৃদয়—
কিন্তু যত দিন দেহে প্রাণ রবে মোর—
তোর এ প্রণয়ে আমি দিব না প্রশ্রয় !

আর তুই পাইবি না দেখিতে আমারে
জ্বলিব যদিন আমি জীবন-অনলে—
স্বরগে বাসিব ভাল যা খুসী যাহারে
প্রণয়ে সেথায় যদি পাপ নাহি বলে !

কেন বল্ পাগলিনী ! ভালবাসি মোরে
অনলে জ্বালিতে চাস্ এ জীবন তোরে !
বিধাতা যে কি আমায় লিখেছে কপালে !
যে গাছে রোপিতে যাই শুকায় সমূলে।"

ভর্ৎসনা করিবে ছিল নীরদের মনে—
আদরেতে স্বর কিন্তু হয়ে এল নত !
কমলা নয়নজল ভরিয়া নয়নে
মুখপানে চাহি রয় পাগলের মত !

নীরদ উদ্গামী অশ্রু করি নিবারিত
সবেগে সেথান হতে করিল প্রয়াণ।
উচ্ছ্বাসে কমলা বালা উন্মত্ত চিত
অঞ্চল করিয়া সিক্ত মুছিল নয়ান।

পঞ্চম সর্গ

বিজয় নিভৃতে কি কহে নিশীথে ?
কি কথা শুধায় নীরজা বালায়—
দেখেছ, দেখেছ হোথা ?
ফুলপাত্র হতে ফুল তুলি হাতে
নীরজা গুনিছে, কুসুম গুণিছে,
মুখে নাই কিছু কথা।
বিজয় শুধায়— কমলা তাহারে
গোপনে, গোপনে ভালবাসে কি রে ?
তার কথা কিছু বলে কি সখীরে ?
যতন করে কি তাহার তরে।
আবার কহিল, "বলো কমলায়
বিজন কানন হইতে যে তায়
করিয়া উদ্ধার সুখের ছায়ায়
আনিল, হেলা কি করিবে তারে ?
যদি সে ভাল না বাসে আমায়
আমি কিন্তু ভালবাসিব তাহায়
যত দিন দেহে শোণিত চলে।"
বিজয় যাইল আবাস ভবনে
নিদ্রায় সাধিতে কুসুমশয়নে।
বালিকা পড়িল ভূমির তলে।
বিবর্ণ হইল কপোল বালার,
অবশ হইয়ে এল দেহভার—
শোণিতের গতি থামিল যেন !
ও কথা শুনিয়া নীরজা সহসা
কেন ভূমিতলে পড়িল বিবশা ?
দেহ থর থর কাঁপিছে কেন ?

ক্ষণেকের পরে লভিয়া চেতন,
বিজয়-প্রাসাদে করিল গমন,
দ্বারে ভর দিয়া চিন্তায় মগন
দাঁড়ায়ে রহিল কেন কে জানে ?
বিজয় নীরবে ঘুমায় শয্যায়,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিতেছে বায়,
নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে !
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি !
ভয়ে, ভয়ে ধীরে মুদিত নয়ন
পৃথিবীর শিশু ক্ষুদ্র-প্রাণমন—
অনিমেষ আঁখি এড়াতে তখন
অবশ্য দুয়ার ধরিত চাপি !
ধীরে, ধীরে, ধীরে খুলিল দুয়ার,
পদাঙ্গুলি 'পরে সঁপি দেহভার
কেও বামা ভয়ে প্রবেশিছে ঘরে
ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিয়া ভয়ে !
একদৃষ্টে চাহি বিজয়ের মুখে
রহিল দাঁড়ায়ে শয্যার সমুখে,
নেত্রে বহে ধারা মরমের দুখে,
ছবিটির মত অবাক্ হয়ে !
ভিন্ন ওষ্ঠ হতে বহিছে নিশ্বাস—
দেখিছে নীরজা, ফেলিতেছে শ্বাস,
সুখের স্বপন দেখিয়ে তখন
ঘুমায় যুবক প্রফুল্লমুখে !
'ঘুমাও বিজয় ! ঘুমাও গভীরে—
দেখো না দুখিনী নয়নের নীরে

করিছে রোদন তোমারি কারণ—
ঘুমাও বিজয় ঘুমাও সুখে !
দেখো না তোমারি তরে একজন
সারা নিশি দুখে করি জাগরণ
বিছানার পাশে করিছে রোদন—
তুমি ঘুমাইছ ঘুমাও ধীরে !
দেখো না বিজয় ! জাগি সারা নিশি
প্রাতে অন্ধকার যাইলে গো মিশি
আবাসেতে ধীরে যাইব গো ফিরে—
তিতিয়া বিষাদে নয়ননীরে
ঘুমাও বিজয় । ঘুমাও ধীরে !'

ষষ্ঠ সর্গ

"কমলা ভুলিবে সেই শিখর কানন,
কমলা ভুলিবে সেই বিজন কুটীর—
আজ হতে নেত্র ! বারি কোরো না বর্ষণ,
আজ হ'তে মন প্রাণ হও গো সুস্থির ।

অতীত ও ভবিষ্যত হইব বিস্মৃত ।
জুড়িয়াছে কমলার তপন হৃদয় !
সুখের তরঙ্গ হৃদে হয়েছে উত্থিত,
সংসার আজিকে হোতে দেখি সুখময় ।

বিজয়েরে আর করিব না তিরস্কার
সংসারকাননে মোরে আনিয়াছে বলি ।
খুলিয়া দিয়াছে সে যে হৃদয়ের দ্বার,
ফুটায়েছে হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি !

জমি জমি জলরাশি পর্ব্বতগুহায়
একদিন উথলিয়া উঠে রে উচ্ছ্বাসে,
একদিন পূর্ণ বেগে প্রবাহিয়া যায়,
গাহিয়া সুখের গান যায় সিন্ধুপাশে।—

আজি হতে কমলার নূতন উচ্ছ্বাস,
বহিতেছে কমলার নূতন জীবন।
কমলা ফেলিবে আহা নূতন নিশ্বাস,
কমলা নূতন বায়ু করিবে সেবন।

কাঁদিতে ছিলাম কাল বকুলতলায়,
নিশার আঁধারে অশ্রু করিয়া গোপন!
ভাবিতে ছিলাম বসি পিতায় মাতায়—
জানি না নীরদ আহা এয়েছে কখন।

সেও কি কাঁদিতে ছিল পিছনে আমার?
সেও কি কাঁদিতে ছিল আমারি কারণ?
পিছনে ফিরিয়া দেখি মুখপানে তার,
মন যে কেমন হল জানে তাহা মন।

নীরদ কহিল হৃদি ভরিয়া সুধায়—
'শোভনে! কিসের তরে করিছ রোদন?'
আহা হা! নীরদ যদি আবার শুধায়,
'কমলে! কিসের তরে করিছ রোদন?'

বিজয়েরে বলিয়াছি প্রাতঃকালে কাল—
একটি হৃদয়ে নাই দুজনের স্থান!
নীরদেই ভালবাসা দিব চিরকাল,
প্রণয়ের করিব না কভু অপমান।

ওই যে নীরজা আসে পরাণ-সজনী,
একমাত্র বন্ধু মোর পৃথিবীমাঝার!
হেন বন্ধু আছে কি রে নির্দ্দয় ধরণী!
হেন বন্ধু কমলা কি পাইবেক আর?

ওকি সখি কোথা যাও? তুলিবে না ফুল?
নীরজা, আজিকে সই গাঁথিবে না মালা?
ওকি সখি আজ কেন বাঁধ নাই চুল?
শুকনো শুকনো মুখ কেন আজি বালা?

মুখ ফিরাইয়া কেন মুছ আঁখিজল?
কোথা যাও, কোথা সই, যেও না, যেও না!
কি হয়েছে? বল্‌বি নে— বল্ সখি বল্!
কি হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা?"

"কি হয়েছে, কে দিয়েছে, বলি গো সকল।
কি হয়েছে, কে দিয়েছে কিসের যাতনা—
ফেলিব যে চিরকাল নয়নের জল
নিভায়ে ফেলিতে বালা মরমবেদনা!

কে দিয়েছে মনমাঝে জ্বালায়ে অনল?
বলি তবে তুই সখি তুই! আর নয়—
কে আমার হৃদয়েতে ঢেলেছে গরল?
কমলারে ভালবাসে আমার বিজয়!

কেন হলুম না বালা আমি তোর মত,
বন হতে আসিতাম বিজয়ের সাথে—
তোর মত কমলা লো মুখ আঁখি যত
তা হলে বিজয়-মন পাইতাম হাতে!

পরাণ হইতে অগ্নি নিভিবে না আর
বনে ছিলি বনবালা সে ত বেশ ছিলি—
আলালি !— জলিলি বোন ! খুলি মর্ম্মদ্বার—
কাঁদিতে করিগে যত্ন যেথা নিরিবিলি।"

কমলা চাহিয়া রয়, নাহি বহে শ্বাস।
হৃদয়ের গূঢ় দেশে অশ্রুরাশি মিলি
ফাটিয়া বাহির হতে করিল প্রয়াস—
কমলা কহিল ধীরে "জ্বালালি জ্বলিলি !"

আবার কহিল ধীরে, আবার হেরিল নীরে
যমুনাতরঙ্গে খেলে পূর্ণ শশধর—
তরঙ্গের ধারে ধারে রঞ্জিয়া রজতধারে
সুনীল সলিলে ভাসে রজতময় কর !

হেরিল আকাশ-পানে সুনীল জলদযানে
ঘুমায়ে চন্দ্রিমা ঢালে হাসি এ নিশীথে।
কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পাগল বনের মেয়ে
আকুল কত কি মনে লাগিল ভাবিতে !

"ওই খানে আছে পিতা, ওই খানে আছে মাতা,
ওই জ্যোৎস্নাময় চাঁদে করি বিচরণ
দেখিছেন হোথা হোতে দাঁড়ায়ে সংসারপথে
কমলা নয়নবারি করিছে মোচন।

একি রে পাপের অশ্রু ? নীরদ আমার—
নীরদ আমার যথা আছে লুক্কায়িত,
সেই খান হোতে এই অশ্রুবারিধার
পূর্ণ উৎস-সম আজ হ'ল উৎসারিত।

এ ত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?
বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার
ভাল বাসিব না? হায় এ হৃদয় তবে
বজ্র দিয়া দিক বিধি ক'রে চুরমার!

এ বক্ষে হৃদয় নাই, নাইক পরাণ,
একখানি প্রতিমূর্ত্তি রেখেছি শরীরে—
রহিবে, যদিন প্রাণ হবে বহমান
রহিবে, যদিন রক্ত রবে শীরে শীরে!

সেই মূর্ত্তি নীরদের! সে মূর্ত্তি মোহন
রাখিলে বুকের মধ্যে পাপ কেন হবে?
তবুও সে পাপ— আহা নীরদ যখন
বলেছে, নিশ্চয় তারে পাপ বলি তবে!

তবু মুছিব না অশ্রু এ নয়ান হোতে,
কেন বা জানিতে চাব পাপ কারে বলি?
দেখুক জনক মোর ওই চন্দ্র হোতে
দেখুন জননী মোর আঁখি দুই মেলি!

নীরজা গাইত 'চল্ চন্দ্রলোকে র'বি।
সুধাময় চন্দ্রলোক, নাই সেথা দুখ শোক,
সকলি সেথায় নব ছবি!

ফুলবক্ষে কীট নাই, বিদ্যুতে অশনি নাই,
কাঁটা নাই গোলাপের পাশে!
হাসিতে উপেক্ষা নাই, অশ্রুতে বিষাদ নাই,
নিরাশার বিষ নাই শ্বাসে।

নিশীথে আঁধার নাই, আলোকে তীব্রতা নাই,
কোলাহল নাইক দিবায় !
আশায় নাইক অন্ত, নূতনত্বে নাই অন্ত,
তৃপ্তি নাই মাধুর্য্যশোভায় ।

লতিকা কুসুমময়, কুসুম সুরভিময়,
সুরভি মৃদুতাময় যেথা !
জীবন স্বপনময়, স্বপন প্রমোদময়,
প্রমোদ নূতনময় সেথা !

সঙ্গীত উচ্ছ্বাসময়, উচ্ছ্বাস মাধুর্য্যময়,
মাধুর্য্য মত্ততাময় অতি ।
প্রেম অস্ফুটতামাখা, অস্ফুটতা স্বপ্নমাখা,
স্বপ্নে-মাখা অস্ফুটিত জ্যোতি !

গভীর নিশীথে যেন, দূর হোতে স্বপ্ন-হেন
অস্ফুট বাঁশীর মৃদু রব—
সুধীরে পশিয়া কানে শ্রবণ হৃদয় প্রাণে
আকুল করিয়া দেয় সব ।

এখানে সকলি যেন অস্ফুট মধুর-হেন,
উষার সুবর্ণ জ্যোতি-প্রায় ।
আলোকে আঁধার মিশে মধু জ্যোছনায় দিশে
রাখিয়াছে ভরিয়া সুধায় !

দূর হোতে অপ্সরার মধুর গানের ধার,
নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ।
নদীর অস্ফুট তান মলয়ের মৃদুগান
একস্তরে মিশেছে এমনি !

সকলি অস্ফুট হেথা মধুর স্বপনে-গাঁথা
চেতনা মিশান' যেন ঘুমে।
অশ্রু শোক দুঃখ ব্যথা কিছুই নাহিক হেথা
জ্যোতির্ময় নন্দনের ভুমে!'

আমি যাব সেই খানে পুলকপ্রমত্ত প্রাণে
সেই দিনকার মত বেড়াব খেলিয়া—
বেড়াব তটিনীতীরে, খেলাব তটিনীনীরে,
বেড়াইব জ্যোছনায় কুসুম তুলিয়া!

শুনিছি মৃত্যুর পিছু পৃথিবীর সব-কিছু
ভুলিতে হয় নাকি গো যা আছে এখানে!
ওমা! সে কি করে হবে? মরিতে চাই না তবে
নীরদে ভুলিতে আমি চাব কোন্ প্রাণে?"

কমলা এতেক পরে হেরিল সহসা
নীরদ কাননপথে যাইছে চলিয়া—
মুখপানে চাহি রয় বালিকা বিবশা,
হৃদয়ে শোণিতরাশি উঠে উথলিয়া।

নীরদের স্কন্ধে খেলে নিবিড় কুন্তল,
দেহ আবরিয়া রহে গৈরিক বসন,
গভীর ঔদাস্যে যেন পূর্ণ হৃদিতল—
চলিছে যে দিকে যেন চলিছে চরণ।

যুবা কমলারে দেখি ফিরাইয়া লয় আঁখি,
চলিল ফিরায়ে মুখ দীর্ঘশ্বাস ফেলি।
যুবক চলিয়া যায় বালিকা তবুও হায়!
চাহি রয় একদৃষ্টে আঁখিদ্বয় মেলি।

ঘুম হ'তে যেন জাগি   সহসা কিসের লাগি
 ছুটিয়া পড়িল গিয়া নীরদের পায়।
যুবক চমকি প্রাণে   হেরি চারি দিক-পানে
 পুনঃ না করিয়া দৃষ্টি ধীরে চলি যায়।

"কোথা যাও— কোথা যাও— নীরদ! যেও না!
 একটি কহিব কথা শুন একবার!
মুহূর্ত্ত – মুহূর্ত্ত রও— পুরাও কামনা!
 কাতরে দুখিনী আজি কহে বার বার!

জিজ্ঞাসা করিবে নাকি আজি যুবাবর
 'কমলা কিসের তরে করিছ রোদন?'
তা হলে কমলা আজি দিবেক উত্তর,
 কমলা খুলিবে আজি হৃদয়বেদন।

দাঁড়াও— দাঁড়াও যুবা! দেখি একবার,
 যেথা ইচ্ছা হয় তুমি যেও তার পর!
কেন গো রোদন করি শুধাও আবার,
 কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর!

কমলা আজিকে তার দিবেক উত্তর,
 কমলা হৃদয় খুলি দেখাবে তোমায়—
সেথায় রয়েছে লেখা দেখো তার পর
 কমলা রোদন করে কিসের জ্বালায়!"

"কি কব কমলা আর কি কব তোমায়,
 জনমের মত আজ লইব বিদায়!
ভেঙ্গেছে পাষাণ প্রাণ,   ভেঙ্গেছে সুখের গান—
 এ জন্মে সুখের আশা রাখি নাক আর!

এ জন্মে মুছিব নাক নয়নের ধার !
কত দিন ভেবেছিনু যোগীবেশ ধরে
ভ্রমিব যেথায় ইচ্ছা কানন-প্রান্তরে।

তবু বিজয়ের তরে এত দিন ছিনু ঘরে
হৃদয়ের জ্বালা সব করিয়া গোপন—
হাসি টানি আনি মুখে এত দিন দুখে দুখে
ছিলাম, হৃদয় করি অনলে অর্পণ !

কি আর কহিব তোরে— কালিকে বিজয় মোরে
কহিল জন্মের মত ছাড়িতে আলয় !
জানেন জগৎস্বামী— বিজয়ের তরে আমি
প্রেম বিসর্জ্জিয়াছিনু তুষিতে প্রণয়।"

এত বলি নীরবিল ক্ষুব্ধ যুবাবর !
কাঁপিতে লাগিল কমলার কলেবর,
নিবিড় কুন্তল যেন উঠিল ফুলিয়া—
যুবারে সম্ভাষে বালা, এতেক বলিয়া—

"কমলা তোমারে আহা ভালবাসে বোলে
তোমারে করেছে দূর নিষ্ঠুর বিজয় !
প্রেমেরে ডুবাব আজি বিস্মৃতির জলে,
বিস্মৃতির জলে আজি ডুবাব হৃদয় !

তবুও বিজয় তুই পাবি কি এ মন ?
নিষ্ঠুর ! আমারে আর পাবি কি কখন ?
পদতলে পড়ি মোর দেহ কর ক্ষয়—
তবু কি পারিবি চিত্ত করিবারে জয় ?

তুমিও চলিলে যদি হইয়া উদাস—
কেন গো বহিব তবে এ হৃদি হতাশ ?

আমিও গো আভরণ ভূষণ ফেলিয়া
যোগিনী তোমার সাথে যাইব চলিয়া।

যোগিনী হইয়া আমি জন্মেছি যখন
যোগিনী হইয়া প্রাণ করিব বহন।
কাজ কি এ মণি মুক্তা রজত কাঞ্চন—
পরিব বাকলবাস ফুলের ভূষণ।

নীরদ! তোমার পদে লইনু শরণ—
লয়ে যাও যেথা তুমি করিবে গমন!
নতুবা যমুনাজলে এখনই অবহেলে
ত্যজিব বিষাদদগ্ধ নারীর জীবন!"

পড়িল ভূতলে কেন নীরদ সহসা ?
শোণিতে মৃত্তিকাতল হইল রঞ্জিত!
কমলা চমকি দেখে সভয়ে বিবশা
দারুণ ছুরিকা পৃষ্ঠে হয়েছে নিহিত!

কমলা সভয়ে শোকে করিল চিৎকার।
রক্তমাখা হাতে ওই চলিছে বিজয়!
নয়নে আঁচল চাপি কমলা আবার—
সভয়ে মুদিয়া আঁখি স্থির হ'য়ে রয়।

আবার মেলিয়া আঁখি মুদিল নয়নে,
ছুটিয়া চলিল বালা যমুনার জলে—
আবার আইল ফিরি যুবার সদনে,
যমুনা- শীতল জলে ভিজায়ে আঁচলে।

যুবকের ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া আঁচল
কমলা একেলা বসি রহিল তথায়—

এক বিন্দু পড়িল না নয়নের জল,
　　এক বারো বহিল না দীর্ঘশ্বাস-বায়।

তুলি নিল যুবকের মাথা কোল-'পরে—
　　একদৃষ্টে মুখপানে রহিল চাহিয়া।
নির্জ্জীব প্রতিমা-প্রায় না নড়ে না চড়ে,
　　কেবল নিশ্বাস মাত্র যেতেছে বহিয়া।

চেতন পাইয়া যুবা কহে কমলায়,
　　"যে ছুরীতে ছিঁড়িয়াছে জীবনবন্ধন
অধিক সুতীক্ষ্ণ ছুরী তাহা অপেক্ষায়
　　আগে হোতে প্রেমরজ্জু করেছে ছেদন।

বন্ধুর ছুরিকা-মাখা দ্বেষহলাহলে
　　করেছে হৃদয়ে দেহে আঘাত ভীষণ,
নিবেছে দেহের জ্বালা হৃদয়-অনলে—
　　ইহার অধিক আর নাইক মরণ!

বকুলের তলা হোক্ রক্তে রক্তময়!
　　মৃত্তিকা রঞ্জিত হোক্ লোহিত বরণে!
বসিবে যখন কাল হেথায় বিজয়
　　আচ্ছন্ন বন্ধুতা পুনঃ উদিবে না মনে?

মৃত্তিকার রক্তরাগ হোয়ে যাবে ক্ষয়—
　　বিজয়ের হৃদয়ের শোণিতের দাগ
আর কি কখনো তার হবে অপচয়?
　　অনুতাপ-অশ্রুজলে মুছিবে সে রাগ?

বন্ধুতার ক্ষীণ জ্যোতি প্রেমের কিরণে
　　(রবিকরে হীনভাতি নক্ষত্র যেমন)

বিলুপ্ত হয়েছে কি রে বিজয়ের মনে ?
উদিত হইবে না কি আবার কখন ?

একদিন অশ্রুজল ফেলিবে বিজয় !
একদিন অভিশাপ দিবে ছুরিকারে !
একদিন মুছিবারে হইতে হৃদয়
চাহিবে সে রক্তধারা অশ্রুবারিধারে !

কমলে ! খুলিয়া ফেল আঁচল তোমার !
রক্তধারা যেথা ইচ্ছা হোক প্রবাহিত !
বিজয় শুধেছে আজি বন্ধুতার ধার
প্রেমেরে করায়ে পান বন্ধুর শোণিত !

চলিনু কমলা আজ ছাড়িয়া ধরায়—
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িয়া বন্ধন,
জলাঞ্জলি দিয়া পৃথিবীর মিত্রতায়,
প্রেমের দাসত্ব রজ্জু করিয়া ছেদন !"

অবসন্ন হোয়ে প'ল যুবক তখনি,
কমলার কোল হোতে পড়িল ধরায় !
উঠিয়া বিপিনবালা সবেগে অমনি
উর্দ্ধহস্তে কহে উচ্চ সুদৃঢ় ভাষায়—

"জলন্ত জগৎ ! ওগো চন্দ্র সূর্য্য তারা !
দেখিতেছ চিরকাল পৃথিবীর নরে !
পৃথিবীর পাপ পুণ্য, হিংসা, রক্তধারা
তোমরাই লিখে রাখ জলদ্ অক্ষরে !

সাক্ষী হও তোমরা গো করিও বিচার !—
তোমরা হও গো সাক্ষী পৃথ্বী চরাচর !

ব'হে যাও !— ব'হে যাও যমুনার ধার,
নিষ্ঠুর কাহিনী কহি সবার গোচর !

এখনই অস্তাচলে যেও না তপন !
ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি দিনকর !
এই, এই রক্তধারা করিয়া শোষণ
লয়ে যাও, লয়ে যাও স্বর্গের গোচর !

ধুস্ নে যমুনাজল ! শোণিতের ধারে !
বকুল তোমার ছায়া লও গো সরিয়ে !
গোপন ক'রো না উহা নিশীথ ! আঁধারে !
জগৎ ! দেখিয়া লও নয়ন ভরিয়ে !

অবাক হউক্ পৃথ্বী সভয়ে, বিস্ময়ে !
অবাক হইয়া যাক্ আঁধার নরক !
পিশাচেরা লোমাঞ্চিত হউক সভয়ে !
প্রকৃতি মুদুক ভয়ে নয়নপলক !

রক্তে লিপ্ত হয়ে যাক্ বিজয়ের মন !
বিস্মৃতি ! তোমার ছায়ে রেখো না বিজয়ে ;
শুকালেও হৃদিরক্ত এ রক্ত যেমন
চিরকাল লিপ্ত থাকে পাষাণ হৃদয়ে !

বিষাদ ! বিলাসে তার মাখি হলাহল
ধরিও সমুখে তার নরকের বিষ !
শান্তির কুটীরে তার জ্বালায়ো অনল !
বিষবৃক্ষবীজ তার হৃদয়ে রোপিস্ !

দূর হ— দূর হ তোরা ভূষণ রতন !
আজিকে কমলা যে রে হোয়েছে বিধবা !

আবার কবরি! তোরে করিনু মোচন!
আজিকে কমলা যে রে হোয়েছে বিধবা!

কি বলিস্ যমুনা লো! কমলা বিধবা!
জাহ্নবীরে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা'!
পাখী! কি করিস্ গান 'কমলা বিধবা'!
দেশে দেশে বল্ গিয়ে 'কমলা বিধবা'!

আয়! শুক ফিরে যা লো বিজন শিখরে,
মৃগদের বল্ গিয়া উচু করি গলা—
কুটীরকে বল্ গিয়ে, তটিনী, নির্ঝরে—
'বিধবা হয়েছে সেই বালিকা কমলা!'

উহুহু! উহুহু— আর সহিব কেমনে?
হৃদয়ে জ্বলিছে কত অগ্নিরাশি মিলি।
বেশ ছিনু বনবালা, বেশ ছিনু বনে!—
নীরজা বলিয়া গেছে 'জ্বালালি! জ্বলিলি'!"

সপ্তম সর্গ

শ্মশান

গভীর আঁধার রাত্রি শ্মশান ভীষণ!
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আঁধার আসন!
সর সর মরমরে সুধীরে তটিনী বহে যায়।
প্রাণ আকুলিয়া বহে ধূমময় শ্মশানের বায়!

গাছপালা নাই কোথা প্রান্তর গম্ভীর !
শাখাপত্রহীন বৃক্ষ, শুষ্ক, দগ্ধ, উচু করি শির
দাঁড়াইয়া দূরে— দূরে নিরখিয়া চারি দিক-পান
পৃথিবীর ধ্বংসরাশি, রহিয়াছে হোয়ে ম্রিয়মাণ ?

শ্মশানের নাই প্রাণ যেন আপনার,
শুষ্ক তৃণরাজি তার ঢাকিয়াছে বিশাল বিস্তার !
তৃণের শিশির চুমি বহে নাকো প্রভাতের বায়
কুসুমের পরিমল ছড়াইয়া হেথায় হোথায় ।

শ্মশানে আঁধার ঘোর ঢালিয়াছে বুক !
হেথা হোথা অস্থিরাশি ভস্মমাঝে লুকাইয়া মুখ !
পরশিয়া অস্থিমালা তটিনী আবার সরি যায়
ভস্মরাশি ধুয়ে ধুয়ে, নিভাইয়া অঙ্গারশিখায় !

বিকট দশন মেলি মানবকপাল—
ধ্বংসের স্মরণস্তূপ, ছড়াছড়ি দেখিতে ভয়াল !
গভীর আঁখিকোটর আঁধারেরে দিয়েছে আবাস,
মেলিয়া দশনপাঁতি পৃথিবীরে করে উপহাস !

মানবকঙ্কাল শুয়ে ভস্মের শয্যায়—
কাণের কাছেতে গিয়া বায়ু কত কথা ফুসলায় !
তটিনী কহিছে কাণে 'উঠ ! উঠ ! উঠ নিদ্রা হোতে'
ঠেলিয়া শরীর তার ফিরে ফিরে তরঙ্গ-আঘাতে !

উঠ গো কঙ্কাল ! কত ঘুমাইবে আর !
পৃথিবীর বায়ু এই বহিতেছে উঠ আরবার !
উঠ গো কঙ্কাল ! দেখ স্রোতস্বিনী ডাকিছে তোমায়
ঘুমাইবে কত আর বিসর্জ্জন দিয়া চেতনায় !

বল না, বল না তুমি ঘুমাও কি বোলে ?
কাল যে প্রেমের মালা পরাইয়াছিল এই গলে
তরুণী ষোড়শী বালা ! আজ তুমি ঘুমাও কি বলে !
অনাথারে একাকিনী সঁপিয়া এ পৃথিবীর কোলে !

উঠ গো— উঠ গো— পুনঃ করিনু আহ্বান !
শুন, রজনীর কাণে ওই সে করিছে খেদ গান !
সময় তোমার আজো ঘুমাবার হয় নাই ত রে !
কোল বাড়াইয়া আছে পৃথিবীর সুখ তোমা-তরে !

তুমি গো ঘুমাও, আমি বলি না তোমারে !
জীবনের রাত্রি তব ফুরায়েছে নেত্রধারে-ধারে !
এক বিন্দু অশ্রুজল বরষিতে কেহ নাই তোর,
জীবনের নিশা আহা এত দিনে হইয়াছে ভোর !

ভয় দেখাইয়া আহা নিশার তামসে—
একটি জ্বলিছে চিতা, গাঢ় ঘোর ধূমরাশি শ্বসে !
একটি অনলশিখা জ্বলিতেছে বিশাল প্রান্তরে,
অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা নিক্ষেপিয়া আকাশের 'পরে।

কার চিতা জ্বলিতেছে কাহার কে জানে ?
কমলা ! কেন গো তুমি তাকাইয়া চিতাগ্নির পানে ?
একাকিনী অন্ধকারে ভীষণ এ শ্মশানপ্রদেশে
ভূষণবিহীনদেহে, শুষ্কমুখে, এলোথেলো কেশে ?

কার চিতা জান কি গো কমলে জিজ্ঞাসি !
দেখিতেছ কার চিতা শ্মশানেতে একাকিনী আসি ?
নীরদের চিতা ? নীরদের দেহ অগ্নিমাঝে জ্বলে ?
নিবায়ে ফেলিবে অগ্নি, কমলে, কি নয়নের জলে ?

নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কমলা দাঁড়ায়ে !
গভীর নিশ্বাসবায়ু উচ্ছ্বাসিয়া উঠে !
ধূমময় নিশীথের শ্মশানের বায়ে
এলোথেলো কেশরাশি চারি দিকে ছুটে !

ভেদি অমা নিশীথের গাঢ় অন্ধকার
চিতার অনলোত্থিত অস্ফুট আলোক
পড়িয়াছে ঘোর ম্লান মুখে কমলার,
পরিস্ফুট করিতেছে সুগভীর শোক !

নিশীথে শ্মশানে আর নাই জন প্রাণী,
মেঘান্ধ অমান্ধকারে মগ্ন চরাচর !
বিশাল শ্মশানক্ষেত্রে শুধু একাকিনী
বিষাদপ্রতিমা বামা বিলীন-অন্তর !

তটিনী চলিয়া যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
নিশীথশ্মশানবায়ু শ্বসিছে উচ্ছ্বাসে !
আলেয়া ছুটিছে হোথা আঁধার ভেদিয়া !
অস্থির বিকট শব্দ নিশার নিশ্বাসে !

শৃগাল চলিয়া গেল সমুচ্চে কাঁদিয়া
নীরব শ্মশানময় তুলি প্রতিধ্বনি !
মাথার উপর দিয়া পাখা ঝাপটিয়া
বাদুড় চলিয়া গেল করি ঘোরধ্বনি !

এ-হেন ভীষণ স্থানে দাঁড়ায়ে কমলা !
কাঁপে নাই কমলার একটিও কেশ !
শূন্যনেত্রে শূন্যহৃদে চাহি আছে বালা
চিতার অনলে করি নয়ননিবেশ !

কমলা চিতায় নাকি করিবে প্রবেশ ?
বালিকা কমলা নাকি পশিবে চিতায় ?
অনলে সংসারলীলা করিবি কি শেষ ?
অনলে পুড়াবি নাকি সুকুমার কায় ?

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম হায়—
ছুটিতিস্ ফুল তুলে কাননে কাননে
ফুলে ফুল সাজাইয়া ফুলসম কায়—
দেখাতিস্ সাজসজ্জা পিতার সদনে !

দিতিস হরিণশৃঙ্গে মালা জড়াইয়া !
হরিণশিশুরে আহা বুকে লয়ে তুলি
সুদূর কাননভাগে যেতিস্ ছুটিয়া,
ভ্রমিতিস্ হেথা হোথা পথ গিয়া ভুলি !

সুধাময়ী বীণাখানি লোয়ে কোল-'পরে
সমুচ্চ হিমাদ্রিশিরে বসি শিলাসনে
বীণার ঝঙ্কার দিয়া মধুময় স্বরে
গাহিতিস্ কত গান আপনার মনে !

হরিণেরা বন হোতে শুনিয়া সে স্বর
শিখরে আসিত ছুটি তৃণাহার ভুলি !
শুনিত, ঘিরিয়া বসি ঘাসের উপর
বড় বড় আঁখিদুটি মুখ-পানে তুলি !

সেই যে বালিকা তোরে দেখিতাম বনে
চিতায় অনলে আজ হবে তোর শেষ ?
সুখের যৌবন হায় পোড়াবি আগুনে ?
সুকুমার দেহ হবে ভস্ম-অবশেষ !

না, না, না, সরলা বালা, ফিরে যাই চল্
এসেছিলি যেথা হোতে সেই সে কুটীরে !
আবার ফুলের গাছে ঢালিবি লো জল !
আবার ছুটিবি গিয়ে পর্ব্বতের শিরে !

পৃথিবীর যাহা কিছু ভুলে যা লো সব,
নিরাশযন্ত্রণাময় পৃথ্বীর প্রণয় !
নিদারুণ সংসারের ঘোর কলরব,
নিদারুণ সংসারের জ্বালা বিষময় ।

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন !
সংসারকণ্টকবনে পারিজাত ফুল !
নন্দনের বনে গিয়া গাইবি খুলিয়া হিয়া,
নন্দনমলয়বায়ু করিবি আকুল ।

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে—
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যথা কলকলস্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বনফুলদল !

বন-ফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিশ্বাসের বায়ে !
দয়াময়ী বনদেবী শিশিরসেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে ।

এখনো কমলা ওই রয়েছে দাঁড়িয়ে
জ্বলন্ত চিতার 'পরে মেলিয়ে নয়ন !
ওই রে সহসা ওই মূর্চ্ছিয়ে পড়িয়ে
ভস্মের শয্যার পরে করিল শয়ন !

এলায়ে পড়িল ভস্মে সুনিবিড় কেশ !
অঞ্চলবসন ভস্মে পড়িল এলায়ে !
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলুথালু বেশ
কমলার বক্ষ হোতে, শ্মশানের বায়ে !

নিবে গেল ধীরে ধীরে চিতার অনল !
এখনো কমলা বালা মূর্চ্ছায় মগন !
শুকতারা উজলিল গগনের তল,
এখনো কমলা বালা স্তব্ধ অচেতন !

ওই রে কুমারী উষা বিলোল চরণে
উঁকি মারি পূর্ব্বাশার স্বর্ণ তোরণে
রক্তিম অধরখানি হাসিতে ছাইয়া
সিঁদুর প্রকৃতিভালে দিল পরাইয়া।

এখনো কমলা বালা ঘোর অচেতন,
কমলা-কপোল চুমে অরুণকিরণ !
গণিছে কুন্তলগুলি প্রভাতের বায়,
চরণে তটিনী বালা তরঙ্গ ঢুলায় !

কপোলে, আঁখির পাতে পড়েছে শিশির !
নিস্তেজ স্বর্ণকরে পিতেছে মিহির !
শিথিল অঞ্চলখানি লোয়ে ঊর্ম্মিমালা
কত কি— কত কি কোরে করিতেছে খেলা !

ক্রমশঃ বালিকা ওই পাইছে চেতন !
ক্রমশঃ বালিকা ওই মেলিছে নয়ন !
বক্ষোদেশ আবরিয়া অঞ্চলবসনে
নেহারিল চারি দিক বিস্মিত নয়নে।

ভস্মরাশিসমাকুল শ্মশানপ্রদেশ !
মলিনা কমলা ছাড়া যেদিকে নেহারি
বিশাল শ্মশানে নাই সৌন্দর্য্যের লেশ,
জন প্রাণী নাই আর কমলারে ছাড়ি !

সূর্য্যকর পড়িয়াছে শুষ্কম্লানপ্রায়,
ভস্মমাখা ছুটিতেছে প্রভাতের বায় !
কোথাও নাই রে যেন আঁখির বিশ্রাম,
তটিনী ঢালিছে কাণে বিষাদের গান !

বালিকা কমলা ক্রমে করিল উত্থান
ফিরাইল চারি দিকে নিস্তেজ নয়ান ।
শ্মশানের-ভস্ম-মাখা অঞ্চল তুলিয়া
যেদিকে চরণ চলে যাইল চলিয়া !

অষ্টম সর্গ

বিসর্জ্জন

আজিও পড়িছে ওই সেই সে নির্ঝর !
হিমাদ্রির বুকে বুকে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে সুখে,
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর ।

আজিও সে শৈলবালা বিস্তারিয়া ঊর্ম্মিমালা,
চলিছে কত কি কহি আপনার মনে !
তুষারশীতল বায় পুষ্প চুমি চুমি যায়,
খেলা করে মনোসুখে তটিনীর সনে ।

কুটীর তটিনীতীরে লতারে ধরিয়া শিরে
মুখছায়া দেখিতেছে সলিলদর্পণে !
হরিণেরা তরুছায়ে খেলিতেছে গায়ে গায়ে,
চমকি হেরিছে দিক পাদপকম্পনে।

বনের পাদপপত্র আজিও মানবনেত্র
হিংসায় অনলময় করে নি লোকন !
কুসুম লইয়া লতা প্রণত করিয়া মাথা
মানবেরে উপহার দেয় নি কখন !

বনের হরিণগণে মানবের শরাসনে
ছুটে ছুটে ভ্রমে নাই তরাসে তরাসে !
কানন ঘুমায় সুখে নীরব শান্তির বুকে,
কলঙ্কিত নাহি হোয়ে মানবনিশ্বাসে।

কমলা বসিয়া আছে উদাসিনী বেশে
শৈলতটিনীর তীরে এলোথেলো কেশে
অধরে সঁপিয়া কর, অশ্রু বিন্দু ঝর ঝর
ঝরিছে কপোলদেশে— মুছিছে আঁচলে।
সম্বোধিয়া তটিনীরে ধীরে ধীরে বলে,
"তটিনী বহিয়া যাও আপনার মনে !
কিন্তু সেই ছেলেবেলা যেমন করিতে খেলা
তেমনি করিয়ে খেলো নির্ঝরের সনে !

তখন যেমন স্বরে কল কল গান করে
মৃদু বেগে তীরে আসি পড়িতে লো ঝাঁপি
বালিকা ক্রীড়ার ছলে পাথর ফেলিয়া জলে
মারিতাম— জলরাশি উঠিত লো কাঁপি

তেমনি খেলিয়ে চল্ তুই লো তটিনীজল !
তেমনি বিতরি সুখ নয়নে আমার।

নির্ঝর তেমনি কোরে ঝাঁপিয়া সরসী-'পরে
পড়্‌লো উপরি শুভ্র ফেনরাশিভার!

মুছিতে লো অশ্রুবারি এয়েছি হেথায়।
তাই বলি পাপিয়ারে! গান কর্‌ সুধাধারে
নিবাইয়া হৃদয়ের অনলশিখায়!

ছেলেবেলাকার মত বায়ু তুই অবিরত
লতার কুসুমরাশি কর্‌ লো কম্পিত!
নদী চল্‌ দুলে দুলে! পুষ্প দে হৃদয় খুলে!
নির্ঝর সরসীবক্ষ কর্‌ বিচলিত!

সেদিন আসিবে আর হৃদিমাঝে যাতনার
রেখা নাই, প্রমোদেই পূরিত অন্তর!
ছুটাছুটি করি বনে বেড়াইব ফুল্লমনে,
প্রভাতে অরুণোদয়ে উঠিব শিখর!

মালা গাঁথি ফুলে ফুলে জড়াইব এলোচুলে,
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণের গল!
বড় বড় দুটি আঁখি মোর মুখপানে রাখি
এক দৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল!

সেদিন গিয়েছে হা রে— বেড়াই নদীর ধারে
ছায়াকুঞ্জে শুনি গিয়ে শুকদের গান!
না থাক্‌, হেথায় বসি, কি হবে কাননে পশি—
শুক আর গাবে নাকো খুলিয়ে পরাণ!
সেও যে গো ধরিয়াছে বিষাদের তান!

জুড়ারে হৃদয়ব্যথা দুলিবে না পুষ্পলতা,
তেমন জীবন্ত ভাবে বহিবে না বায়!
প্রাণহীন যেন সবি— যেন রে নীরব ছবি—
প্রাণ হারাইয়া যেন নদী বহে যায়!

তবুও যাহাতে হোক্ নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল !
তবুও ত আপনারে ভুলিতে হইবে হা রে !
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল !

যাই তবে বনে বনে ভ্রমিগে আপনমনে,
যাই তবে গাছে গাছে ঢালি দিই জল !
শুকপাখীদের গান শুনিয়া জুড়াই প্রাণ,
সরসী হইতে তবে তুলিগে কমল !

হৃদয় নাচে না ত গো তেমন উল্লাসে !
ভ্রমি ত ভ্রমিই বনে ম্রিয়মাণ শূন্যমনে,
দেখি ত দেখিই বোসে সলিল-উচ্ছ্বাসে !
তেমন জীবন্ত ভাব নাই ত অন্তরে—
দেখিয়া লতার কোলে ফুটন্ত কুসুম দোলে,
কুঁড়ি লুকাইয়া আছে পাতার ভিতরে—

নির্ঝরের ঝরঝরে হৃদয়ে তেমন কোরে
উল্লাসে শোণিতরাশি উঠে না নাচিয়া !
কি জানি কি করিতেছি, কি জানি কি ভাবিতেছি,
কি জানি কেমনধারা শূন্যপ্রায় হিয়া !

তবুও যাহাতে হোক্ নিবাতে হইবে শোক,
তবুও মুছিতে হবে নয়নের জল।
তবুও ত আপনারে ভুলিতে হইবে হা রে,
তবুও নিবাতে হবে হৃদয়-অনল !

কাননে পশিগে তবে শুক যেথা সুধারবে
গান করে জাগাইয়া নীরব কানন।
উঁচু করি করি মাথা হরিণেরা বৃক্ষপাতা
সুধীরে নিঃশঙ্কমনে করিছে চর্ব্বণ !”

সুন্দরী এতেক বলি পশিল কাননস্থলী,
পাদপ রৌদ্রের তাপ করিছে বারণ।
বৃক্ষছায়ে তলে তলে ধীরে ধীরে নদী চলে
সলিলে বৃক্ষের মূল করি প্রক্ষালন।

হরিণ নিঃশঙ্কমনে শুয়ে ছিল ছায়াবনে,
পদশব্দ পেয়ে তারা চমকিয়া উঠে।
বিস্তারি নয়নদ্বয় মুখপানে চাহি রয়,
সহসা সভয় প্রাণে বনান্তরে ছুটে।

ছুটিছে হরিণচয়, কমলা অবাক্ রয়—
নেত্র হতে ধীরে ধীরে ঝরে অশ্রুজল।
ওই যায়— ওই যায় হরিণ হরিণী হায়—
যায় যায় ছুটে ছুটে মিলি দলে দল।

কমলা বিষাদভরে কহিল সমুচ্চস্বরে—
প্রতিধ্বনি বন হোতে ছুটে বনান্তরে—
"যাস্ নে— যাস্ নে তোরা, আয় ফিরে আয়!
কমলা— কমলা সেই ডাকিতেছে তোরে!

সেই যে কমলা সেই থাকিত কুটীরে,
সেই যে কমলা সেই বেড়াইত বনে!
সেই যে কমলা পাতা ছিঁড়ি ধীরে ধীরে
হরষে তুলিয়া দিত তোদের আননে!

কোথা যাস্— কোথা যাস্— আয় ফিরে আয়!
ডাকিছে তোদের আজি সেই সে কমলা!
কারে ভয় করি তোরা যাস্ রে কোথায়?
আয় হেথা দীর্ঘশৃঙ্গ! আয় লো চপলা!

এলি নে— এলি নে তোরা এখনো এলি নে—
কমলা ডাকিছে যে রে, তবুও এলি নে !
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি কমলারে ?
ভুলিয়া গেছিস্ তোরা আজি বালিকারে ?

খুলিয়া ফেলিনু এই কবরীবন্ধন,
এখনও ফিরিবি না হরিণের দল ?
এই দেখ্— এই দেখ্ ফেলিয়া বসন
পরিনু সে পুরাতন গাছের বাকল !
যাক্ তবে, যাক্ চ'লে— যে যায় যেখানে—
শুক পাখী উড়ে যাক্ সুদূর বিমানে !
আয়— আয়— আয় তুই আয় রে মরণ !
বিনাশশক্তিতে তোর নিভা এ যন্ত্রণা !
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন !
বহিতে অনল হৃদে আর ত পারি না !

নীরদ স্বরগে আছে, আছেন জনক
স্নেহময়ী মাতা মোর কোল রাখি পাতি—
সেথায় মিলিব গিয়া, সেথায় যাইব—
ভোর করি জীবনের বিষাদের রাতি !
নীরদে আমাতে চড়ি প্রদোষতারায়
অস্তগামী তপনেরে করিব বীক্ষণ,
মন্দাকিনী তীরে বসি দেখিব ধরায়
এত কাল যার কোলে কাটিল জীবন।

শুকতারা প্রকাশিবে উষার কপোলে
তখন রাখিয়া মাথা নীরদের কোলে—
অশ্রুজলসিক্ত হয়ে কব সেই কথা
পৃথিবী ছাড়িয়া এনু পেয়ে কোন্ ব্যথা !

নীরদের আঁখি হোতে ব'বে অশ্রুজল!
মুছিব হরষে আমি তুলিয়া আঁচল!
আয়— আয়— আয় তুই, আয় রে মরণ!
পৃথিবীর সাথে সব ছিঁড়িব বন্ধন!"

এত বলি ধীরে ধীরে উঠিল শিখর!
দেখে বালা নেত্র তুলে—
চারি দিক গেছে খুলে
উপত্যকা, বনভূমি, বিপিন, ভূধর!

তটিনীর শুভ্র রেখা—
নেত্রপথে দিল দেখা—
বৃক্ষছায়া দুলাইয়া ব'হে ব'হে যায়!
ছোট ছোট গাছপালা—
সঙ্কীর্ণ নির্ঝরমালা—
সবি যেন দেখা যায় রেখা-রেখা-প্রায়।

গেছে খুলে দিশ্বিদিক—
নাহি পাওয়া যায় ঠিক
কোথা কুঞ্জ— কোথা বন— কোথায় কুটীর!
শ্যামল মেঘের মত—
হেথা হোথা কত শত
দেখায় ঝোপের প্রায় কানন গভীর!

তুষাররাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী!
মাথায় জলদ ঠেকে,
চরণে চাহিয়া দেখে
গাছপালা ঝোপে-ঝাপে ভূধর আবরি!

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা-রেখা
হেথা হোথা যায় দেখা

কে কোথা পড়িয়া আছে কে দেখে কোথায় !
বন, গিরি, লতা, পাতা আঁধারে মিশায় !

অসংখ্য শিখরমালা ব্যাপি চারি ধার—
মধ্যের শিখর-'পরে
(মাথায় আকাশ ধরে)
কমলা দাঁড়ায়ে আছে, চৌদিকে তুষার !

চৌদিকে শিখরমালা—
মাঝেতে কমলা বালা
একেলা দাঁড়ায়ে মেলি নয়নযুগল !
এলোথেলো কেশপাশ,
এলোথেলো বেশবাস,
তুষারে লুটায়ে পড়ে বসন-আঁচল !

যেন কোন্ সুরবালা
দেখিতে মর্ত্ত্যের লীলা
স্বর্গ হোতে নামি আসি হিমাদ্রিশিখরে
চড়িয়া নীরদ-রথে—
সমুচ্চ শিখর হোতে
দেখিলেন পৃথ্বীতল বিস্মিত অন্তরে !

তুষাররাশির মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
হিমময় বায়ু ছুটে,
অন্তরে অন্তরে ফুটে
হৃদয়ে রুধিরোচ্ছ্বাস স্তব্ধপ্রায় করি !
শীতল তুষারদল
কোমল চরণতল
দিয়াছে অসাড় ক'রে পাষাণের মত !
কমলা দাঁড়ায়ে আছে যেন জ্ঞানহত !

কোথা স্বর্গ— কোথা মর্ত্ত্য— আকাশ পাতাল !
কমলা কি দেখিতেছে !
কমলা কি ভাবিতেছে !
কমলার হৃদয়েতে ঘোর গোলমাল !

চন্দ্র সূর্য্য নাই কিছু—
শূন্যময় আগু পিছু !
নাই রে কিছুই যেন ভূধর কানন !
নাইক শরীর দেহ,
জগতে নাইক কেহ—
একেলা রয়েছে যেন কমলার মন !
কে আছে— কে আছে— আজি কর গো বারণ !

বালিকা ত্যজিতে প্রাণ করেছে মনন !
বারণ কর গো তুমি গিরি হিমালয় !
শুনেছ কি বনদেবী— করুণা-আলয়—
বালিকা তোমার কোলে করিত ক্রন্দন,
সে নাকি মরিতে আজ করেছে মনন ?

বনের কুসুমকলি
তপনতাপনে জলি
শুকায়ে মরিবে নাকি করেছে মনন !
শীতল শিশিরধারে
জীয়াও জীয়াও তারে
বিশুষ্ক হৃদয়মাঝে বিতরি জীবন !

উদিল প্রদোষতারা সাঁঝের আঁচলে—
এখনি মুদিবে আঁখি ?
বারণ করিবে না কি ?
এখনি নীরদকোলে মিশাবে কি বোলে ?

অনন্ত তুষারমাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী !
মোহস্বপ্ন গেছে ছুটে—
হেরিল চমকি উঠে
চৌদিকে তুষাররাশি শিখর আবরি !

উচ্চ হোতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন !
বনবালা থাকি থাকি
সহসা মুদিল আঁখি
কাঁপিয়া উঠিল দেহ ! কাঁপি উঠে মন !

অনন্ত আকাশমাঝে একেলা কমলা !
অনন্ত তুষারমাঝে একেলা কমলা !
সমুচ্চ শিখর-'পরে একেলা কমলা !
আকাশে শিখর উঠে
চরণে পৃথিবী লুটে—
একেলা শিখর-'পরে বালিকা কমলা !

ওই— ওই— ধর্— ধর্— পড়িল বালিকা !
ধবলতুষারচ্যুতা পড়িল বিহ্বল !—
খসিল পাদপ হোতে কুসুমকলিকা !
খসিল আকাশ হোতে তারকা উজ্জ্বল !

প্রশান্ত তটিনী চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
ধরিল বুকের পরে কমলাবালায় !
উচ্ছ্বাসে সফেন জল উঠিল নাচিয়া !
কমলার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায় !

কমলার দেহ বহে সলিল-উচ্ছ্বাস !
কমলার জীবনের হোলো অবসান !

ফুরাইল কমলার দুখের নিঃশ্বাস,
জুড়াইল কমলার তাপিত পরাণ!

কল্পনা! বিষাদে দুখে গাইনু সে গান!
কমলার জীবনের হোলো অবসান!
দীপালোক নিভাইল প্রচণ্ড পবন!
কমলার— প্রতিমার হ'ল বিসর্জ্জন!

ভগ্নহৃদয়

ভগ্নহৃদয়।

(গীতি-কাব্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

কলিকাতা

বা ল্মী কি য ন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

কাব্যের পাত্রগণ

কবি	
অনিল	
মুরলা	অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্যসহচরী
ললিতা	অনিলের প্রণয়িনী
নলিনী	এক চপলস্বভাবা কুমারী
চপলা	মুরলার সখী
লীলা সুরুচি মাধবী প্রভৃতি	নলিনীর সখীগণ
সুরেশ বিজয় বিনোদ প্রভৃতি	নলিনীর বিবাহ বা প্রণয়াকাঙ্খী

ভূমিকা

এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা চাই। বর্ত্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে, দৃষ্টান্তস্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।

উপহার

শ্রীমতী হে ——————————,

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্য্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায়ে শুকায়ে যাক্,
ওই মুখপানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়।
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

২

জীবনসমুদ্রে তব জীবনতটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর।
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্ম্মি যত উঠে জাগি
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া—
জানে বা না জানে কেউ জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে— বিরাম পাবে— তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে।
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতু-সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশতলে!

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে ;
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে।
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী—
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে ম্রিয়মাণ,
সুখ শান্তি অবসান— কাঁদিব আঁধারে বসি !

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান
তোমারি মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়—
একটি নয়নজল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে—
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান ?

ভগ্নহৃদয়

প্রথম সর্গ

দৃশ্য— বন। চপলা ও মুরলা

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই— জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারি দিকে ঝুঁকি!
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে?

মুরলা। সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি,
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই!
বিছায়ে শুকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!

যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর ভাল লাগিবে না তোর,
তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্ গিয়ে খেলা!

চপলা। মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ!
কত ভোরে উঠে বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে লোয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখি নি বাকি!
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল,
কুসুমরেণুতে মাখা।
কাঁটা বিঁধে, সখি, হোয়েছিনু সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা!
তুলেছি করবী গোলাপ-গরবী,
তুলেছি টগরগুলি,
যুঁইকুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখ্‌সে আজ—
হরষের হাসি অধরে ধরে না,
কিছু যদি আছে লাজ!

মুরলা। আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুই জনে!

চপলা। হ্যাঁ সখি, এমন আর দেখি নি ত বয়-কোনে!
জানিস্ ত, সখি, ললিতার মত
অমন লাজুক মেয়ে
অনিলের সাথে দেখা করিবারে
প্রতিদিন যায় বিপাশার ধারে
সরমের মাথা খেয়ে!
কবরীতে বাঁধি কুসুমের মালা,
নয়নে কাজলরেখা,

চুপি চুপি যায়, ফিরে ফিরে চায়,
বনপথ দিয়ে একা!
দূর হোতে দেখি অনিলে অমনি
সরমে চরণ সরে না যেন!
ফিরিবে ফিরিবে মনে মনে করি
চরণ ফিরিতে পারে না যেন!
অনিল অমনি দূর হোতে আসি
ধরি তার হাতখানি
কহে যে কত-কি হৃদয়-গলানো
সোহাগে মাখানো বাণী।
আমি ছিনু, সখি, লুকিয়ে তখন
গাছের আড়ালে আসি,
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিতেছিলেম
রাখিতে পারি নে হাসি!
কত কথা ক'য়ে কত হাত ধরি
কত শত বার সাধাসাধি করি
বসাইল যুবা ললিতা বালারে
বকুল গাছের ছায়।
মাথার উপরে ঝরে শত ফুল—
যেন গো করুণ তরুণ বকুল
ফুল চাপা দিয়ে লাজুক মেয়েরে
ঢাকিয়া ফেলিতে চায়!
ললিতার হাত কাঁপে থর থর,
আঁখি দুটি নত মাটির উপর,
ভূমি হোতে এক কুসুম তুলিয়া
ছিঁড়িতেছে শত ভাগে।
লাজনত মুখ ধরিয়া তাহার
অনিল রাখিল বুকের মাঝার,
অনিমিষ আঁখি মেলিয়া যুবক
চাহি থাকে মুখবাগে!

আদরে ভাসিয়া ললিতার চোখে
বাহিরে সলিলধার—
সোহাগে সরমে প্রণয়ে গলিয়া
আঁখি দুটি তার পড়িল ঢলিয়া,
হাসি ও নয়নসলিলে মিলিয়া
কি শোভা ধরিল মুখানি তার!
আমি, সখি, আর নারিনু থাকিতে—
সুমুখে পড়িনু আসি,
করতালি দিয়ে উপহাস কত
করিলাম হাসি হাসি!
ললিতা অমনি চমকি উঠিল,
মুখেতে একটি কথা না ফুটিল,
আকুল ব্যাকুল হইয়া সরমে
লুকাতে ঠাঁই না পায়।
ছুটিয়ে পলায়ে এলেম অমনি,
হেসে হেসে আর বাঁচি নে সজনি,
সে দিন হইতে আমারে হেরিলে
ললিতা সরমে মরিয়া যায়!

মুরলা। আহা, কেন বাধা দিতে গেলি তাহাদের কাছে?

চপলা। বাধা না পাইলে, সখি, সুখেতে কি সুখ আছে?

মুরলা। সূর্য্যমুখী ফুল, সখি, আমি ভালবাসি বড়—
দু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস্ জড়।
মনে বড় সাধ তার দেখে রবিমুখ-পানে,
রবি যেথা মাথা তার নোয়ে যায় সেইখানে!
তবু মনোআশা হায় মনেই মিশায়ে যায়,
মুখানি তুলিতে নারে সরমেতে জড়সড়!
সে ফুলে সাজাবি দেহ লাজময়ী ললিতার,
লজ্জাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার;
কমল আনিয়া তুলি লাজে-রাঙা পাপ্‌ড়িগুলি
গাঁথি গাঁথি নিরমিয়া দিবি ঘোমটার ধার!

পাতা-ঢাকা আধ-ফুটো লাজুক গোলাপ দুটো
আনিস্, দুলায়ে দিবি সুচারু অলকে তার!
সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে—
আকুল সে ফুলগুলি যতনে আনিস্ তুলি,
তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার।

চপলা। তুই, সখি, আয়— একেলা আমার
ভাল নাহি লাগে বালা!
দুটি সখী মিলি হাসিতে হাসিতে
গুন্ গুন্ গান গাহিতে গাহিতে
মনের মতন গাঁথিব মালা!
বল্ দেখি, সখি, হ'ল কি তোর?
হাসিয়া খেলিয়া কুসুম তুলিয়া
করিবি কোথায় ভাবনা ভুলিয়া
কুমারীজীবন ভোর—
তা না, একি জ্বালা? মরমে মিশিয়া
আপনার মনে আপনি বসিয়া
সাধ কোরে এত ভাল লাগে, সখি,
বিজনে ভাবনা-ঘোর!
তা হবে না, সখি, না যদি আসিস্
এই কহিলাম তোরে—
যত ফুল আমি আনিয়াছি তুলি
আঁচল ভরিয়া ল'ব সবগুলি,
বিপাশার স্রোতে দিব লো ভাসায়ে
একটি একটি কোরে!

মুরলা। মাথা খা, চপলা, মোরে জ্বালাস্ নে আর!

চপলা। ভাল, সই, জ্বালাব না চলিনু এবার!
[গমনোদ্যম : পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া]
না না, সখি, এই আঁধার কাননে
একেলা রাখিয়া তোরে

কোথায় যাইব বল্ দিখি তুই,
যাইব কেমন কোরে?
তোরে ছেড়ে আমি পারি কি থাকিতে?
ভালবাসি তোরে কত!
আমি যদি, সখি, হোতেম তোমার
পুরুষ মনের মত
সারাদিন তোরে রাখিতাম ঘোরে,
বেঁধে রাখিতাম হিয়ে,
একটুকু হাসি কিনিতাম তোর
শতেক চুম্বন দিয়ে!
অমিয়া-মাখানো মুখানি তোমার
দেখে দেখে সাধ মিটিত না আর!
ও মুখানি লোয়ে কি যে করিতাম
বুকের কোথায় ঢেকে রাখিতাম,
ভাবিয়া পেতাম তা কি?
সখি, কার তুমি ভালবাসা-তরে
ভাবিছ অমন দিনরাত ঘোরে,
পায়ে পড়ি তব খুলে বল তাহা—
কি হবে রাখিয়া ঢাকি?

মুরলা। ক্ষমা কর মোরে, সখি, শুধায়ো না আর!
মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার!
যে গোপন কথা, সখি, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেবমন্ত্র-সম পূজি অনিবার
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
লুকানো থাক্ তা, সখি, হৃদয়ে আমার!
ভালবাসি, শুধায়ো না কারে ভালবাসি!
সে নাম কেমনে, সখি, কহিব প্রকাশি!
আমি তুচ্ছ হোতে তুচ্ছ, সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার!
ক্ষুদ্র ওই কুসুমটি পৃথিবীকাননে,

আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন দিন পূজা করি   শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম নীরব প্রেমে যায় প্রাণ তার—
তেমনি পূজিয়া তারে   এ প্রাণ যাইবে হা-রে,
তবুও লুকানো রবে এ কথা আমার !

চপলা। কে জানে সজনি, বুঝিতে না পারি
এ তোর কেমন কথা !
আজিও ত সখি না পেনু ভাবিয়া
একি প্রণয়ের প্রথা !
প্রণয়ীর নাম রসনায়, সখি,
সাধের খেলেনা-মত,
উলটি পালটি সে নাম লইয়া
রসনা খেলায় কত !
নাম যদি তার বলিস্, তা হ'লে
তোরে আমি অবিরাম
শুনাব তাহারি নাম—
গানের মাঝারে সে নাম গাঁথিয়া
সদা গাব সেই গান !
রজনী হইলে সেই গান গেয়ে
ঘুম পাড়াইব তোরে,
প্রভাত হইলে সেই গান তুই
শুনিবি ঘুমের ঘোরে !
ফুলের মালায় কুসুম-আখরে
লিখি দিব সেই নাম—
গলায় পরিবি, মাথায় পরিবি,
তাহারি বলয় কাঁকন করিবি,
হৃদয়-উপরে যতনে ধরিবি
নামের কুসুমদাম !
যখনি গাহিবি তাহার গান,
যখনি কহিবি তাহার নাম,

সাথে সাথে সখি আমিও গাহিব,
সাথে সাথে সখি আমিও কহিব,
দিবারাতি অবিরাম—
সারা জগতের বিশাল আধরে
পড়িবি তাহারি নাম!
যখনি বলিবি তোর পাশে তারে
ধরিয়া আনিয়া দিব —
সুমুখ হইতে পলাইয়া গিয়া
আড়ালেতে লুকাইব।
দেখিব কেমন দুখ না ছুটে
ওই মুখে তোর হাসি না ফুটে—
ভুলিবি এ বন, ভুলিবি বেদন,
সখীরেও বুঝি ভুলিয়া যাবি!
বল্, সখি, প্রেমে পড়েছিস্ কার!
বল্, সখি, বল্ কি নাম তাহার!
বলিবি নি কি লো? না যদি বলিস্
চপলার মাথা খাবি!

মুরলা। [নেপথ্যে চাহিয়া] জীবন্ত স্বপ্নের মত, ওই দেখ্, কবি
একা একা ভ্রমিছেন আঁধার অটবী।
ওই যেন মূর্তিমান ভাবনার মত
নত করি দু-নয়ন শুনিছেন একমন
স্তব্ধতার মুখ হোতে কথা কত শত!

[কবির প্রবেশ]

কবি। বনদেবীটির মত এই যে মুরলা,
প্রভাতে কাননে বসি ভাবনাবিহ্বলা!
প্রকৃতি আপনি আসি লুকায়ে লুকায়ে
আপনার ভাষা তোরে দেছে কি শিখায়ে?
দিনরাত কলস্বরে তটিনী কি গান করে
তাহা কি বুঝিতে তুই পেরেছিস্ বালা?

তাই হেথা প্রতিদিন আসিস্ একেলা!
মুরলা! আজিকে তোরে বনবালা-মত কোরে
চপলা সাজায়ে দিক্ দেখি একবার।
এলোথেলো কেশপাশে লতা দে বাঁধিয়া,
অলক সাজায়ে দে লো তৃণফুল দিয়া—
ফুলসাথে পাতাগুলি একটি একটি তুলি
অযতনে দে লো তাহা আঁচলে গাঁথিয়া!
হরিণশাবক যত ভুলিবে তরাস,
পদতলে বসি তোর চিবাইবে ঘাস।
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখে তার দিবি তুলি,
সবিস্ময়ে সুকুমার গ্রীবাটি বাঁকায়ে
অবাক্ নয়নে তারা রহিবে তাকায়ে!
আমি হোয়ে ভাবে ভোর দেখিব মুখানি তোর,
কল্পনার ঘুমঘোর পশিবে পরাণে!
ভাবিব, সত্যই হবে বনদেবী আসি তবে
অধিষ্ঠান হইলেন কবির নয়ানে!

চপলা। বল দেখি মোরে, কবি গো, হ'ল কি
তোমাদের দু-জনার?
সখীরে আমার কি গুণ করেছ
বল দেখি একবার!
সখীর আমার খেলাধূলা নেই,
সারাদিন বসি থাকে বিজনেই—
জানি না ত, কবি, এত দিন আছি
কিসের ভাবনা তার!
ছেলেবেলা হোতে তোমরা দুজনে
বাড়িয়াছ এক সাথে,
আপনার মনে ভ্রমিতে দুজনে
ধরি ধরি হাতে হাতে!
তখন না জানি কি মন্ত্র, কবি গো,
দিলে মুরলার কানে!

কি মায়া না জানি দিয়েছিলে পড়ি
সখীর তরুণ প্রাণে!
বেলা হোয়ে এল সজনি এখন,
করিয়াছে পান প্রভাতকিরণ
ফুলবধূটির অধর হইতে
প্রতি শিশিরের কণা।
তুই থাক্ হেথা, আমি যাই ফিরে,
অমনি ডাকিয়া ল'ব মালতীরে—
একেলা ত, বালা, অত ফুলমালা
গাঁথিবারে পারিব না!

[প্রস্থান

কবি। মুরলা, তোমার কেন ভাবনায় ভাব হেন?
কতবার শুধায়েছি বল নি আমারে!
লুকায়ো না কোন কথা, যদি কোন থাকে ব্যথা
রুধিয়া রেখো না তাহা হৃদয়মাঝারে!
হয়ত হৃদয়ে তব কিসের যাতনা
আপনি মুরলা তাহা জানিতে পার না!
হয়ত গো যৌবনের বসন্তসমীরে
মানসকুসুম তব ফুটেছে সুধীরে,
প্রণয়বারির তরে তৃষায় আকুল
ম্রিয়মাণ হ'য়ে বুঝি পোড়েছে সে ফুল?
পেয়েছ কি যুবা কোন মনের মতন?
ভালবাসো, ভালবাসা করহ গ্রহণ—
তা হ'লে হৃদয় তব পাইবে জীবন নব,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসময় হেরিবে ভুবন।

মুরলা। [স্বগত] বুঝিলে না— বুঝিলে না— কবি গো, এখনো
বুঝিলে না এ প্রাণের কথা!
দেবতা গো বল দাও, এ হৃদয়ে বল দাও,
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা।
জানি, কবি, ভাল তুমি বাস' নাক মোরে—

তা হ'লে এ মন তুমি চিনিবে কি কোরে ?
একটুকু ভাল যদি বাসিতে আমারে
তা হ'লে কি কোন কথা এ মনের কোন ব্যথা
তোমার কাছেতে, কবি, লুকায়ে থাকিতে পারে ?
তাহা হ'লে প্রতি ভাবে, প্রতি ব্যবহারে,
মুখ দেখে, আঁখি দেখে, প্রত্যেক নিশ্বাস থেকে
বুঝিতে যা গুপ্ত আছে বুকের মাঝারে।
প্রেমের নয়ন থেকে প্রেম কি লুকানো থাকে ?
তবে থাক্, থাক্ সব, বুকে থাক্ গাঁথা—
বুক যদি ফেটে যায়— ভেঙ্গে যায়— চুরে যায়—
তবু রবে লুকানো এ কথা।
দেবতা গো বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও
পারি যেন লুকাতে এ ব্যথা !

কবি। বহুদিন হ'তে, সখি, আমার হৃদয়
হোয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়।
চরাচর-ব্যাপী এই ব্যোম-পারাবার
সহসা হারায় যদি আলোক তাহার,
আলোকের পিপাসায় আকুল হইয়া
কি দারুণ বিশৃঙ্খল হয় তার হিয়া !
তেমনি বিপ্লব ঘোর হৃদয়ভিতরে
হ'তেছে দিবস নিশা, জানি না কি-তরে !

নবজাত উড্ডানেচ্ছ মহাপক্ষ গরুড় যেমন
বসিতে না পায় ঠাঁই চরাচর করিয়া ভ্রমণ,
উচ্চতম মহীরুহ পদভরে ভূমিতলে লুটে,
ভূধরের শিলাময় ভিত্তিমূল বিদারিয়া উঠে,
অবশেষে শূন্যে শূন্যে দিবারাত্রি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঢাকি ঘোর পাখার ছায়ায়,
তেমনি এ ক্লান্ত হৃদি বিশ্রামের নাহি পায় ঠাঁই—
সমস্ত ধরায় তার বসিবার স্থান যেন নাই।

তাই এই মহারণ্যে অমারাত্রে আসি গো একাকী,
মহান্ ভাবের ভারে দুরন্ত এ ভাবনারে
কিছুক্ষণ-তরে তবু দমন করিয়া যেন রাখি।
চন্দ্রশূন্য আঁধারের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রমাঝারে
সমস্ত জগৎ যবে মগ্ন হ'য়ে গেছে একেবারে
অসহায় ধরা এক মহামন্ত্রে হোয়ে অচেতন
নিশীথের পদতলে করিয়াছে আত্মসমর্পণ,
তখন অধীর হৃদি অভিভূত হোয়ে যেন পড়ে—
অতি ধীরে বহে শ্বাস, নয়নেতে পলক না নড়ে।

...

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহমাঝারে,
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে!
মনের এ রুদ্ধস্রোত দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে, সখি, করিতে প্লাবিত!
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলেনা কেবল,
চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি
আনন্দসঙ্গীতস্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি,
উষার কনকস্রোতে প্রতিদিন করিত সে স্নান,
জ্যোছনা-মদিরাধারা পূর্ণিমায় করিত সে পান,
ঘূর্ণ্যমান ঝটিকার মেঘমাঝে বসিয়া একেলা
কৌতুকে দেখিত যত বিদ্যুৎ-বালিকাদের খেলা,
দুরন্ত ঝটিকা হোথা এলোচুলে বেড়াত নাচিয়া
তরঙ্গের শিরে শিরে অধীর চরণ বিক্ষেপিয়া।
হরষে বসিত গিয়া ধূমকেতুপাখার উপরে,
তপনের চারি দিকে ভ্রমিত সে বর্ষ বর্ষ ধোরে।
চরাচর মুক্ত তার অবারিত বাসনার কাছে,

প্রকৃতি দেখাত তারে যেথা তার যত ধন আছে ;
কুসুমের রেণুমাখা বসন্তের পাখায় চড়িয়া
পৃথিবীর ফুলবনে ভ্রমিত সে উড়িয়া উড়িয়া ;
সমীরণ কুসুমের লঘু পরিমলভার বহি
পথশ্রমে শ্রান্ত হোয়ে বিশ্রাম লভিছে রহি রহি,
সেই পরিমল সাথে অমনি সে যাইত মিলায়ে—
ভ্রমি কত বনে বনে   পরিমলরাশি-সনে
অতি দূর দিগন্তের হৃদয়েতে যাইত মিশায়ে।
তটিনীর কলস্বর   পল্লবের মরমর
শত শত বিহগের হৃদয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস
সমস্ত বনের স্বর মিশে হ'ত একত্তর
একপ্রাণ হোয়ে তারা পরশিত অনন্ত আকাশ।
তখন সে সঙ্গীতের তরঙ্গে করিয়া আরোহণ
মেঘের সোপান দিয়া অতি উচ্চ শূন্যে গিয়া
উষার আরক্ত ভাল পারিত গো করিতে চুম্বন!
কল্পনা, থাম গো থাম, কোথায়— কোথায় যাও নিয়ে ?
ক্ষুদ্র এ পৃথিবী, দেবি, কোন্‌খেনে রেখেছি ফেলিয়ে ?
মাটির শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা যে গো রোয়েছে চরণ,
যত উচ্চে আরোহিব তত হবে দারুণ পতন!
কল্পনার প্রলোভনে   নিরাশার বিষ ঢাকা,
শূন্য অন্ধকার মেঘে   সন্ধ্যার কিরণ মাখা,
সেই বিষ প্রাণ ভোরে   সখি লো করিনু পান—
মন হ'য়ে গেল, সখি,   অবসন্ন— ম্রিয়মাণ।

মুরলা। কবি গো, ওসব কথা ভেবো নাকো আর,
শ্রান্ত মাথা রাখ এই কোলেতে আমার।

কবি। সখি, আর কত দিন   সুখহীন শান্তিহীন
হাহা কোরে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লোয়ে!
পারি নে, পারি নে আর—   পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে।
সম্মুখে জীবন মম   হেরি মরুভূমিসম,

নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই, যেদিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য— শূন্য— মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে, সখি, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী-সম!
কে আছে, অজস্র স্রোতে প্রণয়অমৃত ভরি
অবসন্ন এ হৃদয় তুলিবে সজীব করি!
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়—
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি।

মুরলা। [স্বগত] হা কবি, ও হৃদয়ের শূন্য পুরাইতে
অভাগিনী মুরলা গো কি না পারে দিতে!
কি সুখী হোতেম, যদি মোর ভালবাসা
পুরাতে পারিত তব হৃদয়পিপাসা!
শৈশবে ফুটে নি যবে আমার এ মন
তরুণ-প্রভাত-সম, কবি গো, তখন
প্রতিদিন ঢালি ঢালি দিয়েছে শিশির—
প্রতিদিন যোগায়েছ শীতল সমীর!
তোমারি চোখের 'পরে করুণ কিরণে
এ হৃদি উঠেছে ফুটি তোমারি যতনে!
তোমারি চরণে, কবি, দেছি উপহার,
যা কিছু সৌরভ এর তোমারি— তোমার।
[প্রকাশ্যে] তোল কবি, মাথা তোল, ভেবো না এমন—
দুজনে সরসীতীরে করিগে ভ্রমণ।
ওই চেয়ে দেখ, কবি, তটিনীর ধারে
মধ্যাহ্নকিরণ লোয়ে বনদেবী স্তব্ধ হোয়ে
দিতেছে বিবাহ দিয়া আলোকে আঁধারে।
সাধের সে গান তব শুনিবে এখন?
তবে গাই, মাথা তোল, শোন দিয়ে মন।

গান

কত দিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত খেলিয়াছি খেলা,
ফুল তুলিয়াছি কত দুইটি আঁচল ভোরে!
ছিনু সুখে যত দিন দুজনে বিরহহীন
তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে?
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,
ছেলেবেলাকার যত ফুরাল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী,
তখন জানিনু, সখি, কত ভালবাসি।

দ্বিতীয় সর্গ

ক্রীড়াকানন। নলিনী ও সখীগণ

নলিনী। সখি! অলকচিকুরে কিশলয়-সাথে
একটি গোলাপ পরায়ে দে।
চারু! দেখি ও আরশীখানি;
বালা! সিঁথিটি দে ত লো আনি;
লীলা! শিথিল কুন্তল দেখ্ বার বার
কপোলে দুলিয়া পড়িছে আমার,
একটু এপাশে সরায়ে দে।
সুরুচি। মাধবী! বল্ ত মোরে একবার
আজিকে হ'ল কি তোর!

কতখন ধ'রে গাঁথিছিস্ মালা
এখনো কি শেষ হ'ল না তা বালা ?
এক মালা গেঁথে করিবি না কি লো
সারাটি রজনী ভোর ?
অনিলের হবে ফুলশয্যা আজ,
সাঁঝের আগেই শেষ করি সাজ
সব সখী মিলি যেতে হবে সেথা
তা কি মনে আছে তোর ?

অলকা। মরি মরি কিবা সাজাবার ছিরি,
চেয়ে দেখ্ একবার !
সখীর অমন ক্ষীণ দেহমাঝে
কমলফুলের মালা কি লো সাজে ?
বিনোদিনী দেখ্ গাঁথিছে বসিয়া
কমলের ফুলহার !

নলিনী। ওই দেখ্, সখি, দাঁড়ের উপরে
মাথাটি গুঁজিয়া পাখার ভিতরে
শ্যামাটি আমার— সাধের শ্যামাটি
কেমন ঘুমায়ে আছে !
আন্ সখি ওরে কাছে !
গান গেয়ে গেয়ে, তালি দিয়ে দিয়ে,
ঘিরে বসি ওরে সকলে মিলিয়ে—
দেখিব কেমন ফিরে ফিরে ফিরে
তালে তালে তালে নাচে।

শ্যামার প্রতি গান

নাচ্, শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে।

রুণু রুণু রুহু বাজিছে নূপুর,
মৃহু মৃহু মধু উঠে গীতস্বর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
নাচ্, শ্যামা, নাচ্ তবে!

নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে?
বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান?
এমন মধুর তান?
কমলকরের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস্ কবে?
নাচ্, শ্যামা, নাচ্ তবে!

বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ?
বনে বল্ তোর কি ছিল সুখ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই
আছে লোক কত শত
যারা, শ্যামা, তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায়!
এই গীতরবে হোয়ে ভরপূর
শুনি শুনি এই চরণনূপুর
জনম জনম নাচিতে চায়!

সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা,
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা,
ফিরেও দেখি নে— ফিরেও চাহি নে—

বড় জালাতন করে গো যখন
অশরীরী বাজ করি বরিষণ—
উপেখা-বাণের ধারা !
তবে দেখ্, পাখী, তোর
কেমন ভাগ্যের জোর !
বড় পুণ্যফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা !
আয় পাখী, আয় বুকে !
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে !
বড় দুখ মনে, বনের বিহগ,
কিছু তুই বুঝিলি না !
এমন কপোল অমিয়মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্ কি না !
প্রতি পাখা তোর উঠে নি শিহরি ?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না ?
নাচ্ নাচ্ তালে তালে !
বাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে !

দামিনী। শুনেছিস সখি, বিবাহসভায়
বিনোদ আসিবে আজ !
ভালো কোরে কর্ সাজ !
নলিনী। আহা মরে যাই কি কথা বলিলি,
শুনিয়া যে হয় লাজ !

বিনোদ আসিবে আজ ?
এ বারতা দিয়ে কেন, লো সজনি,
মাথায় হানিলি বাজ ?
সারাখন মোর সাথে সাথে ফিরে
ক্ষান্ত নহে একটুক,
মুখখানা তার দেখিবারে পাই
যে দিকে ফিরাই মুখ !
এক-দৃষ্টে হেন রহে সে তাকায়ে
থেকে থেকে ফেলে শ্বাস,
মুখেতে আঁচল চাপিয়া চাপিয়া
রাখিতে পারি নে হাস !

লীলা। শুনেছি প্রমোদ আসিবে, যাহারে
ভ্রমর বলিয়া ডাকি—
যাহারে হেরিলে হরষে তোমার
উজলিয়া উঠে আঁখি।

নলিনী। পা ছুঁয়ে আমার বল্‌, লো সজনি,
সত্য সে আসিবে নাকি ?
দেখ্‌ দেখি সখি, অভাগীর তরে
কোথাও নিস্তার নাই,
মরি মরি কিবা ভ্রমর আমার !
ভ্রমরের মুখে ছাই !
সে ছাড়া ভ্রমর আর কি নাই ?
তা হলে এখনি— সখি রে. এখনি
নলিনী-জনম ঘুচাতে চাই !

চারুশীলা। লুকাস্‌ নে মোরে, আমি জানি সখি,
কে তোমার মনোচোর।
বলিব ? বলিব ? হেথা আয় তবে,
বলি কানে কানে তোর !

[কানে কানে কথা]

নলিনী। জ্বালাস্ নে চারু, জ্বালাস্ নে মোরে,
কবিস্ নে নাম তার!
সুরেশ?— তাহার জ্বালায়, সজনি,
বেঁচে থাকা হ'ল ভার!
কে জানিত আগে বল্ ত, সখি লো,
রূপের যাতনা অতি?
সাধ যায় বড় কুরূপা হইয়া
লভি শান্তি এক রতি!
[লীলার প্রতি জনান্তিকে]

মাধবী। শোন্ বলি লীলা, জানি কারে সখি
মনে মনে ভাল বাসে।
দেখিনু সেদিন বিজয়ের সাথে
বসি আছে পাশে পাশে।
মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা,
কভু লাজে শির নত,
কভু ল'য়ে কেশ বেণী ফেলি খুলে—
জড়ায়ে জড়ায়ে মৃণাল আঙুলে
আন্‌মনে খেলে কত!
কখন বা শুনে অতি একমনে
বিজয়ের কথাগুলি,
শুনিতে শুনিতে শির নত করি
তুলি কুঁড়ি এক কতখন ধরি
খুলি খুলি দেয় মুদিত পাপড়ি,
ফুটাইয়া তারে তুলি।
কভু বা সহসা উঠিয়া যায়,
কভু বা আবার ফিরিয়া চায়—
মৃদু মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ করে
উঠে এক গান গেয়ে!
এমন মধুর অধীরতা তার!
এমন মোহিনী মেয়ে!

বিনো। সখি লো, তা নয়, কতবার আমি
দেখিয়াছি লুকাইয়া
অশোকের সাথে বসি আছে একা
প্রমোদকাননে গিয়া!
জানি আমি তারে হেরিলে সখীর
সুখে নেচে উঠে হিয়া।

নলিনী। হেথা আয় তোরা, দে দেখি সাজায়ে
শ্যামা পাখীটিরে মোর!
দুটি ফুল বসা দুইটি ডানায়,
বেলকুঁড়ি-মালা কেমন মানায়
সুগোল গলায় ওর!
ওই দেখ্ সখি! দেখি নি কখনো
এমন দুরন্ত পাখী!
যতগুলি ফুল দিলেম পরায়ে
সবগুলি দেখ্ ফেলেছে ছড়ায়ে,
শত শত ভাগে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া
একটি রাখে নি বাকী!
ভাল, পাখী যদি না চায় সাজিতে
আমারে সাজা লো তবে।

চারু। তোর সাজ ফুরাইবে কবে?

লীলা। সখি, আবার কিসের সাজ!

সুরুচি। দেখ্, এসেছে হইয়া সাঁঝ।

নলিনী। দেখ্ লো সুরুচি, লীলা ভাল কোরে
বাঁধিতে পারে নি চুল—
এই দেখ্ হেথা পরায়ে দিয়াছে
অলকে শুকানো ফুল।
বেণী খুলে চুল বেঁধে দে আবার,
কানে দে পরায়ে ফুল।

সুরুচি। না লো সখি, দেখ্, আঁধার হতেছে,
বেরি হয়ে যায় ঢের—

চল্ ত্বরা করে যাই দেখিবারে
ফুলশয্যা অনিলের।

অলকা। এত খনে, সখি, এসেছে সেথায়
যতেক গ্রামের লোক।

দামিনী। [হাসিয়া] এসেছে বিনোদ!

লীলা। [হাসিয়া] এসেছে প্রমোদ!

বিনো। [হাসিয়া] এসেছে সেথা অশোক!

মাধবী। [হাসিয়া] এসেছে বিজয়!

চারু। [চিবুক ধরিয়া] সুরেশ রয়েছে
পথ চেয়ে তোর তরে!

অলকা। আয় তবে ত্বরা করে!

নলিনী। ভাল, সখি, ভাল, চল্ তবে চল্—
জ্বালাস্ নে আর মোরে!

তৃতীয় সর্গ

মুরলা ও অনিল

অনিল। ও হাসি কোথায় তুই শিখেছিলি বোন?
বিষণ্ণ অধর দুটি অতি ধীরে ধীরে টুটি
অতি ধীরে ধীরে ফুটে হাসির কিরণ।
অতি ঘন মেঘমালা ভেদি স্তরে স্তরে, বালা,
সায়াহ্ন জলদপ্রান্তে দেয় যথা দেখা
ম্লান তপনের মৃদু কিরণের রেখা।
কত ভাবনার স্তর ভেদ করি পর পর
ওই হাসিটুকু আসি পঁহুছে অধরে!
ও হাসি কি অশ্রুজলে সিক্ত থরে থরে?
ও হাসি কি বিষাদের গোধূলির হাস?

ও হাসি কি বরষায় সুকুমারী লতিকায়
ধৌতরেণু ফুলটির অতি মৃদু বাস ?
মুরলা রে, কেন আহা, এমন তু' হলি !
এত ভালবাসা কারে দিলি জলাঞ্জলি ?
যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে আঁকিতেছে— শতবার দেখিতেছে—
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—
সদা যে বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে,
আঁখি যার অনিমিষ আকাশের প্রায়,
মাটিতে চরণ তবু মাটিতে না চায়—
ভাবের আলোকে অন্ধ তারি পদতলে
অভাগিনী, লুটাইয়া পড়িলি কি বোলে ?
সে কি রে, অবোধ মেয়ে বারেক দেখিবে চেয়ে ?
জানিতেও পারিবে না, যাইবে সে চ'লে
যূথিকাহৃদয় তোর ধূলি-সাথে দ'লে।
এত ভালবাসা তারে কেন দিলি হায় ?
সাগর-উদ্দেশ-গামী তটিনীর পায়
না ভাবিয়া না চিন্তিয়া যথা অবহেলে
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী দেয় আপনারে ঢেলে।
নিশীথের উদাসীন পথিক সমীর
শূন্য হৃদয়ের তাপে হইয়া অধীর
কুসুমকানন দিয়া যায় যবে বয়ে
আকুল রজনীগন্ধা কথাটি না কয়ে
প্রাণের সুরভি সব দিয়া তার পায়
পরদিন বৃন্ত হতে ঝরে পড়ে যায়।
মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কি রে সারাটি যৌবন ?

কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে দীন অতিশয়—
আপনার পানে তবে চাহিয়া দেখিবি যবে
দেখিবি জীবনদিন সন্ধ্যা হয় হয়!
যে মেঘ-মাঝারে থাকি উদিলি প্রভাতে
সেই মেঘমাঝে থাকি অস্ত গেলি রাতে।

মুরলা। কি জানি কেমন
মুরলার সুখের কি দুঃখের জীবন!
সুখ দুঃখ দিনরাত মিলিয়া উভয়ে
রেখেছে সায়াহ্ন করি এ শান্ত হৃদয়ে।
হেন আলিঙ্গনে তারা রয়েছে সদাই
যেন তারা দুটি সখা, যেন দুটি ভাই।
জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন
তেমনি মিলিয়া তারা রয়েছে দুজন।
সুখের মুখেতে থাকে দুখের কালিমা,
দুখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা।
একা যবে বসে থাকি স্তব্ধ জোছনায়,
বহে বাতায়ন-পানে নিশীথের বায়,
বড় সাধ যায় মনে যারে ভালবাসি
একবার মুহূর্ত্ত সে বসে কাছে আসি,
দুটি শুধু কথা কহে— একটু আদর—
সেই স্তব্ধ জোছনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়
মরিয়া যাই গো তারি বুকের উপর।
যখনি কবিরে দেখি সব যাই ভুলে,
কিছুই চাহি না আর— কিছুই ভাবি না আর—
শুধু সেই মুখে চাই দুটি আঁখি তুলে।
দেখি দেখি— কি যে দেখি, কি বলিব কি সে!
হৃদয় গলিয়া যায় জোছনায় মিশে।
জোছনার মত সেই বিগলিত হিয়া
প্রাণের ভিতরে ধরি একেবারে মগ্ন করি
কবিরে চৌদিকে যেন থাকে আবরিয়া।

মনে মনে মন যেন কাঁদিয়া হু-করে
কবির চরণ দুটি জড়াইয়া ধরে,
আঁখি মুদি "কবি! কবি!" বলে শতবার—
শতবার কেঁদে বলে "আমার! আমার!"
"আমার আমার" যেন বলিতে বলিতে
চাহে মন একেবারে জীবন ত্যজিতে!
সুখেতে কি দুখে যেন ফেটে যায় বুক—
সুখ বলে দুখ আমি, দুখ বলে সুখ।
কোথা কবি, কোথা আমি! সে যে গো দেবতা—
তারে কি কহিতে পারি প্রণয়ের কথা?
কবি যদি ভুলে কভু মোরে ভালবাসে
তা হলে যে ম'রে যাব সঙ্কোচে উল্লাসে।
চাই না চাই না আমি প্রণয় তাঁহার,
যাহা পাই তাই ভাল স্নেহসুধাধার।
শুকতারা স্নেহমাখা করুণ নয়ানে
চেয়ে থাকে অস্তমান যামিনীর পানে,
তেমনি চাহেন যদি কবি স্নেহভরে
মুরলার ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের 'পরে
তাহা হলে নয়নের সামনে তাঁহার
হাসিয়ে ফুরায়ে যাবে জীবন আমার।

অনিল। স্বার্থপর, আপনারি ভাবভরে ভোর,
আজিও সে দেখিল না হৃদয়টি তোর?
সর্ব্বস্ব তাহারি পদে দিয়া বিসর্জ্জন
কাঁদিয়া মরিছে এক দীনহীন মন,
ইহাও কি পড়িল না নয়নে তাহার?
আপনারে ছাড়া কেহ নাহি দেখিবার?
নিশ্চয় দেখেছে, তবু দেখেও দেখে নি।
দেখেছে সে— নিরুপায় নিতান্তই অসহায়
ভালবাসিয়াছে এক অভাগা রমণী।
দেখেছে— হৃদয় এক ফাটিয়া নীরবে

একান্ত মরিবে, তবু কথা নাহি কবে!
দেখেও দেখে নি তবু, পশু সে নির্দ্দয়!
ভাঙ্গিয়া দেখিতে চাহে রমণীহৃদয়।
শতধা করিতে চায় মন রমণীর,
দেখিবারে হৃদয়ের শির উপশির।
এমন সুন্দর মন মুরলা তোমার—
এমন কোমল, শান্ত, গভীর, উদার—
ও মহান্ হৃদয়েতে প্রেমজলধির
নাই রে দিগন্ত বুঝি, নাই তার তীর।
করিস নে, করিস নে ও হৃদি বিনাশ!
যৌবনেই প্রণয়েতে হোস নে উদাস!
কহিগে প্রণয় তোর কবির সকাশে,
শুধাইগে ভাল তোরে বাসে কি না বাসে।
ভাল যদি নাই বাসে কেন সেই জন
মিছা স্নেহ দেখাইয়া বেঁধে রাখে মন?
না যদি করিতে পারে তোরে আপনার,
আপনার মত কেন করে ব্যবহার?
কথা নাহি কহে যেন, না করে আদর,
পরের মতন থাকে— দেখে তোরে পর!
নিরদয়-দয়া তোরে নাই বা করিল!
শত্রুতার ভালবাসা নাই বা বাসিল!
মুহূর্ত্তসুখের তোরে দিয়া প্রলোভন
অসুখী করিবে কেন সারাটি জীবন?
দু-দণ্ডের আদরেতে কভু ভুলিস না!
আধেক সুখেতে কভু পূরে না বাসনা।
এখনি চলিনু তবে তার কাছে যাই,
ভাল বাসে কি না বাসে শুধাইতে চাই।

মুরলা। মনে কোরেছিনু, ভাই, এ প্রাণের কথা
কাহারেও বলিব না যত পাই ব্যথা।
সেদিন সায়াহ্নকালে উচ্ছ্বসি উঠিয়া

বড় নাকি কেঁদে মোর উঠেছিল হিয়া,
তাই আমি পাগলের মত একেবারে
ছুটিয়া তোমারি কাছে গেনু কাঁদিবারে।
উচ্ছ্বসি বলিনু যত কাহিনী আমার!
কেন রে বলিলি হা রে, দুর্ব্বল, অসার?
ভালবাসিতেই যদি করিলি সাহস,
লুকাতে নারিস তাহা হা হৃদি অবশ?
পরের চোখের কাছে না ফেলিলে জল
আশ কি মেটে না তোর রে আঁখি দুর্ব্বল?
মুরলা রে, অভাগী রে, কেন ভাল বাসিলি রে?
যদি বা বাসিলি ভাল কেন তোর মন
হ'ল হেন নীচ হীন, দুর্ব্বল এমন?
একটি মিনতি আজি রাখ গো আমার!
সহস্র যাতনা পাই আর কখন ত, ভাই,
ফেলিব না তব কাছে অশ্রুবারিধার—
যেও না কবির কাছে ধরি তব পায়,
ভুলে যাও যত কথা কহেছি তোমায়!
দয়া করে আরেকটি কথা মোর রাখ,
যদি গো কবির 'পরে রোষ করে থাক
মোর কাছে কভু আর কোরো নাক নাম তাঁর—
সে নাম ঘৃণার স্বরে কভু সহিব না!
জানালেম এই মোর প্রাণের প্রার্থনা!

অনিল। তবে কি এমনি শুধু মিছে ভালবেসে
শূন্য এ জীবন তোর ফুরাইবে শেষে!

মুরলা। যায় যদি যাক্ ভাই, ফুরায় ফুরাক,
প্রভাতে তারার মত মিশায় মিশাক—
মুরলার মত ছায়া কত আসে কত যায়,
কি হয়েছে তায়!
অবোধ বালিকা আমি, মিছে কষ্ট পাই—
এ জীবনে মুরলার কোন কষ্ট নাই!

স্নেহের সমুদ্র সেই কবি গো আমার—
অনন্ত স্নেহের ছায়ে আমারে রেখেছে পায়ে,
তাই যেন চিরকাল থাকে মুরলার!
সে স্নেহের কোলে শুয়ে কাটায় জীবন!
সে স্নেহের কোলে প্রাণ করে বিসর্জ্জন!
কুসুমিত সে অনন্ত স্নেহরাজ্য-'পরে
তিল স্থান থাকে যেন মুরলার তরে!
যত দিন থাকে প্রাণ— ব্যাপি সেইটুকু স্থান
মাটিতে মিশায়ে রবে হৃদয় আমার।
কোনো— কোনো— কোনো সুখ নাহি চাহি আর।

চতুর্থ সর্গ

কবি

প্রথম গান

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে
একটি মধুর মুখ।
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহবা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক।

বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি!
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।

দ্বিতীয় গান

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া,
দেখি সেই মুখখানি—
কুসুমমাঝারে রয়েছে ফুটিয়া
কুসুমগুলির রাণী!
আপনা-আপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আনমন হয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছুখন সেইখানে।
আর কিছু নহে, এ ভাব আমার
কবির সৌন্দর্য্যতৃষা,
কলপনা-সুধা-বিভল কবির
মনের মধুর নেশা!
গোলাপের রূপ, বকুলের বাস,
পাপিয়ার বনগান,
সৌন্দর্য্যমদিরা দিবস রজনী
করিয়া করিয়া পান
শিথিল হইয়া পড়েছে হৃদয়—
নয়নে লেগেছে ঘোর—
বিকশিত রূপ বড় ভাল লাগে
মুগধ নয়নে মোর!

তৃতীয় গান

প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি ?
আলিঙ্গিতে গ্রীবা তার লতাগুলি চারি ধার
আছে শত বাহু তুলি শত ফুলহারে সাজি।
দূর-বন হতে ছুটি আসিয়া প্রভাতবায়
সে বয়ান না দেখিয়া শূন্য বাতায়ন দিয়া
প্রবেশি আঁধার গৃহে করিতেছে হায় হায় !
কত খন— কত খন— কত খন ভ্রমি একা,
গণিনু ফুলের দল, মাটিতে কাটিনু রেখা।
কত খন— কত খন— গেল চলি কত খন—
খনে খনে দেখি চাহি, তবু না পাইনু দেখা !
ফিরিনু আলয়মুখে, চলিনু আপন মনে,
চলিতে চলিতে ধীরে ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে
বার বার এসে পড়ি সেই— সেই বাতায়নে !
নিরাশ-আশার মোহে চেয়ে দেখি বার বার,
শূন্য— শূন্য— শূন্য সব বাতায়ন অন্ধকার !
ফুলময় বাহু দিয়া আঁধারকে বুকে নিয়া
আঁধারকে আলিঙ্গিয়া রয়েছে সে লতাগুলি,
তবু ফিরি ফিরি সেথা আসিলাম ভুলি ভুলি !
তেমনি সকলি আছে— বাতায়ন ফুলে সাজি,
দুলিছে তেমনি করি বাতাসে কুসুমরাজি !
শুধু এ মনে আমার এক কথা বার বার
এক সুরে মাঝে মাঝে উঠিতেছে বাজি বাজি—
"প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি ?
কেন না দেখিনু তারে, কেন না দেখিনু আজি ?"
অতিধীর পদক্ষেপে আলয়ে আসিনু ফিরি,
শতবার আনমনে বলিলাম ধীরি ধীরি—
"প্রতিদিন দেখি তারে, কেন না দেখিনু আজি ?"

চতুর্থ গান

কাল যবে দেখা হ'ল পথে যেতে যেতে চলি
মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি ?
অজানা পথিকে হেরি এত কি সরম হবে ?
কি যেন গো কথা আছে, আটকিয়া রহিয়াছে !
আধ-মুদা দুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে !
সরম না হয় যদি, এ ভাব কিসের তবে ?
কাল তাই বোসে বোসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
স্বপনে দেখেছি তার ঢ'লে-পড়া দু-নয়ন !
প্রভাতে বসিয়া আজ ভাবিতেছি নিরিবিলি—
"মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি ?"

পঞ্চম গান

সত্য কি তাহারে ভালবাসি ?
ভুলিনু কি শুধু তার দেখে রূপরাশি ?
স্বপনে জানি না তার হৃদয় কেমন,
সহসা আপনা ভুলে— শুধু কি রূপসী ব'লে
জীবন্তপুত্তলী-পদে বিসর্জ্জিনু মন ?

ষষ্ঠ গান

মোর এ যে ভালবাসা রূপমোহ এ কি ?
ভাল কি বেসেছি শুধু তার মুখ দেখি ?
মুখেতে সৌন্দর্য্য তার হেরিনু যখনি
তখনি কি মন তার দেখিতে পাই নি ?
মধুর মুখেতে তার আঁখি-দরপণে
মনচ্ছায়া হেরিয়াছি কল্পনানয়নে !

সেই সে মুখানি তার মধুর-আকার
বেড়াতেছে খেলাইয়া হৃদয়ে আমার!
কত কথা কহিতেছে হরষে বিভোর,
কত হাসি হাসিতেছে গলা ধরে মোর!
কি করিয়া হাসে আর কি ক'রে সে কয়,
কি ক'রে আদর করে ভালবাসাময়,
মুখানি কেমন হয় মৃদু অভিমানে,
সকলি হৃদয় মোর না জানিয়া জানে!
যেন তারে জানি কত বর্ষ অগণন,
এ হৃদয়ে কিছু তার নহে গো নূতন!
মুখ দেখে শুধু ভাল বেসেছি কি তারে?
মন তার দেখি নি কি মুখের মাঝারে?

সপ্তম গান

দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পারে!
কবিতা আমার যত সুধীরে শুনাই তারে!
দোঁহে মিলি একপ্রাণ   গাহিতেছি এক গান,
দু জনের ভাবে ভাবে একেবারে গেছে মিশে,
দু জনে দু জন -পানে চেয়ে থাকি অনিমিষে,
দু জনের আঁখি হতে দু জনে মদিরা পিয়া
আসিবে অবশ হয়ে দোঁহার বিভল হিয়া!
মুখে কথা ফুটিবে না,   আঁখিপাতা উঠিবে না,
আমার কাঁধের পরে নোয়াবে মাথাটি তার—
দু জনে মিলিয়া যদি ভ্রমি গো বিপাশা-পার!

অষ্টম গান

শুনেছি— শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি— শুনেছি তাহা!

নলিনী— নলিনী— নলিনী— নলিনী—
　　কেমন মধুর আহা!
নলিনী— নলিনী— বাজিছে শ্রবণে
　　বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম!
কভু আনমনে উঠিতেছে মুখে
　　নলিনী— নলিনী— নলিনী নাম!
বালার খেলার সখীরা তাহারে
　　নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তার নলিনী— নলিনী—
　　নলিনী বলে গো তাকে!
　　নামেতে কি যায় আসে?
　　রূপেতে কি যায় আসে?
হৃদয় হৃদয় দেখিবারে চায়
　　যে যাহারে ভালবাসে!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
　　নলিনী যাহার নাম—
কোমল— কোমল— কোমল অতি—
　　যেমন কোমল নাম!
যেমন কোমল তেমনি বিমল,
　　তেমনি সুরভধাম!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
　　নলিনী যাহার নাম!

পঞ্চম সর্গ

কানন

রাত্রি

অনিল ললিতা। নলিনী ও সখীগণ। বিজয় সুরেশ বিনোদ প্রমোদ অশোক নীরদ

কাননের এক পাশে ললিতার প্রতি অনিলের গান

বউ! কথা কও!
সারাদিন বনে বনে ভ্রমিছি আপন মনে,
সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়— বউ, কথা কও!
শুন লো, বকুল-ডালে লুকায়ে পল্লবজালে
পিক-সহ পিকবধূ মুখে মুখ মিলায়ে
দু জনেতে এক প্রাণ গাহিতেছে এক গান,
রাশি রাশি স্বরসুধা বাতাসেরে বিলায়ে।
সারাদিন তপনের কিরণেতে তাপিয়া
সন্ধ্যাকালে নীড়ে ফিরে আসিয়াছে পাপিয়া।
প্রিয়ারে না দেখি তার ঢালিতেছে স্বরধার
অধীর বিলাপ তার লতাপাতা-ভিতরে,
গলি সে আকুল ডাকে বসি অতি দূর-শাখে
প্রাণের বিহগী তার "যাই যাই" উতরে।
অতি উচ্চ শাখে উঠি দেখ লো কপোত দুটি
মুখে মুখে কানে কানে কত কথা বলিছে,
বুকে বুক মিলাইয়া চঞ্চুপুট বুলাইয়া,
কপোতী সে কপোতের আদরেতে গলিছে!
এস প্রিয়ে, এস তবে মধুর— মধুর রবে
জুড়াও শ্রবণ মোর— বউ! কথা কও!
যদি বড় হয় লাজ আমার বুকের মাঝ
পাখার ভিতরে মুখ লুকাও তোমার!

অতি ধীরে মৃদু-মধু বুকের কাছেতে, বধূ,
দু-চারিটি কথা শুধু বল একবার!
[কিছুক্ষণ থামিয়া] তবে কি কবে না কথা, পুরাবে না আশা?
ভাল ভাল, কোয়ো নাকো, মুখ ফিরাইয়া থাকো,
বুঝিনু আমার পরে নাই ভালবাসা।
ললিতা। [স্বগত] কি কহিব কথা সখা? কহিতে না জানি!
বুদ্ধি নাই— ক্ষুদ্র নারী— ফুটেনাকো বাণী।
মনে কত ভাব যুঝে, হৃদয় নিজে না বুঝে,
প্রকাশ করিতে গিয়া কথা না যোগায়।
হৃদয়ে যে ভাব উঠে হৃদয়ে মিলায়।
তবে কি কহিব কথা— ভেবে নাহি পাই—
কথা কহিবার, সখা, ক্ষমতা যে নাই!
কি এমন কথা কব ভাল যা লাগিবে তব?
তুমি গো শুনাও মোরে কাহিনী বিরলে,
এক মনে শুনি আমি বসি পদতলে।
মাথার উপর দিয়া তারাগুলি যত
একটি একটি করি হবে অস্তগত।
শ্রান্তি তৃপ্তি নাহি জানি ও মুখের প্রতি বাণী
তৃষিত শ্রবণে মোর শুনিতে শুনিতে
কখন প্রভাত হ'ল নারিব জানিতে।
অনিল। জান ত— জান ত, সখি, মানুষের মন?
যে কথা সে ভালবাসে শত শতবার তা সে
ঘুরে ফিরে শুনিবারে চায় প্রতিক্ষণ।
জানি ভালবাস তুমি, ললিতা, আমারে—
তবু, সখি, প্রতিক্ষণে বড় সাধ যায় মনে
বাহিরে সে প্রেমের প্রকাশ দেখিবারে।
দু-দিনে নীরব প্রেম হয় পুরাতন।
বিচিত্রতা নাহি তায়, শ্রান্ত হয় মন।
আদরতরঙ্গ-মালা নিয়ত যে করে খেলা,
তাইতে দেখায় প্রেম নিয়ত-নূতন।

নিত্য নব নব উঠি আদরের নাম
নিয়ত নবীন রাখে প্রণয়ের ধাম।
আদর প্রেমের, সখি, বরষার জল—
না পেলে আদর-ধারা হয় সে যে বলহারা,
ভূমে নুয়াইয়া পড়ে মুমূর্ষু বিকল।
ওকি বালা, কেন হেন কাতর নয়ানে
এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ভূমিতল-পানে!
হাসিতে হাসিতে, সখি, দুটা ক্ষুদ্র কথা
কহিনু, তা'তেই মনে পেয়েছে কি ব্যথা?

ললিতা। [স্বগত] একা বসে ভাবিয়াছি কত— কতবার,
কোন গুণ নাই মোর, কি হবে আমার?
হা ললিতা! কি করিস্— দেখিস্ না চেয়ে?
শুধু দুটা কথা হা— রে— পারিস্ না কহিবারে?
দুটা আদরের কথা— বুদ্ধিহীন মেয়ে!
দেখিস্ না— দুটা কথা কহিলি না ব'লে,
আদরের ধন তোর— প্রাণের সর্ব্বস্ব তোর
হারায়— হারায় বুঝি— যায় বুঝি চলে!
শুধু দুটা কথা তুই কহিলি না ব'লে!
কি কহিবি? হা অবোধ, ভাবনা কি তায়!
মুক্তকণ্ঠে বল্ মন যা বলিতে চায়?—
মনের গোপন ধামে ডাকিস যে শত নামে
সেই নাম মুখ ফুটে ডাক্ রে তাহার!
একবার প্রাণ খুলে বল্ প্রাণেশ্বরে—
"মোর প্রেম, চিন্তা, আশা সব তোমা-'পরে;
নির্ব্বোধ নির্গুণ ব'লে— নাথ— স্বামী— প্রভু,
অসহায় অবলারে ত্যজিও না কভু!"
দিবস রজনী ভুলি বুকে তারে রাখ্ তুলি,
"ভালবাসি" "ভালবাসি" বল্ শতবার,
আলিঙ্গনে বেঁধে বেঁধে হৃদয় তাহার!
কিন্তু লজ্জা?— দূর হ রে— লজ্জা, দূর হ রে—

বিষময় বাহু তোর   বাঁধি বাঁধি শত ডোর
জীর্ণ করিয়াছে মোর মন স্তরে স্তরে!
আর না— আর না লজ্জা— দূর হ্ এখন!
চূর্ণ চূর্ণ ভেঙ্গে আর ফেলিস না মন!
শিথিল করে দে তোর   শতেক বন্ধন-ডোর,
মুহূর্ত্তের তরে মুখ তুলি একবার—
বন্ধনজর্জ্জর মন শুধু রে মুহূর্ত্ত ক্ষণ
বাহিরে বাতাসে গিয়া বাঁচুক আবার!

অনিল। আজি শুভদিনে ওকি অশ্রুবারিপাত?
অশ্রুজলে কাটাবে কি ফুলশয্যা-রাত?

[কাননের অপর পার্শ্বে
অভিমান করিয়া বিজয়ের প্রতি]

নলিনী। মিছে বোলোনাকো মোরে   ভালবাস ভালবাস!
নয়নেতে ঝরে বারি   হৃদয়ে হৃদয়ে হাস!
সারহীন— ভাবহীন   দুটা লঘু কথা ব'লে—
হেসে দুটা মিষ্ট হাসি,   দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলে,
শূন্য রসিকতা করি   দুই দণ্ড কাল হরি'
সরলহৃদয় চাহ লভিবারে অবহেলে!
অবশেষে আড়ালেতে কহ হাসি হাসি কত
রমণীর ক্ষুদ্র মন লঘু তৃণটির মত!
ভালবাসা খেলা নয়, খেলেনা নহে গো হৃদি,
নারী ব'লে মন তার দলিতে সৃজে নি বিধি!
ভাল যদি বাস, তবে ভালবাস প্রাণপণে—
ক্ষুদ্র মনে ক'রে খেলা করিও না মোর সনে!
হৃদয়ের অশ্রু ফেল দিবানিশি পদতলে,
মিছা হাসিও না হাসি— কথা কহিও না ছলে!

বিজয়। কেন বালা, আমি ত লো দিনরাত্রি ভুলে
অশ্রু ঢালিয়াছি তব প্রেমতরুমূলে,
আজিও ত কিছু তার হয় নিকো ফল,
ব্যর্থ হইয়াছে মোর এত অশ্রুজল!

নলিনী। ওই যে সুরুচি হোথায় আছে,
যাই একবার তাহার কাছে!
[দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া] দেখি নি এমন জ্বালা!
হাত হতে খসি পড়েছে কোথায়
বেল ফুলে গাঁথা বালা!
[সহসা উপরে চাহিয়া] ওই দেখ হোথা কামিনী-শাখায়
ফুটেছে কামিনীগুলি—
পাতাগুলি সাথে দু-চারিটি, সখা,
দাও-না আমারে তুলি!
বিজয়। কি পাইব পুরস্কার ?
নলিনী। পুরস্কার ?— মরি লাজে!
একটি কুসুম যদি ঠাঁই পায়
আমার অলকমাঝে—
একটি কুসুম নুয়ে পড়ে যদি
এ মোর কপোল-'পরে,
একটি পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে পড়ে পায়ে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে,
ভুলে যদি রাখি একটি কুসুম
রচিতে এ কণ্ঠহার—
তার চেয়ে বল আছে ভাগ্যে তব
আর কিবা পুরস্কার!

[বিজয়ের ফুল তুলিয়া দেওন ও তাহা
চরণে দলিয়া]

নলিনী। এই তব পুরস্কার!
অনুগ্রহ করি এ চরণ দিয়া
ফুলগুলি তব দিলাম দলিয়া,
এই তব পুরস্কার!
বিজয়। আহা! আমি যদি হতেম, সজনি,
একটি কুসুম ওর—

ওই পদতলে দলিত হইয়া
ত্যজিতাম দেহ মোর !
[গাছের দিকে চাহিয়া নলিনীর
মৃদুস্বরে গান]
খেলা কর্— খেলা কর্—
তোরা কামিনী-কুসুমগুলি !
দেখ্, সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া
কুসুমগুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার— ফিরায়ে ও ধার
দুইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি !
তোরা খেলা কর্— তোরা খেলা কর্
কামিনী-কুসুমগুলি !
কভু পাতা-মাঝে লুকা রে মুখ,
কভু বায়ু-কাছে খুলে দে বুক—
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্ কভু নাচ্
বায়ু-কোলে দুলি দুলি !
দু-দণ্ড বাঁচিবি— খেলা' তবে খেলা',
প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
ত্যেজিবি ভাবনা ভুলি !

অশোক। [দূর হইতে দেখিয়া]
ওই যে হোথায় নলিনী রয়েছে
বসি বিজয়ের সাথে !
কত কাছাকাছি !— কত পাশাপাশি !
হাত রাখি তার হাতে !
অসার হৃদয়, লঘু, হীন মন
কোন গুণ নাই যার—
শুধু ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
তারে দেহ আপনার ?

কতবার, প্রেম, যাস্ পলাইয়া
ভয়ে ফুলডোর দেখি—
ধনের সোনার শিকল হেরিয়া
আজ ধরা দিলি একি ?

সুরেশ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাই না দেখিতে
নলিনী কোথায় আছে।
ওই যে হোথায় লতাকুঞ্জতলে
বসিয়া বিজয়-কাছে !
কি ভয় হৃদয় ! জানি গো নিশ্চয়
সে আমারে ভালবাসে,
মন তার আছে আমারি কাছেতে
থাকুক সে যার পাশে !

বিনোদ। কথা শুনে তার— ভাব দেখে তার
কতবার ভাবি মনে—
নলিনী আমার— আমারেই বুঝি
ভালবাসে সঙ্গোপনে !
সত্য হয় যদি আহা !
সে আশ্বাসবাণী, সে হাসি মধুর,
সত্য যদি হয় তাহা !

নীরদ। কে আমার সংশয় মিটায় !
কে বলি দিবে সে ভাল বাসে কি আমায় ?
তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গরাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায় !
পারি নে পারি নে আর বহিতে সংশয়ভার,
চরণে ধরিয়া তার শুধাইব গিয়া,
হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া !
কিন্তু এ সংশয়ও ভাল, পাছে গো সত্যের আলো
ভাঙে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি—
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি !

[নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দূরে গমন, ও নলিনীর নিকটে গিয়া প্রমোদের গান]

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতীবালা,
আছিস কেন ফুটিয়া ?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া !
মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মুখানি !
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভিশ্বাস
যায় না তোরে বাখানি !

নলিনী। [হাসিয়া] শুনিয়া ধীরে মালতীবালা
কহিল কথা সুরভি-ঢালা,—
"আঁধার বনে আছি গো ভাল,
অধিক আশা রাখি না !
তোদের চিনি চতুর অলি,
মনো-ভুলানো বচন বলি
ফুলের মন হরিয়া লয়ে
রাখিয়া যাস যাতনা !
অবলা মোরা কুসুমবালা
সহিব মিছা মনের জ্বালা
চিরটি কাল, তাহার চেয়ে

রহিব হেথা লুকায়ে!
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভিরাশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে!"

[অশোকের নিকটে গিয়া]

অশোক, হোথায় দূরে কেন তুমি
দাঁড়াইয়া এক ধার?
কত দিন হ'ল আমার কাছেতে
আস নি ত একবার!
ভুলেছ যে প্রেম, ভুলেছ যে মোরে,
তোমার কি দোষ আছে?
এ মুখ আমার এ রূপ আমার
পুরাতন হইয়াছে?
ভাল, সখা, ভাল, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে?
যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়,
বন্ধুত্বে কি দোষ আছে?
যদি সারাদিন রহিয়া তোমার
প্রাণের রূপসী-সাথে
কোনো সন্ধ্যাবেলা মুহূর্ত্তের তরে
অবকাশ পাও হাতে,
আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে—
এসো একবার তবে!
দু-চারিটা গান গাব সবে মিলি
দু-চারিটা কথা হবে!

অশোক। [স্বগত] পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার
কাছে তার যাবনাকো মুখ দেখিব না আর,
তার মুখ হতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে—

দূরে যেতে এক পদ শুধু বাড়ায়েছি সবে,
অমনি সে কাছে চ'লে দু একটি কথা ব'লে
পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধূলিসাৎ করিয়াছে!
শুধু দুটি কথা ব'লে, একবার এসে কাছে!
জানি না কি শুধু সে গো মন ভোলাবার কথা?
সে হাসি— সে মিষ্টি হাসি— নিদারুণ কপটতা?
জানে জানে সব জানে— তবু মন নাহি মানে,
প্রতিবার ঘুরে ফিরে তবুও সে যায় তথা।
জেনে শুনে তবু তার ভাল লাগে কপটতা,
সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভুলাবার কথা!
যবে ভুলাবার তরে কপট আদর করে,
মোর মুখপানে চেয়ে গাহে প্রণয়ের গীত,
সাধ করে মন যেন হ'তে চায় প্রতারিত!
হা হৃদয়! লঘু, নীচ, হীন— হীন অতি—
খেলেনার 'পরে তোর এতই আরতি?
কখনো না— কখনো না— হোক যা হবার,
এই যে ফিরানু মুখ ফিরিব না আর!
ধিক্— ধিক্— শিশু-হৃদি! ধিক্ ধিক্ তোরে—
লজ্জার পাথারে আর ডুবাস্ নে মোরে!
কপট রমণী এক, অধম, চপল,
নির্দ্দয়, হৃদয়হীন, অসার দুর্ব্বল—
দুর্ব্বল হাতে সে ভাব যেথা ইচ্ছা সেই ধার
টলাইয়ে নুয়াইবে এ মোর হৃদয়?
তৃণ— শুষ্ক পত্র এক— দুর্ব্বলতা-ময়?
কাঁদাইবে, হাসাইবে— দূরে যেতে নাহি দিবে—
নিশ্বাসে উড়ায়ে দেবে প্রতিজ্ঞা আমার!
ইচ্ছা, সাধ, চিন্তা, আশা— দুঃখ, সুখ, ভালবাসা
সমস্ত রাখিবে চাপি পদতলে তার!
শিকলি— পশুর সম— বাঁধিবে গলায় মম,
মুহূর্ত্ত নহিবে শক্তি মাথা তুলিবার—

ধূলিতে পড়িবে লুটি এ মাথা আমার!
হা হৃদয়, কি করিলি? তুই কি উন্মাদ হলি?
সমস্ত সংসার তুই দিলি বিসর্জন!
ধন, মান, যশ, আশা— সখাদের ভালবাসা,
লুটিতে শুধু কি এক নারীর চরণ?
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার উঠিতে পড়িতে?
কাঁদিতে হাসিতে তার কটাক্ষে ইঙ্গিতে?
খেলেনা হইতে তার ভ্রূকুটি-হাসির?
কেন এত গেলি গ'লে! শুধু রূপ আছে ব'লে?
ক্ষণস্থায়ী জড়রূপ গঠিত মাটির!
কুঞ্চিত-কুন্তল তার, আরক্ত কপোল,
সুদীর্ঘ নয়ন তার কটাক্ষ বিলোল,
তাই কি ত্যজিলি তুই সমস্ত সংসার?
জীবনের উদ্দেশ্য করিলি ছারখার?
সমস্ত জগৎ হাসে ধিক্ ধিক্ বলি—
প্রতিক্ষণে আত্মগ্লানি উঠে জ্বলি জ্বলি—
তবু তার পদতলে লুটাইবি গিয়া
শুধু তার আঁখি দুটি সুদীর্ঘ বলিয়া?
কি মদিরা আছে, বালা, নয়নে তোমার!
ফেলেছ বিহ্বল করি হৃদয় আমার!
ফিরাও ফিরাও আঁখি— পাতা দিয়া ফেল ঢাকি—
হৃদয়েরে দূরে যেতে দাও একবার!
করেছি দারুণ পণ করিবারে পলায়ন,
নিষ্ঠুর মধুর বাক্যে ফিরায়ো না আর!
ও অনল হতে সাধ দূরে থাকিবার—
ফিরায়ো না মোরে, সখি, ফিরায়ো না আর!

ষষ্ঠ সর্গ

কবি ও মুরলা

কবি। উন্মাদিনী কল্লোলিনী ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী
শিলা হতে শিলান্তরে লুটিয়া লুটিয়া,
নেচে নেচে, অট্টহেসে, ফেনময় মুক্তকেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া!
শুধু মুহূর্ত্তের তরে তিল বিচলিত করে
সে প্রশান্ত সলিলের শুধু এক পাশ—
উনমত্ত কোলাহল অধীর তরঙ্গদল
মুহূর্ত্তের মাঝে সব পায় গো বিনাশ!
দেখ, সখি, গৃহমাঝে দেখ গো চাহিয়া,
নাচ, গান, বাদ্য, হাসি— আমোদ কল্লোলরাশি—
নিশীথপ্রশান্তি-মাঝে পড়িছে ঝাঁপিয়া!
আলোকে আলোকে গৃহ উঠেছে মাতিয়া,
স্ফটিকে স্ফটিকে আলো নাচে বিদ্যুতিয়া,
শত রমণীর পদ পড়ে তালে তালে।
চরণের আভরণ নেচে নেচে প্রতিক্ষণ
শত আলোকের বাণ হানে এককালে,
মূর্চ্ছিয়া পড়িছে আলো হীরকে হীরকে!
শতকৃষ্ণ আঁখিতারা হানিছে আলোকধারা—
শত হৃদে পড়ে গিয়া ঝলকে ঝলকে!
চারি দিকে ছুটিতেছে আলোকের বাণ,
চারি দিকে উঠিতেছে হাসি বাদ্য গান।
কিন্তু হেথা চেয়ে দেখ কি শান্ত যামিনী!
কি শুভ্র জোছনা ভায়! কি শান্ত বহিছে বায়!
কেমন ঘুমন্ত আছে প্রশান্ত তটিনী!
বল, সখি, পূর্ণিমা কি আমোদের রাত?
এস তবে দুই জনে বসি হেথা এক সনে,

করি আপনার মনে রজনী প্রভাত !

গান

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায় ।
ধীরে ধীরে অতিধীরে— অতিধীরে গাও গো !
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো !
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা সমান
অতি— অতি— অতিধীরে কর সখি গান !
নিশার কুহক-বলে নীরবতাসিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর—
প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাস-ময় সঙ্গীতের স্বর !
তটিনী কি শান্ত আছে ! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদুহস্ত-পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বনধ্বনি শুনে চমকে আপনি !
তাই বলি অতি ধীরে— অতি ধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো !

[মুরলার প্রতি]

কেন লো মলিন, সখি, মুখানি তোমার ?
কাছে এস, মোর পাশে বোসো একবার !
কেন, সখি, বল্ মোরে, যখনি দেখেছি তোরে
মাটি-পানে নত দুটি বিষণ্ণ নয়ান !
আননের দুই পাশ অবদ্ধ কুন্তলরাশ—
করুণ ও মুখখানি বড়, সখি, ম্লান !

মুরলা। সত্য ম্লান কি গো, কবি, এ মুখ আমার ?
নিশীথবাতাস লাগি   মনে কত উঠে জাগ
নিস্তব্ধ জোছনারাতে ভাবনার ভার !
[স্বগত] আহা কি করুণ, সখা, হৃদয় তোমার !
কবি গো ! বুক যে যায়— ভেঙ্গে যায়, ফেটে যায়—
অশ্রুজল রুধিবারে পারিনাক আর !
পারি নে— পারি নে সখা, পারি নে গো আর !
ভেঙ্গে বুঝি ফেলে তারা মর্ম্মকারাগার !
একবার পায়ে ধরে   কেঁদে নিই প্রাণ ভরে—
একবার শুধু, কবি, শুধু একবার !
যুঝিছে বুকের মাঝে শত অশ্রুধার !
কবি। একটি প্রাণের কথা রয়েছে গোপনে,
বলিব বলিব তোরে করিতেছি মনে !
আজ জোছনার রাতে বিপাশার তীরে
কাছে আয়, সে কথাটি বলি ধীরে ধীরে !
মুরলা। কি কথা সে ? বল কবি ! করহ প্রকাশ !
কবি। কে জানে উঠেছে হৃদে কিসের উচ্ছ্বাস !
খেলিছে মর্ম্মের মাঝে অধীর উল্লাস !
অথচ, উল্লাস সেই সুকুমার হেন,
শিশিরের বাষ্প দিয়ে গঠিত সে যেন !
হৃদয়ে উঠেছে যেন বন্যা জোছনার,
মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার।
সূক্ষ্ম আবরণ, গাঁথা সন্ধ্যামেঘস্তরে,
পড়িয়াছে যেন মোর নয়নের 'পরে !
কিছু যেন দেখেও দেখে না আঁখিদ্বয়,
সকলি অস্ফুট, যেন সন্ধ্যাবর্ণময় !
শোন্ বলি, মুরলা লো, আয়লো আয় কাছে—
শূন্য এ হৃদয় মোর ভাল বাসিয়াছে !
মুরলা। ভালবাসে ? কারে কবি ? কারে সখা ? কারে ?
কবি। মধুর নলিনী-সম নলিনী বালারে !

মুরলা। নলিনী ? নলিনী সখা ! নলিনী বালারে ?
কবি মোর ! সখা মোর ! ভালবাস তারে ?

কবি। হাঁ মুরলা, সেই নলিনী বালারে,
তারে তুমি জান না কি ?
এমন মধুর মুখভাব তায় ?
এমন মধুর আঁখি !
এত রাশি রাশি খেলাইছে হাসি
হৃদয়ের নিরালায় —
নয়ন অধর ভাসাইয়া দিয়া
উথলি পড়িয়া যায় !
যে দিকে সে চায় হাসিময় চোখে
হাসি উঠে চারি ধার,
যে দিকে সে যায়— আঁধার মুছিয়া
চলে জ্যোতি-ছায়া তার !
তার সে-নয়ন-নির্ঝর হইতে
হাসি সুধারাশি ঝরি,
এই হৃদয়ের আকাশ পাতাল
রেখেছে জোছনা করি !

মুরলা। [স্বগত] দেবি গো করুণাময়ী,
কোথা পাই ঠাঁই মা গো— কোথা গিয়ে কাঁদি !
দুর্ব্বল এ মন দে মা পাষাণেতে বাঁধি !

[প্রকাশ্যে] আহা, কবি, তাই হোক্— সুখে তুমি থাক।
এ নব প্রণয়ে মন পূর্ণ করে রাখ !
নয়নের জল তব কিছুতে মোছে নি,
হৃদয়-অভাব তব কিছুতে ঘোচে নি —
আজ, কবি, ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে,
আজ যদি থামে তব নয়নের ধার,
দেবতা গো, তাই করো ! চিরজন্ম সুখী করো
কবিরে আমার, বাল্য-সখারে আমার !

কবি। মুছ অশ্রুজল, সখি, কেঁদো না অমন –
যে হাসির কিরণেতে পূর্ণ হ'ল মন
একেলা বিজনে বসি কবিরে তোমার
কাঁদিতে দেখিতে, সখি, হবেনাক আর!
আজ হতে মিলাবে না হাসি এ অধরে,
বিষণ্ণ হবে না মুখ মুহূর্ত্তের তরে।
আয় সখি, আয় তবে, কাছে আয় মোর—
মুছাইয়া দিই আহা অশ্রুজল তোর!

মুরলা। অশ্রু মুছায়ো না আর— বহুক যা বহিবার—
এখনি আপনা হতে থামিবে উচ্ছ্বাস!
এ অশ্রু মুছাতে, কবি, কিসের প্রয়াস!
ক্ষুদ্র হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ
আপনি সে জাগি উঠে— আপনি শুকায় ফুটে,
চেয়েও দেখে না কেহ উঠুক-পড়ুক!
এস সখা, ওই কাঁধে রাখি এই মুখ
একে একে সব কথা কহ গো আমারে—
বড় ভাল বাস কি সে নলিনী বালারে?

কবি। শুধু যদি বলি, সখি, ভাল বাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়।
ভালবাসা ভালবাসা সবাই ত কয়,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়!
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা বলে
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়!
মনে হয় যেন, সখি, এত ভালবাসা
কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই—
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা!

মুরলা। তাই হোক, ভাল তারে বাস প্রাণপণে!
তারে ছাড়া আর কিছু না থাকুক মনে!

কবি। সে আমার ভালবাসা না যদি পূরায়!
যেই প্রেম-আশা লয়ে রয়েছি উন্মত্ত হয়ে,

বিশ্ব দেখি হাস্যময় যাহার মায়ায়,
যদি সখি, ফিরে নাহি পাই ভালবাসা—
ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে সেই প্রেম-আশা—
মুমূর্ষু আশার সেই শুষ্ক দেহভার
সমস্ত জগৎ-ময় বহিয়া বেড়াতে হয়—
শ্রান্ত হৃদি দিবানিশি করে হাহাকার !
অসুস্থ আশার সেই মুমূর্ষু-নিশ্বাসে
যদি এ হৃদয় হয় শূন্য মরুভূমিময়,
হৃদয়ের সব বৃত্তি শুকাইয়া আসে—
দিনরাত্রি মৃত ভার করিয়া বহন
ম্রিয়মাণ হয়ে যদি পড়ে এই মন !

মুরলা। ও কথা বোলো না, কবি, ভেবো নাক আর—
নিশ্চয় হইবে পূর্ণ প্রণয় তোমার।
কি-জানি-কি-ভাবময় ওই তব মুখ—
ওই তব সুধাময়— প্রেমময়— স্নেহময়—
সুকুমার— সুকোমল— করুণ ও মুখ—
হাসি আর অশ্রুজলে মাখানো ও মুখ—
রাখিতে প্রাণের কাছে এমন কে নারী আছে
পেতে না দিবেক তার প্রেমময় বুক !
শত ভাব উথলিছে ওই আঁখি দিয়া,
শত চাঁদ ওই খানে আছে ঘুমাইয়া —
মুছাইতে ও মধুর নয়নের ধার
কোন্ নারী দিবেনাক আঁচল তাহার !
মধুময় তব গান দিবারাত করি পান
ঘুমাইয়া পড়িবে সে হৃদয়ে তোমার।
বসি ওই পদমূলে মুগ্ধ আঁখিপাতা তুলে
দিন রাত্রি চেয়ে রবে ওই মুখপানে
সূর্য্যমুখী ফুল-সম অবাক নয়ানে !
হেন ভাগ্যবতী নারী কে আছে ধরায়
যেজন কবির প্রেম না চাহিয়া পায় !

[স্বগত] মুরলা রে, কোন আশা পূরিল না তোর—
কাঁদ্ তুই অভাগিনী এ জীবন-ভোর !
এ জনমে তোর অশ্রু মুছাবে না কেহ,
এ জনমে ফুটিবে না তোর প্রেম স্নেহ !
কেহ শুনিবে না আর তোর মর্ম্মব্যথা,
ভালবেসে তোর বুকে রাখিবে না মাথা !
বড় যদি শ্রান্ত হয়ে পড়ে তোর মন
কেহ নাহি কহিবারে আশ্বাসবচন !
মাতৃহারা শিশু-মত কেঁদে কেঁদে অবিরত
পথের ধূলার পরে পড়িবি ঘুমায়ে—
একটি স্নেহের নেত্র দেখিবে না চেয়ে ?

[নলিনীর প্রবেশ]

[দূর হইতে] কবি। পূর্ণিমারূপিণী বালা ! কোথা যাও, কোথা যাও !
একবার এই দিকে মুখানি তুলিয়া চাও !
কি আনন্দ ঢেলেছ যে, কি তরঙ্গ তুলেছ যে
আমার হৃদয়মাঝে একবার দেখে যাও !
দিবানিশি চায়, বালা, অধীর ব্যাকুল মন
ও হাসি-সমুদ্র-মাঝে করে আত্মবিসর্জ্জন !
হেরি ওই হাসিময় মধুময় মুখপানে
উন্মত্ত অধীর হৃদি তিল দূর নাহি মানে—
চায়, অতি কাছে গিয়া ওই হাত দুটি ধরি
অচেতনে কাটাইয়া দেয় দিবা বিভাবরী !
একটি চেতনা শুধু জাগি রবে অনিবার—
সে চেতনা তুমি-ময়— ওই মিষ্ট হাসি -ময়—
ওই সুধামুখ-ময়— কিছু— কিছু নহে আর !
আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি—
তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ-'পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে !

তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে-কিরণে-ভরা
উড়েছে কল্পনা, কোথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা !
হরিত-আসন-'পরে নন্দনবনের কাছে
ফুলবাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল-'পরে
তোমারে কল্পনারাণী বসায়েছে সমাদরে—
চারি দিকে জুঁইফুল   চারি দিকে বেলফুল—
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে অজস্র কুসুমকুল,
শাখা হতে নুয়ে প'ড়ে পরশিয়া এলো চুল
শতেক মালতীকলি   হেসে হেসে চলাচলি,
কপালে মারিছে উঁকি   কপোলে পড়িছে ঝুঁকি
ওই মুখ দেখিবারে কৌতূহলে সমাকুল,
অজস্র গোলাপ-রাশি পড়িয়া চরণতলে
না জানি কি মনোদুখে আকুল শিশিরজলে !
তোমার প্রতিমা লয়ে কল্পনা এমনি করি
খেলাইয়া বেড়াইছে, নাহি দিবা বিভাবরী—
কভু বা তারার মাঝে কভু বা ফুলের 'পরে
কভু বা উষার কোলে কভু সন্ধ্যামেঘস্তরে ;
কত ভাবে দেখিতেছে,   কত ছবি আঁকিতেছে—
প্রফুল্ল-আনন কভু হরষের হাসি-মাখা,
অভিমান-নত আঁখি কভু অশ্রুজলে ঢাকা।
কাছে এস, কাছে এস, একবার মুখ দেখি—
তোল গো, নলিনীবালা, হাসিভারে নত আঁখি !
মর্ম্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয়তলে,
ওই হাতে হাত দিয়ে   প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
বসন্তের বায়ু সেবি কুসুমের পরিমলে
নীরব জোছনা রাতে বিপাশাতটিনীতীরে
ফুলপথ মাড়াইয়া দোঁহে বেড়াইব ধীরে !
আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর,
ঘুমময় জাগরণে করিব রজনী ভোর !

আহা সে কি হয় সুখ! কল্পনায় ভাবি মনে
বিহ্বল আঁখির পাতা মুদে আসে দু-নয়নে!

মুরলা। [স্বগত] হৃদয় রে!
এ সংসারে আর কেন রয়েছি আমরা?
তুচ্ছ হতে তুচ্ছ আমাদেরো তরে আজ
তিলমাত্র স্থান কি রে রাখিয়াছে ধরা!
এখনো কি আমাদের ফুরায় নি কাজ?
হৃদয় রে! হৃদয় রে! ওরে দগ্ধ মন!
আমাদের তরে ধরা হয় নি সৃজন!

কবি। মুরলা লো! চেয়ে দেখ্— চেয়ে দেখ্ হোথা!
বল্ দেখি এত হাসি এত মিষ্ট সুধারাশি
হেন মুখ হেন আঁখি দেখেছিস্ কোথা?

মুরলা। এমন সুন্দরী আহা কভু দেখি নাই—
কবির প্রেমের যোগ্য আর কিবা চাই!
কবিতার উৎস-সম ও নয়ন হতে
ঝরিবে কবিতা তব হৃদে শত-স্রোতে!
হাসিময় সৌন্দর্য্যের কিরণ-পরশে
বিহঙ্গম-হৃদি তব গাহিবে হরষে—
মধুর সঙ্গীতে বিশ্ব করিবে প্লাবন!
সুখে থাকো পূর্ণ মনে, ভালবাসো প্রাণপণে
প্রেমযোগ্য নারী যবে পেয়েছ এমন!
[স্বগত] কেন এত অশ্রু আজি করি বরিষণ?
কেন রে কিসের দুখ? কেন এত ফাটে বুক?
কিসের যন্ত্রণা মর্ম্ম করিছে দংশন?
কখনো ত কবির অমূল্য ভালবাসা
অভাগিনী মনে মনে করি নাই আশা!
জানিতাম চিরদিন রূপহীন গুণহীন
তুচ্ছ মুরলার এই ক্ষুদ্র ভালবাসা
পূরাতে নারিবে তাঁর প্রণয়পিপাসা—
মোরে ভালবেসে কবি সুখী হইবে না!

তবু আজ কিসের গো, কিসের যাতনা!
আজ কবি মুছেছেন অশ্রুবারিধার,
বহুদিনকার আশা পূরেছে তাঁহার!
আহা কবি, সুখে থাকো, আর কিছু চাই নাকো—
এই মুছিলাম অশ্রু, আর কাঁদিব না!
কিসের যাতনা মোর, কিসের ভাবনা!

কবি। ওই দেখ্ ফুল তুলে আঁচলটি ভরি
কামিনীর শাখা লয়ে ওই দেখ্ ভয়ে ভয়ে
অতি যত্নে রাখিয়াছে নোয়াইয়া ধরি,
পাছে কুসুমের দল ছুঁয়ে পড়ে ঝরি!
ওই দেখ্ উচ্চ শাখে ফুটিয়াছে ফুল,
তুলিবার তরে আহা কতই আকুল!
কিছুতে তুলিতে নারে কত চেষ্টা করি—
শাখাটি ধরিয়া শেষে নাড়িছে মধুর রোষে,
কুসুম শতধা হোয়ে পড়িতেছে ঝরি।
বিফল হইয়া শেষে সখীদের কোলে
ওই দেখ্ হেসে হেসে পড়িতেছে ঢলে!

মুরলা। [স্বগত]
আমি যদি হইতাম হাস্যোল্লাসময়
নির্ঝরিণী, বরষার নবোচ্ছ্বাসময়!
হরষেতে হেসে হেসে কবির কাছেতে এসে
ডুবাতেম ভালবেসে আদরে আদরে!
যদি কভু দেখিতাম মুহূর্তের তরে
বিষাদ ছাইছে পাখা কবির অধরে,
হাসিয়া কত-না হাসি ঢালিয়া সঙ্গীতরাশি
মৃদু অভিমান করি' মৃদু রোষভরে—
মৃদু হেসে মৃদু কেঁদে বাহুতে বাহুতে বেঁধে
দিতেম বিষাদতার সব দূর করে!
কিন্তু আমি অভাগিনী ছেলেবেলা হতে
এ গম্ভীর মুখে মম অন্ধকার ছায়া-সম

রহিয়াছি সতত কবির সাথে সাথে !
আমি লতা গুরুভার মেলি শাখা অন্ধকার
হেন ঘন আলিঙ্গনে করেছি বেষ্টন,
উন্নত মাথায় তাঁর পড়িতে দিই না আর
চাঁদের হাসির আলো, রবির কিরণ !
হা মুরলা, মুরলা রে, এমনি করেই হা রে
হারালি— হারালি বুঝি ভালবাসা-ধন !
বুক, ফেটে যা রে, অশ্রু কর্ বরিষণ—
কবি তোর অশ্রুধার দেখিতে পাবে না আর,
যে কিরণে আছে ডুবি তাঁহার নয়ন !
দুর্ব্বল— দুর্ব্বল হৃদি ! আবার ! আবার !
আবার ফেলিস্ তুই অশ্রুবারিধার ?
আবার আবার কেন হৃদয়দুয়ারে হেন
পাষাণে পাষাণে গাঁথা কে যেন হানিছে মাথা,
কে যেন উন্মাদ-সম করে হাহাকার—
সমস্ত হৃদয়ময় ছুটিয়া আমার !
থাম্ থাম্, থাম্ হৃদি, মোছ্ অশ্রুধার !
কবি যদি সুখী হয় কি ভাবনা আর !
আহা কবি, সুখী হও ! তুমি কবি সুখী হও !
আমি কে সামান্য নারী ?— কি দুঃখ আমার !
তুমি যদি সুখী হও কি দুঃখ আমার !
ও চাঁদের কলঙ্কও হতে নাহি পারি
এত ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি নারী !

[চপলার প্রবেশ ও গান]

সখি, ভাবনা কাহারে বলে ?
সখি, যাতনা কাহারে বলে ?
তোমরা যে বল দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা,
সখি, ভালবাসা কারে কয় ?

সে কি কেবলি যাতনাময় ?
তাহে কেবলি চোখের জল ?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস ?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ ?
জীবনের খেলা খেলিছে বিধাতা,
আমরা তাহার খেলেনা—
আমাদের কিবা সুখ !
সখি, আমাদের কিবা দুখ !
সখি, আমাদের কিবা যাতনা !
তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল
ব্যথা বড় বাজে বুকে—
তবু ত, সজনি, বুঝিতে পারি নে
কাঁদ যে কিসের দুখে !
আমার চোখেতে সকলি শোভন—
সকলি নবীন— সকলি বিমল—
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত !
কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত !
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায় !
আমার মতন সুখী কে আছে !
আয় সখি, আয় আমার কাছে !
সুখী হৃদয়ের সুখের গান

শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ !
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা !

[মুরলার প্রতি]

এই যে আমার সখীর অধরে
ফুটেছে মৃদুল হাসি !
আয়, সখি, মোরা দুজনে মিলিয়া
ললিতারে দেখে আসি।
মালতী সেথায়, মাধবী সেথায়,
সখীরা এসেছে সবে,
এতখনে সেথা ফাটিছে আকাশ
কমলার হাসিরবে।

মুরলা। চল্ সখি, চল্ তবে।

সপ্তম সর্গ

অনিল ললিতা

অনিল। [গাহিতে গাহিতে]

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না !
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠে না !
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি

চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না।
লাজময়ি! তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না।

ললিতা। [স্বগত]

পাষাণে বাঁধিয়া মন আজ করেছিনু পণ
কাছে যাব— কথা কব— যাচিব আদর আজ!
ওরে মন, ওরে মন, কার কাছে তোর লাজ?
আপনার চেয়ে যারে করেছিস্ আপনার
তার কাছে বল্ দেখি কিসের সরম আর?

অনিল। ফুল তুলিবার ছলে ওই যে ললিতা আসে,
মনে মনে জানা আছে এলেই আমার কাছে
অমনি হাতটি ধরি বসাব আমার পাশে।
অন্য দিক -পানে আমি চাহিয়া রহিব আজ,
দেখিব কেমন করি কোথা তার থাকে লাজ?

ললিতা। [ফুল তুলিতে তুলিতে]

নাহয় বসিনু কাছে, কি তাহাতে দোষ আছে?
বসিব নাথের পাশে তাহাতে কি আসে যায়?
আর, লজ্জা— লজ্জা নয়— লজ্জারে করিব জয়—
নাহয় বসিনু কাছে, কিসের সরম তায়!
কোথা লজ্জা— লজ্জা কোথা? এই ত বসিনু হেথা—
এই ত করিনু জয়, এই ত বসিনু কাছে—
বসিব নাথের পাশে কি তাহাতে দোষ আছে?
এখনো — এখনো মোরে দেখিতে পান নি তবে—
তবে কি গো আরো কাছে— আরো কাছে যেতে হবে?
আর নয়— আরো কাছে যাইব কেমন করে?
হেথা তবে বসে থাকি, মালাগুলি গেঁথে রাখি,

এখনি ভাবনা ভাঙ্গি দেখিতে পাইবে মোরে!
যদিবা দেখিতে পায় কি তবে করিবে মনে?
যদি গো বুঝিতে পারে দেখিতে এসেছি তারে,
মিছে মালা-গাঁথা ছলে বসে আছি এইখানে?

অনিল। এই যে ললিতা হোথা— ফুরালো কি মালা গাঁথা?
আরেকটু কাছে এসে নাহয় গাঁথিতে মালা!
এই হেথা কাছে আয়— কিসের সরম তায়?
কেমন গাঁথিলি ফুল একবার দেখি বালা!
আদরিণী— আদরিণী— দেখি হাতখানি তোর!
এমনি করিয়া, সখি, বাঁধ্‌ লো হৃদয় মোর!
একবার দেখি সখি, কাছে আন্ মুখখানি—
এমনি করিয়া রাখ্‌ বুকের মাঝারে আনি!
কেন, লাজ এত কেন— আঁখি দুটি নত কেন?
কি করেছি? একটি শুধু চুম্বন বইত নয়!
আরেকটি এই লও— আরেকটি এই লও—
আর নয় করিব না বড় যদি লাজ হয়!
নাহয় কুন্তল দিয়ে ঢেকে দিই মুখখানি!
দেখিতে আনন তোর ওই চন্দ্র ভাবে-ভোর
এক দৃষ্টে চেয়ে, সখি, রয়েছে অবাক্ মানি!
ওই দেখ্‌ তারাগুলি সহস্র নয়ন খুলি
ওই মুখটির তরে খুঁজিছে সমস্ত ধরা—
উচিত কি হয়, সখি, তাদের নিরাশ করা—
নয়নে নয়ন রাখি একবার মেল আঁখি,
মিশাও কপোলে মোর ললিত কপোল তব!
কথা কও কানে কানে, মৃদু প্রণয়ের গানে
জাগাও ঘুমন্ত হৃদে সুখস্বপ্ন নব নব!
মনে আছে সেই রাত্রে কত সাধনার পরে
একটি সঙ্গীত, সখি, গিয়াছিলে গাহিবারে—
আরম্ভ করেই সবে অমনি থামালে গীত,
নিজের কণ্ঠের স্বরে নিজে হয়ে সচকিত!

সেই আরম্ভের কথা এখনো রয়েছে কানে,
সেই আরম্ভের সুর এখনো বাজিছে প্রাণে!
সে আরম্ভ শেষ, বালা, আজিকে করিতে চাই!
বড় কি হতেছে লাজ? ভাল, সখি, কাজ নাই!

ললিতা। [স্বগত] কি কহিব? বড়, সখা, মনে মনে পাই ব্যথা,
না জানি গাহিতে গান, না জানি কহিতে কথা!
কত আজ বেছে বেছে তুলেছি কুসুমভার,
কতখন হতে আজ ভেবেছি ভুলিয়া লাজ
নিশ্চয় এ ফুলগুলি দিব তারে উপহার!
হাতটি এগিয়ে আজ গিয়েছিনু কতবার,
অমনি পিছায়ে হাত লইয়াছি শতবার!
সহস্র হউক লাজ, এ কুসুমগুলি আজ
নিশ্চয় দিব গো তাঁরে না হবে অন্যথা তার!
কিন্তু কি বলিয়া দিব? কি কথা বলিতে হবে?
বলিব কি— "ফুলগুলি যতনে এনেছি তুলি,
যদি গো গলায় পর' মালা গেঁথে দিই তবে"?
ছি ছি গো বলি কি করে— সরমে যে যাব মরে—
নাইবা বলিনু কিছু, শুধু দিই উপহার!
দিই তবে? দিই তবে? দিই তবে এইবার?
দূর হোক, কি করিব? বড় যে গো লজ্জা করে!
থাক্ গো এখন থাক্— দিব আরেকটু পরে!

অনিল। কি হয়েছে? দিতে কি লো চাস্ ফুল-উপহার?
দে-না লো গলায় গেঁথে, কিসের সরম তার?
একটি দাও ত সখি, পরাই তোমার চুলে।
আর ছুটি দাও সখি, পরাইব কর্ণমূলে।
মোরে দাও সবগুলি— গাঁথিব ফুলের বালা,
গলায় দুলায়ে দিব গাঁথিয়া চাঁপার মালা,
আসন রচিয়া দিব দিয়ে শত শতদল!
তা হলে কি দিবি মোরে— বল্ সখি বল্ বল্—
যতগুলি ফুল গাঁথি যত তার দল আছে

তবেক চুম্বন আমি লইব তোমার কাছে!
যত দিন না পারিবি শুধিতে চুম্বন-ধার
এ ভুজে রহিবি বদ্ধ এই বক্ষকারাগার!
দিবানিশি সজনি লো রেখে দেব চোখে চোখে!
বল্ তবে ফুলসাজে সাজায়ে দেব কি তোকে?
বলিবি না? ভাল, সখি, ছুইটি চুম্বন দাও—
নাহয় একটি দিও, মহার্ঘ হল কি তাও?

ললিতা। [স্বগত]

আরেকটি বার, সখা, কর গো চুম্বন মোরে—
আরেকটি বার, সখা, রাখ গো বুকেতে ধরে!
জান আমি মুখ ফুটে সরমে বলিতে নারি,
তাই কি সহিতে হবে? এত শাস্তি, সখা, তারি?
আদরে হৃদয়ে যদি রাখ এ মাথাটি মোর,
আদরে চুম গো যদি আঁখির পাতাটি মোর,
তাহাতে আমার, সখা, অসাধ কি হতে পারে?
তবে কেন ব্যথা দিতে শুধাইছ বারে বারে?
আকুল ব্যাকুল হৃদি মিলিবারে তব পাশে
শতবার ধায়, সখা, শতবার ফিরে আসে!
দীন আপনারে হেরে এমন সে লাজ পায়
তোমার কাছেতে, সখা, সঙ্কোচে না যেতে চায়!
সখা, তারে ডেকে নাও— তুমি তারে ডেকে নাও—
তোমারি সে মুখ চেয়ে দাঁড়াইয়া একধার,
একটু আদর পেলে স্বর্গ হাতে পাবে তার!

অনিল। ডুবিছে চতুর্থী চাঁদ বিপাশার নীরে।
আয় সখি, আয় মোরা ঘরে যাই ফিরে।
আঁধারে কাননপথ দেখা নাহি যায়,
আয় তবে আরো কাছে— আরো কাছে আয়।
হাতখানি রাখ্ মোর হাতের উপর,
শ্রান্ত যদি হোস্ মোর কাঁধে দিস্ ভর।
দেখিস্, বাধে না যেন চরণ লতায়—

আঁচল না ছিঁড়ে যায় গাছের কাঁটায়!
চমকি উঠিলি কেন? কিছু নাই ভয়—
বাতাসের শব্দ শুধু, আর কিছু নয়!
এই দিকে পথ, বালা, এই দিকে আয়—
বাম পাশে বিপাশার স্রোত বহে যায়।
শ্রান্তি কি হতেছে বোধ? লজ্জা কেন প্রিয়ে?
বেষ্টন কর না মোর স্কন্ধ বাহু দিয়ে!
কিসের তরাস এত— ও কি বালা, ও কি?
ঝরিয়া পড়েছে শুধু শুষ্ক পত্র সখি!
ওই গেল গেল চাঁদ, ওই ডোবে ডোবে—
একটু জোছনারেখা এখনো যেতেছে দেখা,
আর নাই— আর নাই— ওই গেল ডুবে!

অষ্টম সর্গ

মুরলা ও চপলা

চপলা। দেখ্, সখি মোর, সত্য কহি তোরে
প্রাণে বড় ব্যথা বাজে—
চপলার কেহ সখী নাই হেথা
এত বালিকার মাঝে!
তোদের ও মুখ হেরিলে মলিন
হৃদয় কাঁদিয়া উঠে,
আকুল হইয়া শুধাবার তরে
তাড়াতাড়ি আসি ছুটে।
শতবার করে শুধাই তোদের,
কথা না কহিস্ তবু—
ভাবিস চপলা অবোধ বালিকা
কিছু সে বুঝে না কভু!

চোখের জলের কাহিনী বুঝে না,
বুঝে না সে ভালবাসা,
পড়িতে পারে না প্রাণের লিখন
দুখের সুখের ভাষা!
ভাল, সখি, ভাল, নাইবা বুঝিল
তাহাতে কি যায় আসে?
চপলা কি শুধু হাসিতেই জানে,
কাঁদিতে কি জানে না সে?
মুরলা আমার, তোরে আমি এত
ভালবাসি প্রাণ ভ'রে—
তবু একদিন তোর তরে, সখি,
কাঁদিতে দিবি নে মোরে?

মুরলা। চপলাটি মোর, হাসিরাশি মোর,
আমার প্রাণের সখি!
নিজের হৃদয় নিজেই বুঝি না,
অপরে তা বুঝাব কি?
যাহাদের সুখে আমি সুখে রই
সকলেই সুখী তারা—
তবে কেন আমি একেলা বসিয়া
ফেলি এ নয়নধারা?
সকলেই যদি সুখে থাকে, সখি,
আমি থাকিব না কেন?
প্রমোদ তেয়াগি বিজনে আসিয়া
কেন বা কাঁদিব হেন?
নিজের মনেরে বুঝাহু কতই,
কিছুই না পেনু সাড়া—
মুরলার কথা শুধাস্ নে আর,
মুরলা জগত-ছাড়া!

চপলা। এত দিনে দেখি কবির অধরে
হরষকিরণ জলে—

যেন আঁখি তার ডুবিয়া গিয়াছে
সুখের স্বপনতলে!
জোছনা উদিলে কুসুমকাননে
একেলা ভ্রমিয়া ফিরে,
ভাবে-মাতোয়ারা আপনার মনে
গান গাহে ধীরে ধীরে।
নয়নে অধরে মলয়-আকুল
বসন্ত বিরাজ করে,
মধুর অথচ উদাস হরষ
ঘুমায় মুখের 'পরে!
হেন ভাব কেন হেরি লো তাহার
শুধাইব তোর কাছে।
বড়ই সে সুখে আছে।

মুরলা। চপলা, সখি লো, দেখেছিস তারে?
বড় কি সে সুখে আছে?
কেমনে বুঝিলি বল্ তাহা বল্
বল্ সখি মোর কাছে!
বড় কি সে সুখে আছে?

চপলা। হাঁ লো, সখি, হাঁ লো— শোন্ বলি তোরে—
আয়, সখি, মোর পাশে—
কবি আমাদের নলিনীবালারে
মনে মনে ভালবাসে।
সত্য কহি তোরে, নলিনীরে বড়
ভাল নাহি লাগে মোর—
শুনিয়াছি নাকি পাষাণ হতেও
মন তার সুকঠোর!

মুরলা। সে কি কথা বালা! মুখখানি তার
নহে কি মধুর অতি?
নয়নে কি তার দিবস রজনী
খেলে না মধুর জ্যোতি?

চপলা। শুনেছি সে জ্যোতি আলেয়ার চেয়ে
কপট, চপল নাকি—
পথিকের পথ ভুলাবারি তরে
জ্বলি উঠে থাকি থাকি!
শুনেছি সে বালা সারাটি জীবন
চড়িয়া পাষাণরথে
চাকায় দলিয়া চলিবারে চায়
হৃদয়বিছানো পথে!
শুনেছি সে নাকি একটি একটি
হৃদয় গণিয়া রাখে—
কি কুখনে, আহা, কবি আমাদের
ভাল বাসিয়াছে তাকে!

মুরলা। চপলা, চপলা, পায়ে ধরি তোর,
ক'স্ নে অমন করে।
তুই লো বালিকা হৃদয় তাহার
চিনিবি কেমন করে?

চপলা। কে জানে, সজনি, বুঝিতে পারি নে
কেন যে হইল হেন—
তাহারে হেরিলে মুখ ফিরাইতে
সাধ যায় মোর যেন?
সেদিন যখন দেখিনু নলিনী
বসিয়া কবির সাথে,
সরমের বেশে লাজহীন হাসি
খেলিছে আঁখির পাতে,
দেখিনু কপোল ঢাকিয়া তাহার
অলক পড়েছে ঝুলি,
আঁচলেতে গাঁঠ বাঁধি শতবার
শতবার ফেলে খুলি,
কে জানে আমার ভাল না লাগিল
চলে এনু ত্বরা করে—

কপট সরম দেখিলে, সজনি,
সরমেতে যাই ম'রে !
মুরলা আমার, অমন করিয়া
কেন লো রহিলি বসি !
দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া
এসেছে ও মুখশশী !
ভাবিস্ নে, সখি, কমলা কয়েছে
কাল মোর কাছে এসে
পাষাণহৃদয়া নলিনীও নাকি
ভালবাসে কবিরে সে।
শুনেছি নলিনী কবিরে দেখিতে
নদীতীরে যায় নাকি।
কবিরে দেখিলে চ'লে পড়ে তার
অনুরাগনত আঁখি।

মুরলা। নলিনীবালারে ভালবেসে যদি
কবি মোর সুখে থাকে
তাহা হলে, সখি, বল্ দেখি মোরে
কেন না বাসিবে তাকে ?
মোরা তাহা লয়ে ভাবি কেন এত ?
চপলা লো, আমরা কে ?

চপলার গান

যে ভাল বাসুক— সে ভাল বাসুক—
সজনি লো, আমরা কে !
দীনহীন এই হৃদয় মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে ?
তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভালবাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বল
কেবা কাঁদে, কেবা হাসে !

আমাদের মন কেহই চাহে না,
তবে মনখানি লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
যদি, সখি, কেহ ভুলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি-পালটি দু-দণ্ড ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায়!
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্,
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্!

নবম সর্গ

নলিনী ও সখীগণ

নলিনী। [গাহিতে গাহিতে]
কি হল আমার? বুঝি বা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি!
প্রভাতকিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মনফুল দলি চলি বেড়াইতে—
সহসা, সজনি, চেতনা পাইয়া

সহসা, সজনি, দেখিনু চাহিয়া
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়মাঝারে
　　হৃদয় হারিয়েছি!
পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে
　　হৃদয় হারিয়েছি!
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
তার 'পর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে—
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
　　যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
আমার কুসুমকোমল হৃদয়
　　কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
　　সহে নি ভ্রমরচরণ-ভর!
চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত,
জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত,
হাসিপরিমলে অধর ভরিয়া
লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে—
কাছে এলে তারে দিত না বসিতে—
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
　　কোথায় হারিয়েছি!
এখনো যদি গো খুঁজিয়া পাই
　　এখনো তাহারে কুড়ায়ে আনি—
এখনো তাহারে দলে নাই কেহ,
　　আমার সাধের কুসুমখানি।
এখনো, সজনি, একটি পাপড়ি
　　ঝরে নি তাহার জানি লো জানি।
শুধু হারায়েছে, খুঁজিয়া পাইলে
　　এখনি তাহারে কুড়ায়ে আনি।

ত্বরা কর্ তবে, ত্বরা কর্ তোরা,
হৃদয় খুঁজিতে যাই—
শুকাবার আগে ছিঁড়িবার আগে
হৃদয় আমার চাই !

[সখীদের প্রতি]

বিপাশাতীরের পথে, সখি, আয়
আয়, ত্বরা করে আয় !
জানিস্ কি, সখি, নদীতীরে কবি
কখন বেড়াতে যায় ?
জানিস্ ত, সখি, পথের ধারেতে
একটি অশোক আছে,
বনলতা কত ফুলে ফুলে ভরা
উঠিয়াছে সেই গাছে—
সেই খানে, সখি, সেই গাছতলে
বসিয়া থাকিতে হবে।
সেই পথ দিয়া যাইবে ত কবি ?
আয় ত্বরা করে তবে।
বল্ দিখি তোরা হল কি আমার !
যখন কবির সুমুখে থাকি
একটিও কথা পারি নে বলিতে,
পারি নে তুলিতে আনত আঁখি !
কতবার, সখি, করিয়াছি মনে
পরিহাস করি কহিব কথা—
নিদারুণ হাসি হাসিয়া হাসিয়া
হৃদয়ে হৃদয়ে দিব গো ব্যথা,
কৃষ্ণহীরা-সম কৃষ্ণ আঁখি-তারা
আঁধার-আগার হতে আলো-ধারা
হানিবে হেথায়, হানিবে হোথায়
আকুলিয়া দশ দিশ—

মূরছিয়া তার পড়িবেক মন,
মুদিয়া আসিবে অবশ নয়ন,
যতই ঢালিব এ অধর হতে
মিষ্ট সুধাময় বিষ !
কিন্তু কি করে সে চেয়ে থাকে, সখি,
না জানি নয়নে কি আছে জ্যোতি !
এমন সে গান গায় ধীরে ধীরে,
কথা কয়, সখি, মৃদুল অতি—
মুখেতে আমার কথা নাহি ফুটে,
চাহিতে পারি নে আঁখির পানে,
হাসির লহরী খেলে না অধরে,
নয়নে তড়িৎ নাহিক হানে !
আয় ত্বরা করে— বেলা হয়ে এল,
অস্তাচলে যায় রবি,
পথের ধারেতে বসি রব' মোরা
সেই পথে যাবে কবি !

দশম সর্গ

মুরলা

যার কোন রূপ নাই, যার কোন গুণ নাই,
তবুও যে হতভাগ্য ভালবাসে মনে,
দুই দিন বেঁচে থাকে, কেহ নাহি জানে তাকে,
ভালবাসে, দুঃখ সহে, মরে গো বিজনে।
ক্ষুদ্র তৃণফুল এক জন্মে অন্ধকারে,
দুই দণ্ড বেঁচে থাকে কীটের আগার—

শুকায়ে পড়ে সে নিজ কাঁটার মাঝারে,
নিজেরি কাঁটার মাঝে সমাধি তাহার।
কি কথা কোস্ রে তুই অকৃতজ্ঞ মন!
স্নেহময় দয়াময় কবি সে আমার,
এই তৃণফুলেরে কি করে নি যতন?
এরেও কি রাখে নাই হৃদয়ে তাহার?
ছেলেবেলা হতে মোরে রেখেছেন পাশে।
যখনি পূরিত মন নব গীতোচ্ছ্বাসে
আমারেই তাড়াতাড়ি শুনাতেন তিনি,
এত তাঁর ছিল সঙ্গী আছিল সঙ্গিনী!
এত যে পাইনু, তাঁরে কি পারিনু দিতে?
মুরলার যাহা কিছু ছিল— ভালবাসা—
ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা!
একটু পারি নি তাঁরে সান্ত্বনা করিতে,
মুছাই-নি এক বিন্দু নয়নের ধার—
যাহা কিছু সাধ্য ছিল করেছি আমার!
আমি যদি না হতেম বাল্যসখী তাঁর,
নলিনীবালারে যদি পেতেন সঙ্গিনী,
করিতে হত না তাঁরে এত হাহাকার—
কতই না সুখী আহা হতেন গো তিনি!
বিধাতা! বিধাতা! যদি তাই গো করিতে!
মুরলা জন্মিল কেন নলিনী থাকিতে!
এখনো কেন গো তার হয় না মরণ?
এ সংসারে মুরলারে কার প্রয়োজন?
ওই আসিছেন কবি!— এস কবি!— এস কবি!
একবার অতি কাছে এস মুরলার!
তুমি যবে কাছে থাক কবি গো আমার—
আপনারে ভুলে যাই— ওই মুখপানে চাই
তোমা ছাড়া কিছু মনে নাহি থাকে আর!
তুমি যবে দূরে থাক, কবি গো, তখন

আপনারি ক্ষুদ্র দুঃখে থাকি অচেতন!
বড় যে দুর্ব্বল দীন মুরলা তোমার!
যুঝিতে মনের সাথে পারে না সে আর!
থেকো না, থেকো না দূরে থেকো না গো প্রভু,
মুরলারে ত্যাগ করে যেও না গো কভু!
শ্রান্ত ক্লান্ত অতি দীন— বলহীন রক্তহীন
ধুলায় লুণ্ঠিত এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
তোমার মনের ছায়ে দেহ এরে স্থান!
আমারে লুকায়ে রাখ প্রসারিয়া পাখা,
তোমারি বুকের কাছে রব আমি ঢাকা!
নহিলে দুর্ব্বল এই দীন অসহায়
পথ হারাইয়া কোথা ভ্রমিয়া বেড়ায়?
তুমি, কবি, ছিলে নাকো— একেলা বিজনে
নিজ হাতে বসি হেথা দুঃখের কণ্টকলতা
রোপিতেছিলাম, কবি, আপনারি মনে।
তাই নিয়ে অনুক্ষণ যেন আদরের ধন
আত্মদাহী কল্পনায় খেলায়েছি কত,
যতনে ঢেলেছি তায় অশ্রুধারা শত,
এবে প্রতি মূল তার হৃদয়ের চারি ধার
দংশে শত বাহু মেলি বৃশ্চিকের মত!
তুমি, সখা, এস কাছে— মরিতেছি জ্বলি—
ও চরণ দিয়ে, কবি, ফেল সব দলি—
প্রতি শাখা— প্রতি পত্র— প্রতি মূল তার!
এস, কবি, বল দাও— এ হৃদয়ে বল দাও—
আর কভু বর্ষিব না অশ্রুবারিধার!

[কবির প্রবেশ]

কবি। সকাল হইতে, মুরলা সখি লো,
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে,
বড়ই অধীর-হরষে আমার
হৃদয় গিয়েছে ভরে।

পারি নে রাখিতে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আকুল ব্যাকুল করিতে প্রকাশ,
অধীর হইয়া সকাল হইতে
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে।
তোরে না কহিলে হৃদয়ের কথা
মন শান্তি নাহি মানে;
কেন, সখি, তুই ব'সে রয়েছিস্
একা একা এই খানে?
দেখ, সখি, আজ গিয়েছিনু আমি
প্রমোদকাননে তার,
গাছের ছায়াতে আপনার মনে
বসেছিনু একধার।—
মুরলা, হেথায় অন্ধকার ঘোর,
দেখিতে পাই নে মুখখানি তোর,
এত অন্ধকার ভাল নাহি লাগে,
ওই খানে যাই উঠে।
ওখানে পড়েছে রবির কিরণ,
সমুখে সরসী হাসিছে কেমন,
গাছের উপরে শাখা শাখা ভরে
বকুল রয়েছে ফুটে।
এই খানে আয়, এই খানে বোস্!
শোন্ সখি তার পরে—
গাছের তলায় ছিলাম বসিয়া
মগন ভাবনা-ভরে।
গীতস্বর শুনি চমকি উঠিনু,
শুনিনু মধুর বাঁশরী বাজে।
গীতের প্লাবনে আকাশ পাতাল
ডুবিয়া গেল গো নিমেষমাঝে।
আকাশব্যাপিনী জোছনায়, সখি,
মরমে মরমে পশিল গান!

পৃথিবী-ডুবান' জোছনায়ে, সখি,
ডুবায়ে দিল সে মধুর তান!
একটি একটি করি কথা তার
পশিতে লাগিল শ্রবণে যত,
শোণিত লাগিল উঠিতে পড়িতে,
হৃদয় হইল পাগল-মত।
একটি একটি একটি করিয়া
গাঁথিতে লাগিনু কথা,
গান গাওয়া তার ফুরাল' যখন
ফুরাল' আমার গাঁথা।
মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে
কি গান গাহিতেছিল মধুস্বরে
বিশ্ব করি বিমোহিত!
আমারি রচিত— আমারি রচিত—
আমারি রচিত গীত!
মুরলা, সখি লো, বল্ দেখি মোরে
কে গান গাহিতেছিল মধুস্বরে
উনমাদ করি মন!
আমারি নলিনী— আমারি নলিনী—
আমারি হৃদয়ধন।
সখি, মোর সেই মনের কথা,
সখি, মোর সেই গানের কথা,
দিয়াছে মাজিয়া তার স্বর দিয়া—
প্রতি কথা তার উঠে উজলিয়া
মেঘে রবিকর যথা।
শুনিবি কি গান গাহিতেছিল সে
অমৃতমধুর রবে?
শোন্ মন দিয়ে তবে।

গান

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার ?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল— গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর !
তোমার সৌন্দর্য্যভারে দুর্ব্বল হৃদয় হা রে
অভিভূত হয়ে যেন পড়েছে আমার !
এস তবে হৃদয়েতে, রেখেছি আসন পেতে—
ঘুচাও এ হৃদয়ের সকল আঁধার !
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার—
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা বালা, থাক' হৃদি করি আলা,
হৃদয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার !

একাদশ সর্গ

অনিল

অনিল। কিছুই ত হল না !
সেই সব— সেই সব— সেই হাহাকাররব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা !
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা-কিছু চাই !
ভাল ত গো বাসিলাম— ভালবাসা পাইলাম,
এখনো ত ভালবাসি— তবুও কি নাই !
তবুও কেন রে হৃদি শিশুর মতন
দিবানিশি নিরজনে করিছে রোদন !
মনোমত হয় নি বা যা কিছু পেয়েছে,
সকলেরি মাঝে বুঝি অভাব রয়েছে !

আশ মিটাইয়া বুঝি ভালবাসি নাই,
ভালবাসা পাই নি বা যতখানি চাই !
যেন গো যাহার তরে মন ব্যগ্র আছে
অশরীরী ছায়া তার দাঁড়াইয়া কাছে,
দুই বাহু বাড়াইয়া করি প্রাণপণ
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে করি আলিঙ্গন—
ছায়া শুধু— ছায়া শুধু— হৃদয় না পূরে—
তা চেয়ে রহে না কেন শত ক্রোশ দূরে ?
আমার এ উর্দ্ধশ্বাস পিপাসিত মন
নাহি অনুভবে তার হৃদয়স্পন্দন।
মন চায় হাতে তার রাখি মোর হাত
বুকে তার মাথা রাখি করি অশ্রুপাত !
সেই ত ধরিনু হাত বুকে মাথা রাখি,
দৃঢ় আলিঙ্গন তারে করি থাকি থাকি—
কিন্তু এ কি হল দায়, এ কিসের মায়া ?
কিছু না ছুঁইতে পাই, ছায়া সব ছায়া !
তাই ভাবি, মন মোর যা কিছু পেয়েছে
সকলেরি মাঝে বুঝি অভাব রয়েছে !
তৃষিত হৃদয় চায় ভালবাসা যত
ললিতা ফিরায়ে বুঝি দেয় নাকো তত !
আমি চাই এক সুরে দুই হৃদি বাজে,
আবরণ নাহি রয় দুজনার মাঝে !
সমুদ্র চাহিয়া থাকে আকাশের পানে,
আকাশ সমুদ্রে চায় অবাক্ নয়ানে,
তেমনি দোঁহার হৃদি হেরিবে দোঁহায়—
পড়িবে উভের ছায়া উভয়ের গায় !
কিন্তু কেন, ললিতার এত কেন লাজ !
এত কেন ব্যবধান দুজনার মাঝ ?
মিলিবার তরে যাই হইয়া অধীর,
মাঝেতে কেন রে হেন লৌহের প্রাচীর ?

আমি যাই তাড়াতাড়ি করিতে আদর,
তারে হেরে উল্লাসেতে নাচে গো অন্তর,
মিলিবারে অর্দ্ধপথে সে আসে না ছুটে—
তার মুখে একটিও কথা নাহি ফুটে !
জানি গো ললিতা মোরে ভালবাসে মনে,
যাতে আমি ভাল থাকি করে প্রাণপণে—
কিন্তু তাহে কিছুতেই তৃপ্ত নহে প্রাণ !
দুজনায় মাঝে কেন এত ব্যবধান ?
যেমন নিজের কাছে লাজ নাহি থাকে
তেমনিই মনে কেন করে না আমাকে ?
কিছুই গো হল না !
সেই সব, সেই সব— সেই হাহাকাররব
সেই অশ্রুবারিধারা হৃদয়বেদনা !

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। কেন গো বিষণ্ণ হেরি নাথের বদন ?
না জেনে কি দোষ কিছু করেছি এমন ?
একবার কাছে গিয়ে ধরি দুটি হাত
শুধাব কি— "হয়েছে কি ? অবোধ ললিতা সে কি
না বুঝে হৃদয়ে তব দিয়েছে আঘাত ?"
সেদিন ত শুধালেন নাথ যবে আসি
"একবার বল্ ত রে ভাল কি বাসিস মোরে ?"
মুক্তকণ্ঠে বলেছিনু "নাথ, ভালবাসি !"
একেবারে সব লজ্জা দিনু বিসর্জ্জন,
বুকে তাঁর মুখ রেখে করেছি রোদন—
কাঁদিয়ে কহেছি কথা, জানায়েছি সব ব্যথা
যত কথা রুদ্ধ ছিল মরমতলেতে,
এত দিন বলি বলি পারি নি বলিতে !
সেদিন ত কোন লজ্জা ছিল নাকো আর,
কিন্তু গো আবার কেন উদিল আবার !
হেথায় দাঁড়ায়ে আমি রহি এক ধারে—

এখনি দেখিতে নাথ পাবেন আমারে !
ডাকিলেই কাছে গিয়ে সব লজ্জা বিসর্জিয়ে
একেবারে পায়ে ধরে কেঁদে গিয়ে কব,
"বল, নাথ, কি করেছি ? কি হয়েছে তব ?"

অনিল। এমন বিষণ্ণ হয়ে বসে আছি হেথা
তবুও সে দূরে আছে— তবু সে এল না কাছে,
তবুও সে শুধালে না একটিও কথা !
পাষাণ বজ্রেতে গড়া এ লজ্জা তাহার
প্রেমবরিষার নদী ভাঙিতে নারিল যদি,
দয়াতেও ভাঙিবে না হেরি অশ্রুধার ?
লজ্জার একাধিপত্য যে নিষ্ঠুর মনে,
প্রেম দয়া যে হৃদয়ে বাস করে ভয়ে ভয়ে,
চরণে শৃঙ্খল বাঁধা লজ্জার শাসনে—
অনিল, কি করিবি রে লয়ে হেন মন ?
তুই চাস মুখে তোর হেরিলে বিষাদ ঘোর
অশ্রুজলে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ !
কত না আদরে তোর মুছাবে নয়ন !
তুই কি চাস রে হেন পাষাণমুরতি
দূরে দাঁড়াইয়া রবে— একটি কথা না কবে,
সান্ত্বনার তরে যবে তুই ব্যগ্র অতি ?
হায় রে অদৃষ্ট মোর, কিছুই হল না—
সেই সব, সেই সব— সেই হাহাকাররব
সেই অশ্রুবারিধারা হৃদয়বেদনা !

[অনিলের বেগে প্রস্থান

ললিতা। [স্বগত]

নয়নে আঁধার হেরি, ঘুরিছে সংসার,
মা গো মা— কোথায় মা গো— পারি নে মা আর !

[বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া]

গেলে তবে গেলে চলি নিষ্ঠুর— নিষ্ঠুর—
ললিতা যে এক ধারে দাঁড়ায়ে রয়েছে হা রে

একটু আদর-তরে হয়ে তৃষাতুর!
কখন্ ডাকিবে ব'লে আছে মুখ চেয়ে,
একটু ইঙ্গিতে পায়ে পড়িত গো ধেয়ে—
দেখেও, দেখেও তারে গেলে গো চলিয়া?
একবার ডাকিলে না ললিতা বলিয়া?
দোষ কি করেছি কিছু সখা গো আমার?
তার লাগি কেন না করিলে তিরস্কার?
একবার চাহিলে না,   ফিরেও গো দেখিলে না,
এমন কি অপরাধ পারি করিবারে?
তবে কেন, কেন, নাথ, বল নি আমারে?
যদি সখা, পায়ে ধ'রে   শত-শতবার ক'রে
শুধাই গো, বলিবে কি, কি দোষ করেছি?
অভাগিনী যদি, নাথ, যদি ম'রে যাই—
মরণশয্যায় শুয়ে শেষ ভিক্ষা চাই,
চরণদুখানি ধুয়ে শেষ অশ্রুজলে,
দুখিনী ললিতা তব কেঁদে কেঁদে বলে,
তবুও কি ফিরিবে না?   তবুও কি চাহিবে না?
তবুও কি বলিবে না কি দোষ করেছি!
তবুও কি, সখা, তুমি যাইবে চলিয়া?
একবার ডাকিবে না 'ললিতা' বলিয়া?

দ্বাদশ সর্গ

নলিনী বিজয় বিনোদ প্রমোদ অশোক সুরেশ নীরদ ও অনিল

সুরেশ।   যাইতে বলিছ বালা, কোথা যাব আর?
দিগ্বিদিক হারাইয়া   ও রূপ-অনলে গিয়া
এ পতঙ্গ পাখা দুটি পুড়ায়েছে তার!
রূপসী, ক্ষমতা আর নাই উড়িবার!

নলিনী। রূপ কিছু মোর না যদি থাকিত
বড় হইতাম সুখী,
দেখিতাম যত পতঙ্গ তোমরা
আসিতে কি লোভ দেখি!
রূপ— রূপ— রূপ— পোড়া রূপ ছাড়া
আর কিছু মোর নাই?
তোমাদের মত পতঙ্গের দল
চারি দিকে ঘিরে করে কোলাহল,
দিবস রজনী করে জ্বালাতন,
ঝাঁপায়ে পড়ে গো, না মানে বারণ—
পোড়া রূপ থেকে এই যদি হল
হেন রূপ নাহি চাই!
হেন কেহ নাই হায়
শুধু ভালবাসে নলিনীবালারে,
আর কিছু নাহি চায়!

[অশোকের প্রতি]

এই যে অশোক! ওই দেখ সখা—
দিবে কি আমারে দিবে কি তুলে
বক্ষ হতে মোর ফুল উড়ে গিয়ে
পড়েছে তোমার চরণমূলে!
যদি সখা ওটি রাখিতে চাও
তোমারি কাছেতে রাখিয়া দাও—
দুদণ্ডেই ওটি যাইবে শুকায়ে,
শুকায়ে গেলেই দিও গো ফেলে!
যতখন ওটি নাহি পড়ে ঝ'রে
ততখনো যদি মনে রাখ মোরে,
ততখনো যদি না থাক ভুলে,
তা হলেও, সখা, বড় ভাগ্য মানি
চিরকাল মনে সে কথা রবে!

যদি, সখা, নাহি লইতে চাও
এখনি ভূতলে ফেলিয়া দাও,
চরণে দলিয়া ফেল গো তবে!
কত শত হেন অভাগা কুসুম
আপনি পড়েছে চরণে আসি,
কত শত লোক চেয়েও দেখে নি,
চরণে দলিয়া গিয়াছে হাসি!
তবে আর কেন, ফেল গো দলিয়া—
কিসের সরম আমার কাছে?
যে কুসুম, সখা, শাখা হতে ঝ'রে
চরণের নীচে পড়ে সাধ ক'রে,
কে না জানে বল তাহার কপালে
চরণে দলিয়া মরণ আছে!

[নীরদের প্রতি]

এই যে নীরদ, এনেছ গাঁথিয়া
গোলাপ ফুলের হার!
ভুলে গেছ কেন বাছিয়া ফেলিতে
কাঁটাগুলি, সখা, তার?
তবে গো পরায়ে দাও—
নাহয় কাঁটায় ছিঁড়িবে হৃদয়,
নাহয় এ বুক হবে রক্তময়,
এনেছ গাঁথিয়া গোলাপ যখন
তবে গো পরায়ে দাও!
কতই না কাঁটা বিঁধিয়াছে হেথা
রাখিতে গোলাপ বুকের কাছে,
জলুক হৃদয়— বহুক শোণিত—
তা বলে গোলাপ ফেলিতে আছে?

[প্রমোদের প্রতি]

চাই নে তোমার ফুল-উপহার,
যাও— হেথা হতে যাও!
দুটি ফুল দিয়ে, ফুলবিনিময়ে
হাসি কিনিবারে চাও!
নলিনী, নলিনী, কেন রে হলি নি
পাষাণকঠিন-মন?
ছুটো কথা শুনে, ছুটো ফুল পেয়ে
ভাঙ্গে কেন তোর পণ?
পলকে পলকে ভাঙিস গড়িস—
ভেঙ্গে যায় মৃদু শ্বাসে,
যার 'পরে তুই করিস লো মান
সেই মনে মনে হাসে!
দেখি আজ তুই কেমন পারিস
থাকিবারে অভিমানে?
কহিস নে কথা, হাসিস নে হাসি,
চাহিস নে তার পানে!

বিনোদ। একটি কথাও কহিল না মোরে,
পাশ দিয়া গেল চলি!
গর্ব্বভারগুরু প্রতি পদক্ষেপে
মরমে মরমে দলি।
কেন গো, কেন গো; কি আমি করেছি—
কিছু ত না পড়ে মনে!
কহেছে ত কথা প্রমোদের সাথে,
অশোক নীরদ -সনে!
গেল যে হৃদয়— কত দিন আর
রবে সে এমন করি
কখনো উঠিয়া আকাশের 'পরে
কখনো পাতালে পড়ি!

অনিল। [দূর হইতে দেখিয়া]

না জানি কিসের জ্যোতি নয়নে আছে গো বালা!
যে দিকে চাহিয়া দেখ সে দিক করিছ আলা।
অন্ধকারভেদী এক হাসিময় তারা-সম
প্রাণের ভিতর-পানে চাহিয়া রয়েছ মম!
ফিরায়ে লইনু মুখ, তবুও কেন গো দেখি
চাহিছে হৃদয়-পানে দুটি হাসিমাখা আঁখি!
আঁখি মুদি, তবু কেন হেরি গো প্রাণের কাছে
দুটি আঁখি চেয়ে আছে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে!
হেথা না পাইবি ঠাঁই— দূর হ তুই রে তারা—
চন্দ্রমা জোছনা করি এ হৃদি রেখেছে ভরি,
তুই তারা সে আলোকে হইবি আপনাহারা!
দূর হ রে— দূর হ রে— দূর হ রে ক্ষুদ্র তারা!
কিন্তু কি মধুর মুখ ভাবভরে ঢলঢল!
কোমলকুসুমসম সমীরণে টলমল!
দেখি নি এহেন মুখ সুমধুর ভাবময়!
কেন? ললিতার মুখ এ হতে কি ভাল নয়?
আহা সে মধুর বড় ললিতার মুখখানি—
আঁখি কত কথা কয়, মুখেতে নাইক বাণী,
বাহির হইতে চায় তার সেই মৃদু হাসি—
অধরের চারি ধারে কতবার উঁকি মারে,
লজ্জায় মরিয়া যায় কেবল দুই পা আসি!
তার মুখ পূর্ণরাকা শরমের মেঘে ঢাকা,
মধুর মুখানি তার আমি বড় ভালবাসি!
ললিতার চেয়ে কি গো মুখখানি ভাল এর?
উভেরই মধুর মুখ— দুই ভাব দু-জনের—
ললিতা সে লাজময়ী মুখেতে নাইক কথা,
মাটি-পানে চেয়ে আছে যেন লজ্জাবতী লতা;
নলিনী, নলিনীসম কেমন রয়েছে ফুটি,
বরষার নদীজল করিতেছে টলমল

হেলি দুলি লহরীতে পড়িতেছে লুটি লুটি।
উভয়েরই মধুর মুখ ললিতার, নলিনীর—
অধীর সৌন্দর্য্য কারো, কারো বা প্রশান্ত স্থির!
কিন্তু নলিনীর মুখ ভাবের খেলার গেহ—
সেথা ভাবশিশুগুলি করিতেছে কোলাকুলি,
কেহ বা অধরে হাসে, নয়নে নাচিছে কেহ,
এই যে অধরে ছিল এই সে নয়নে গেছে,
দু-দণ্ড খেলায়ে কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!
কভু বা দু-তিন জনে নাচিতেছে এক সনে,
পলক পড়িতে চোখে আর ত তাহারা নাই—
নলিনীর মুখখানি ভাবের খেলার ঠাঁই!
নলিনীর মুখপানে যতই চাহিয়া থাকি
নূতন নূতন শোভা দেখিতে পায় যে আঁখি!
কিন্তু ললিতার মুখ কখনো এমন নয়।
এত সে কয় না কথা, এত ভাব নাই সেথা,
নহে গো এমনতর অধীরমাধুর্য্যময়!
নাই বা এমন হ'ল তাহাতে কি আছে হানি?
নাহয় দেখিতে ভাল নলিনীর মুখখানি!
তবু ললিতারে মোর ভাল আমি বাসি ত রে!
তবু ত সৌন্দর্য্য তার এ হৃদি রয়েছে ভ'রে!
রূপেতে কি যায় আসে? রূপ কেবা ভাল বাসে?
ললিতা নলিনী-কাছে নাহয় রূপেতে হারে—
ভালবাসি— ভালবাসি— তবু আমি ললিতারে!

[বিনোদের কাছে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া]

নলিনী। কেন হেন আহা মলিন আনন,
আঁখি নত মাটি-পানে!
তোমারে, বিনোদ, পাই নি দেখিতে
দাঁড়াইয়া এইখানে!
শিথিল হইয়া পড়েছে ঝুলিয়া

ফুলের বলয় মোর,
দাও-না গো, সখা, দাও না তুলিয়া,
বাঁধ গো আঁটিয়া ডোর!

নলিনীর গান

এস মন, এস, তোমাতে আমাতে
মিটাই বিবাদ যত!
আপনার হয়ে কেন মোরা দোঁহে
রহি গো পরের মত?
আমি যাই এক দিকে, মন মোর!
তুমি যাও আর দিকে—
যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন
তুমি চাও তার দিকে!
তার চেয়ে এস দুজনে মিলিয়ে
হাত ধরে যাই এক পথ দিয়ে,
আমারে ছাড়িয়ে অন্য কোনখানে
যেও না কখনো আর!
পারি না কি মোরা দুজনে থাকিতে,
দোঁহে হেসে খেলে কাল কাটাইতে?
তবে কেন তুই না শুনে বারণ
যাস্ রে পরের দ্বার?
তুমি আমি মোরা থাকিতে দুজন,
বল্ দেখি, হৃদি, কিবা প্রয়োজন
অন্য সহচরে আর?
এত কেন সাধ বল্ দেখি, মন,
পর-ঘরে যেতে যখন তখন—
সেথা কি রে তুই আদর পাস্?
বল্ ত কত-না সহিস যাতনা?
দিবানিশি কত সহিস লাঞ্ছনা?
তবু কি রে তোর মিটে নি আশ?

আয়, ফিরে আয়, মন, ফিরে আয়—
দোঁহে এক সাথে করিব বাস !
অনাদর আর হবে না সহিতে,
দিবস রজনী পাষাণ বহিতে,
মরমে দহিতে, মুখে না কহিতে,
ফেলিতে দুখের শ্বাস !
শুনিলি নে কথা ? আসিলি নে হেথা ?
ফিরিলি নে একবার ?
সখি লো, দুরন্ত হৃদয়ের সাথে
পেরে উঠি নে ত আর !
"নয় রে সুখের খেলা ভালবাসা !"
কত বুঝালেম তায়—
হেরিয়া চিকণ সোনার শিকল
খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল,
খেলাতে খেলাতে না জেনে না শুনে
জড়ায় নিজের পায় !
বাহিরিতে চায়, বাহিরিতে নারে,
করে শেষে হায়-হায় !
শিকল ছিঁড়িয়ে এসেছে ক'বার,
আবার কেন রে যায় ?
চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
না জানি কি সুখ পায় !
তিলেক রহে না আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি,
এমন দুরন্ত হৃদয় লইয়া,
সজনি, বল্‌ কি করি ?

—

অনিল। ওঠ্‌, হেথা হতে— চল্‌ চল্‌ যাই,
কি কারণে হেথা আছিস্‌ আর !

মুদিয়া আসিছে মনের নয়ন,
মনের চরণে পড়িছে ভার!
ললিতা আমার, না থাকুক্ রূপ,
নাই বা গাহিতে পারিলি গান,
ভালবাসি তোরে, ভালবাসিব রে
যত দিন দেহে রহিবে প্রাণ!

[নলিনী ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান]

নলিনী। পারি নে ত আর, বসি এই খানে,
ওই যে এ দিকে আসিছে কবি!
কথা আজ মোরে কহিতে হইবে,
র'ব না বসিয়া অচল ছবি!
কি কথা বলিব? ভাবিতেছি মনে,
কিছুই ত ভেবে নাহিক পাই!
বলিব কি তারে— "তোমরা কবি গো,
তোমাদের ভাল বাসিতে নাই!
বুঝিতে পার না আপনার মন,
দিবানিশি বৃথা কর গো শোক!
ভালবাসা-তরে আকুল হৃদয়,
ভালবাসিবার পাও না লোক!
মনে তোমাদের সৌন্দর্য্য জাগিছে
ধরায় তেমন পাও না খুঁজে,
তবুও ত ভাল বাসিতেই হবে
নহিলে কিছুতে মন না বুঝে।
অবশেষে কারে পাও দেখিবারে
নেশায় আপনা ভুলি,
সাজাইয়া দেয় কলপনা তারে
নিজের গহনা খুলি।
আসি কলপনা কুহকিনীবালা
নয়নে কি দেয় মায়া,

কলপনা তারে ঢেকে রাখে নিজে
দিয়ে নিজ-জ্যোতিছায়া।
কল্পনাকুহকে মায়া মুগ্ধ চোকে
কি দেখিতে দেখ কিবা,
অপরূপ সেই প্রতিমা তাহার
পূজ মনে নিশি দিবা!
যত যায় দিন, যত যায় দিন,
যত পাও তারে পাশে,
দেবীর জ্যোতি সে হারায় তাহার
মানুষ হইয়া আসে!
ভালবাসা যত দূরে চলি যায়
হাহাকার কর মনে,
কলপনা কাঁদে ব্যথিত হইয়া
আপনার প্রতারণে!
আমি গো অবলা— কবির প্রণয়
অত নাহি করি আশা,
আমি চাই নিজ মনের মানুষ
সাদাসিদে ভালবাসা!"
এমনি করিয়ে বাতাসের 'পরে
মিছে অভিমান বাঁধি
অকারণে তার করিব লাঞ্ছনা
অভিমানে কাঁদি কাঁদি।
কিছুতে সান্ত্বনা না আমি মানিব,
দূরেতে যাইব চলে—
কাছেতে আসিতে করিব বারণ
করুণ চোখের জলে!

ত্রয়োদশ সর্গ

অনিল ও ললিতা

ললিতা। ভেঙেছে ভেঙেছে যত লজ্জা ললিতার।
মুক্তকণ্ঠে শুধাইছে, সখা, বার বার—
কি করিব বল দেখি তোমার লাগিয়া?
কি করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া?
এই পেতে দিনু বুক— রাখ, সখা, রাখ মুখ—
ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিব জাগিয়া!
খুলে বল, বল সখা, কি দুঃখ তোমার!
অশ্রুজলে মিশাইব অশ্রুজলধার।
একদিন বলেছিলে মোর ভালবাসা
পেলেই পূরিবে তব প্রণয়পিপাসা!
বলেছিলে সব তব করিছে নির্ভর
পৃথিবীর সুখ দুঃখ আমারি উপর।
কই সখা? প্রাণ মন করেছি ত সমর্পণ,
দিয়েছি ত যাহা কিছু ছিল আপনার—
তবু কেন শুকাল না অশ্রুবারিধার?

অনিল। ললিতা রে, ললিতা রে, আমার কিসের দুখ
হৃদয়ে জাগিছে যবে ওই তোর মধুমুখ!
জীবননিশীথ মোর ও রবিকিরণে তোর
একেবারে মিশায়েছি আপনারে পাশরিয়া—
মাঝে মাঝে হৃদাকাশে যদিও বা মেঘ আসে,
ভিতরে তবুও হাসে সে রবিকিরণ প্রিয়া!
ওই স্মিত আঁখি দুটি হৃদয়ে রহিয়া ফুটি
রেখেছে ফুল ফুটায়ে প্রাণের বিজন বনে!
তব প্রেমসুধাধারা ঝরিয়া নির্ঝর-পারা
তুলেছে হরিত করি এই মরুভূমি-মনে।
তব হাসি জ্যোৎস্না-সম এ মুগ্ধ নয়নে মম

সারা জগতের মুখে ফুটায়ে রেখেছে হাসি।
তুমি সদা আছ কাছে তাই দিবালোক আছে,
নহিলে জগতে মোর কাঁদিত আঁধাররাশি।
আয় সখি, বুকে আয়, উলসি উঠেছে প্রাণ—
ত্বরা ক'রে যা লো বালা, বাঁশি আন্, বীণা আন্!
আজি এ মধুর সাঁঝে রাখি এ বুকের মাঝে
মধুর মুখানি তোর, ধীরে ধীরে কব্ গান।

ললিতা। না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন!
যবে অশ্রুজল হায় উচ্ছ্বসি উঠিতে চায়,
রুধিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ।
চিনি সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি,
ওর চেয়ে কত ভাল অশ্রুজলরাশি।
মাথা খাও, অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা!
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
ভাল যদি বাস তবে রাখ এ প্রার্থনা!

চতুর্দ্দশ সর্গ

মুরলা ও কবি

কবি। কত দিন দেখিয়াছি তোরে, লো মুরলে,
একেলা কাঁদিতেছিস বসিয়া বিরলে।
করতলে রাখি মুখ— কি জানি কিসের দুখ—
বড় বড় আঁখিদুটি মগ্ন অশ্রুজলে!
বড়, সখি, ব্যথা লাগে হেরি তোর মুখ!
এমন করুণ আহা! ফেটে যায় বুক।

ভাল কি বাসিস কারে ? কত দিন বল্
পোষণ করিবি হৃদে হৃদয়-অনল ?
যত তোর কথা আছে বলিস আমার কাছে,
এত স্নেহ কোথা পাবি— এত অশ্রুজল ?

মুরলা। কারে বা ভাল বাসিব কবি গো আমার ?
ভালবাসা সাজে কি গো এই মুরলার ?
সখা, এত আমি দীন, এতই গো গুণহীন,
ভালবাসিতে যে, কবি, মরি গো লজ্জায়।
যদি ভুলি আপনারে, যদি ভালবাসি কারে,
সে জন ফিরেও কভু দেখে কি আমায় ?
যদি বা সে দয়া ক'রে আদর করে গো মোরে,
সঙ্কোচেতে দিবানিশি রহি না কি তবু ?
তাই, কবি, বলি তাই — ভাল যে বাসিতে নাই,
ভালবাসা মুরলারে সাজে কি গো কভু ?
দূর হোক— মুরলার কথা দূর হোক —
মুরলার দুখজ্বালা মুরলার র'ক—
বল, কবি, গেছিলে কি নলিনীর কাছে ?
নলিনীর কথা কিছু বলিবার আছে ?

কবি। সখি লো, বড়ই মনে পাইয়াছি ব্যথা !
কাল আমি সন্ধ্যাকালে গিয়েছিনু সেথা—
পথপার্শ্বে সেই বনে নীরবে আপনমনে
দেখিতেছিলাম একা বসি কতক্ষণ
সন্ধ্যার কপোল হতে সুধীরে কেমন
মিলায়ে আসিতেছিল সরমের রাগ—
একটি উঠেছে তারা, বিপাশা হরষে হারা
ছায়া বুকে লয়ে কত করিছে সোহাগ !
কতক্ষণ পথ চেয়ে রয়েছি বসিয়া—
এমন সময়ে হেরি সখীদের সঙ্গে করি
আসিছে নলিনীবালা হাসিয়া হাসিয়া !
নাচিয়া উঠিল মন হরষে উল্লাসে,

রহিনু অধীর হয়ে মিলনের আশে।
কিন্তু নলিনীর কেন চরণ উঠে না যেন,
দুই পা চলিয়া যেন পারে না চলিতে!
কেহ যেন তার তরে বসে নাই আশা ক'রে,
সে যেন কাহারো সাথে আসে নি মিলিতে!
কোন কাজ নাই তাই এসেছে খেলিতে!
যেতে যেতে পথমাঝে যদি হেরে ফুল
করতালি দিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি যায় ছুটে—
আনে তুলে, পরে চুলে, হেসেই আকুল!
কভু হেরি প্রজাপতি কৌতুহলে ব্যগ্র অতি
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া যায় তার কাছে।
কভু কহে, "চল্ সখি, সেই চাঁপা গাছে
আজিকে সকাল বেলা কুঁড়ি দেখেছিনু মেলা,
এতক্ষণে বুঝি তারা উঠিয়াছে ফুটে,
চল্, সখি, একবার দেখে আসি ছুটে!"
কত-না বিলম্ব পথে করিল এমন,
বড়ই অধীর হয়ে উঠিল গো মন।
কতক্ষণ পরে শেষে গান গেয়ে হেসে হেসে
যেথা আমি বসেছিনু আসিল সেথায়—
চলিয়া গেল সে, যেন দেখে নি আমায়!
একেলা বসিয়া আমি রহিনু আঁধারে
সমস্ত রজনী, সখি, সেই পথধারে।
কেন, সখি, এত হাসি, এত কেন গান?
কিসের উল্লাসে এত পূর্ণ ছিল প্রাণ?
মন এক দলিবার আছে গো ক্ষমতা,
যখন তখন খুসী দিতে পারে ব্যথা,
তাই গর্ব্বে কোন দিকে ফিরেও না চায়?
তাই এত হাসে হাসি, এত গান গায়?
কৃপাণ যে হাসি হাসে ঝলসি নয়ন,
বিদ্যুৎ যে হাসি হাসে অশনিক্ষেপণ!

অথবা হয়ত, সখি, আমারিই ভুল ;
হয়ত সে মনে মনে কল্পনায় অকারণে
প্রণয়ে সন্দেহ ক'রে হয়েছে আকুল !
অভিমানে জানাইতে চায় মোর কাছে—
রাখে না আমার আশা, নাই কিছু ভালবাসা,
ভাল না বেসেও মোরে বড় সুখে আছে !
যখন গাহিতেছিল মরমে দহিতেছিল—
হাসি সে মুখের হাসি আর কিছু নয়,
গোপনে কাঁদিতেছিল অশান্ত হৃদয় !
আজ আমি তার কাছে যাই একবার—
শুধাই, অমন ক'রে কেন সে নিঠুরা মোরে
দিয়াছে বেদনা দলি হৃদয় আমার ?

[কবির প্রস্থান

মুরলা। আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে নিস্তব্ধ গভীর—
তারা নাহি দেখা যায় কুয়াশা-ভিতরে,
একটি একটি করে পড়িছে শিশির
মুরলার মাথার শুকানো ফুল-'পরে !
জীর্ণ শাখা শীতবায়ে উঠে শিহরিয়া,
গাছের শুকানো পাতা পড়িছে ঝরিয়া !
ওঠ্ লো মুরলা, ওঠ্, দিন হল শেষ,
পর্ লো মুরলা, পর্ সন্ন্যাসিনীবেশ।
মুরলা ? মুরলা কোথা ? গেছে সে মরিয়া—
সেই যে দুখিনী ছিল বিষণ্ণ মলিন,
সেই যে ভাল বাসিত হৃদয় ভরিয়া,
সেই যে কাঁদিত বনে আসি প্রতিদিন,
সে বালা মরিয়া গেছে, কোথায় সে আর ?
ছিন্ন বস্ত্র, ম্লান মুখ, লয়ে দুঃখভার,
তাহার সে বুকের লুকানো কথা লয়ে
মরেছে সে বালা আজ সন্ধ্যার উদয়ে !
তবে এ কাহারে হেরি নিশীথে শ্মশানে ?

ও একটি উদাসিনী সন্ন্যাসিনী যায়—
কারেও বাসে না ভাল, কারেও না জানে,
আপনার মনে শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়!
একটি ঘটনা ওর ঘটে নি জীবনে,
একটি পড়ে নি রেখা ওর শূন্য মনে!
পথ ছাড়, পান্থ, কিবা শুধাইছ আর?
জীবনে কাহিনী কিছু নাই বলিবার!
মুরলা, সত্যই তবে হলি সন্ন্যাসিনী?
সত্যই ত্যজিলি তোর যত কিছু আশা?
তবে রে বিলম্ব কেন, বসিয়া আছিস হেন?
এখনো কি— এখনো কি সব ফুরায় নি?
এখনো কি মনে মনে চাস ভালবাসা?
বড় মনে সাধ ছিল রহিব হেথায়—
কষ্ট পাই, দুঃখ পাই, রব তাঁরি সাথ—
আজন্ম কালের তাঁর সহচরী হায়
আমরণ বেড়াইব ধরি তাঁরি হাত!
কিছুতে নারিনু অশ্রু করিতে দমন,
কিছুতে এল না হাসি বিষণ্ণ বদনে,
সদাই এড়াতে হ'ত কবির নয়ন,
কাঁদিতে আসিতে হ'ত এ আঁধার বনে!
আজিকে সুখের দিন কবির আমার,
হৃদয়ে তিলেক নাই বিষাদ-আঁধার,
নূতন প্রণয়ে মগ্ন তাঁহার হৃদয়
বিশ্বচরাচর হেরে হাস্যসুধাময়!
এখন, মুরলা আমি, কেন রহি আর?
যেখানেই যান কবি হর্ষে হাসি হাসি
সেথাই দেখিতে পান এ মুখ আমার—
বিষাদের প্রতিমূর্তি অন্ধকাররাশি!
ওঠ্ লো মুরলা তবে— দিন হ'ল শেষ!
পর্ লো মুরলা তবে সন্ন্যাসিনীবেশ!

বেড়াইবি তীর্থে তীর্থে, ত্যজিবি সংসার—
ভুলে যাবি যত কিছু আছে আপনার!
কত শত দিন কত বর্ষ যাবে চলি—
তখন কপালে তোর পড়েছে ত্রিবলী,
নয়ন হইয়া তোর গেছে জ্যোতিহীন,
কত কত বর্ষ গেছে, গেছে কত দিন—
এই গ্রামে ফিরিয়া আসিবি একবার,
যাইবি মাগিতে ভিক্ষা কবির দুয়ার,
দেখিবি আছেন সুখে নলিনীরে লয়ে
দুইজনে একমন একপ্রাণ হয়ে!
কত-না শুনাইছেন কবিতা তাহারে!
কত-না সাজাইছেন কুসুমের হারে!
মোরে হেরে কবি মোর অবাক্ নয়নে
মোর মুখপানে চেয়ে রহিবেন কত,
মনে পড়ি পড়ি করি পড়িবে না মনে
নিশীথের ভুলে-যাওয়া স্বপনের মত!
কতক্ষণ মুখপানে চেয়ে থেকে থেকে
সবিস্ময়ে নলিনীরে কহিবেন ডেকে,
"যেন হেন মুখ আমি দেখেছিনু প্রিয়া!
কিছুতেই মনে তবু পড়িছে না আর!"
অমনি নলিনীবালা উঠিবে হাসিয়া—
কহিবে, "কল্পনা, কবি, কল্পনা তোমার!"
শুনিয়া হাসিবে কবি, ফিরাবে নয়ন,
নলিনীর পাখীটিরে করিবে আদর—
আমিও সেখান হতে করিব গমন
ভ্রমিয়া বেড়াতে পুনঃ দূর দেশান্তর!
ওঠ্ লো মুরলা তবে— দিন হ'ল শেষ
পর্ লো মুরলা তবে সন্ন্যাসিনীবেশ!
থাক্ থাক্, আজ থাক্, আজ থাক্ আর!
কবিরে দেখিতে হবে আরেকটি বার!

কাল হব সন্ন্যাসিনী, বরিব বিরাগে—
দেখিব আরেক বার যাইবার আগে।

পঞ্চদশ সর্গ

কবি ও মুরলা

মুরলা। কবি গো আমার, যদি আমি ম'রে যাই
তা হ'লে কি বড় কষ্ট হয় গো তোমার ?
কবি। ওকি কথা মুরলা লো, বলিতে যে নাই !
তুই ছেলেবেলাকার সঙ্গিনী আমার !
কাঁদিস্ না, কাঁদিস্ না, মোছ্ অশ্রুধার !
আহা, সখি, বড় সুখী হই আমি মনে
যদি দেখি প্রেমে তুই পড়েছিস্ কার,
সুখেতে আছিস্ তোরা মিলি দুইজনে !
নিরাশ্রয় মনে আসে কত কি ভাবনা,
কিছুতে অধীর হৃদি মানে না সান্ত্বনা—
সজনি, অমন সব ভাবনা-আঁধার
ভাবিস্ নে কখনো লো, ভাবিস্ নে আর !
মুরলা। কবি গো, রজনীগন্ধা ফুটেছিল গাছে—
তুমি ভালবাস ব'লে আপনি এনেছি তুলে,
নেবে কি এ ফুলগুলি, রাখিবে কি কাছে ?
কবি। সখি লো, নলিনী কাল দুটি চাঁপা তুলে
পরায়ে দেছিল মোর দুই কর্ণমূলে,
পরশিতে দলগুলি পড়িছে ঝরিয়া,
এখনো সুবাস তার যায় নি মরিয়া !

মুরলা। দেখি সখা, একবার দেখি হাতখানি—
এ হাত কাহারে, কবি, করিবে অর্পণ ?
কত ভাল তোমারে সে বাসিবে না জানি !
না জানি, তোমারে কত করিবে যতন !
কিসে তুমি রবে সুখী সকলি সে জানিবে কি ?
দেখিবে কি প্রতি ক্ষুদ্র অভাব তোমার ?
তোমার ও মুখ দেখি অমনি সে বুঝিবে কি
কখন পড়েছে হৃদে একটু আঁধার !
অমনি কি কাছে গিয়ে কত-না সান্ত্বনা দিয়ে
দূর করি দিবে সব বিষাদ তোমার ?
তাই যেন হয়, কবি, আর কিবা চাই—
তা হ'লেই সুখী হব রহি না যেথাই।

কবি। মুরলা, সখি লো,
কেন আজ মন মোর উঠিছে কাঁদিয়া ?
বিষাদ ভুজঙ্গসম কেন রে হৃদয় মম
দলিতেছে চারি দিকে বাঁধিয়া বাঁধিয়া ?
ছেলেবেলা হতে যেন কিছুই হল না,
যত দিন বেঁচে রব কিছুই হবে না,
এমনি করেই যেন কাটিবেক দিন,
কাঁদিয়া বেড়াতে হবে সুখশান্তিহীন !
কেহ যেন নাই মোর, রবে নাকো কেহ—
ধরায় নাইক যেন বিশ্রামের গেহ।
কিছু হারাই নি তবু খুঁজিয়া বেড়াই,
কিছুই চাই না তবু কি যেন কি চাই !
কোন আশা না করিয়া নৈরাশ্যেতে দহি,
কোন কষ্ট না পাইয়া তবু কষ্ট সহি !
কেন রে এমন কেন হল আজ মন ?
দিয়েছি ত, পেয়েছি ত ভালবাসা-ধন !
তুই কাছে আয় দেখি, আয় একবার,
মুখ তোর রাখ্ দেখি বুকেতে আমার !

দেখি তাহে এ হৃদয় শান্তি পায় যদি!
কে জানে উচ্ছ্বসি কেন উঠিতেছে হৃদি!
দেখি তোর মুখখানি সখি, তোর মুখখানি—
বুকে তোর মুখ চাপি— কেন, সখি, কেন
সহসা উচ্ছ্বসি কাঁদি উঠিলি রে হেন?
যেন বহুক্ষণ হতে যুঝিয়া যুঝিয়া
আর পারিল না, হৃদি গেল গো ভাঙিয়া!
কি হয়েছে বল্ মোরে, বল্, সখি, বল্—
লুকাস্ নে, লুকাস্ নে দুখ-অশ্রুজল!
পৃথিবীতে কেহ যদি নাহি থাকে তোর
এই হেথা এই আছে এই বক্ষ মোর!
এ আশ্রয় চিরকাল রহিবে তোমার,
এ আশ্রয় কখনোই হারাবি নে আর!
কাঁদিবি যখন চাস্ হেথা মুখ ঢাকি,
তোর সাথে বরষিবে অশ্রু মোর আঁখি!

মুরলা। তুমি সুখী হও, কবি, এই আমি চাই—
তুমি সুখী হলে মোর কোন দুঃখ নাই!

কবি। আমি সুখী নই সখি, সুখী কেবা আর?
বল্ দেখি মুরলা লো কি দুঃখ আমার!
অমন নলিনী মোর হৃদয়ের ধন
সে আমার— সে আমার আছে গো যখন,
পেয়েছি যখন আমি তার ভালবাসা,
তখন আমার আর কিসের বা আশা?
পেয়েছি যখন আমি তোর মত সখী—
দুখে মোর দুখ পায়, সুখে মোর সুখী—
তবে বল্ দেখি, সখি, কি দুঃখ আমার?
তবে যে উঠেছে মনে বিষাদ-আঁধার
শরতের মেঘসম দু-দণ্ডে মিলাবে,
কোথা হতে আসিয়াছে কোথায় বা যাবে!
এখনি নলিনী-কাছে যাই একবার,

এখনি ঘুচিবে এই বিষাদের ভার !
মুরলা সখি লো, তুই থাকিস্ হেথাই,
ফিরে এসে পুনঃ যেন দেখিবারে পাই ! [কবির প্রস্থান

মুরলা। ফিরে এসে মুরলারে পাবে না দেখিতে !
কবি মোর, আরেকটু যদি গো থাকিতে !
নলিনী ত চিরজন্ম রহিবে তোমার,
আমি যে ও মুখ কভু হেরিব না আর !
ও মুখ কি আর কভু পাব না দেখিতে
যত দিন হবে মোরে বাঁচিয়া থাকিতে ?
পল যাবে, দণ্ড যাবে, দিন যাবে, মাস যাবে,
বর্ষ বর্ষ করি যাবে জীবন আমার—
ও মুখ দেখিতে তবু পাব নাকো আর ?
মুরলা, পারিবি তুই ? পারিবি থাকিতে ?
দারুণ পাষাণে মন বাঁধিয়া রাখিতে ?
না, না, না, মুরলা তুই যাইবি কোথায় ?
অসীম সংসারে তোর কে আছে রে হায় ?
হবে যা অদৃষ্টে আছে, থাকিস কবির কাছে—
কবি তোর সুখ শান্তি হৃদয়ের ধন,
থাকিস জড়ায়ে ধরি কবির চরণ,
কবির চরণে শেষে ত্যজিস জীবন !
কিন্তু স্বার্থপর তুই কি করিয়া র'বি ?
বিষণ্ণ ও মুখ তোর নিরখিয়া কবি
এখনো কাঁদেন যদি, এখনো তাঁহার হৃদি
পুরানো বিষাদ যদি করে গো স্মরণ ?
সেই ছেলেবেলাকার বিষাদযন্ত্রণাভার
আমি যদি তাঁর মনে জাগাইয়া রাখি—
তবে, রে হতভাগিনী, কি বলিয়া থাকি !
তবে আমি যাই, তবে যাই, তবে যাই—
কেহ মোর ছিল নাকো, কেহ মোর নাই !
মুরলা বলিয়া কেহ আছে কি ভুবনে ?

মুরলা বলিয়া যারে ভাবিতেছি মনে
সে একটি নিশীথের স্বপ্ন মোহময়,
দেখিব স্বপন ভাঙ্গি মুরলা সে নয়!
নাই তার সুখ দুখ, নাই ভালবাসা,
নাই কবি— নাই কেহ— নাই কোন আশা!
কেহই সে নয়, আর কেহ তার নাই,
তবে কি ভাবনা আর— যেথা ইচ্ছা যাই!
কিন্তু কবি মোর, আহা ভালবাসাময়,
আমারে না দেখে যদি তাঁর কষ্ট হয়?
থাম্ থাম্, মুরলা রে, কেন মিছে বারে বারে
মনেরে প্রবোধ দিস ও কথা বলিয়া!
শুনিলে জগৎ যে রে উঠিবে হাসিয়া!
চল্ তুই, চল্ তুই— যেথা ইচ্ছা চল্ তুই,
কেহ নাই তোর লাগি কাঁদিবার তরে!
তবে চলিলাম, কবি, দূর দেশান্তরে!
অন্তর্যামী দেবতা গো, শুন একবার,
যদি আমি ভালবাসি কবিরে আমার
কবি যেন সুখী হয়, নলিনী সে সুখে রয়—
সখারে আমার আমি ভালবাসি যত
নলিনীবালাও যেন ভালবাসে তত!
নলিনীবালার যত আছে দুখজালা
সব যেন মোর হয়, সুখে থাক্ বালা!
তবে চলিলাম কবি, আ।ম চলিলাম—
মুরলা করিছে এই বিদায়প্রণাম!

ষোড়শ সর্গ

ললিতা

কে জানে নাথের কেন হ'ল গো এমন ?
জানি না কি ভাবিবারে যান বিপাশার ধারে,
ললিতার চেয়ে ভাল বাসেন বিজন !
কভুবা আছেন যবে বিরলে বসিয়া
আমি যদি যাই কাছে হাসিয়া হাসিয়া
বিরক্তিতে ভুরু কেন আকুঞ্চিয়া উঠে যেন,
বিরক্তি জাগিয়া উঠে অধরখানিতে,
আপনি যেন গো তাহা নারেন জানিতে !
সহসা চমকি উঠি কি যেন হয়েছে ত্রুটি
আমারে কাছেতে এনে ডাকিয়া বসান,
কি কথা ভাবিতেছেন বুঝাইতে চান,
না পারেন বুঝাইতে— সরমে আকুল চিতে
কি কথা বলিতে হবে ভাবিয়া না পান !
কেন ত্যজি ললিতারে এলেন বিপাশাপারে
শতেক সহস্র তার কারণ দেখান,
তা লাগি করেছি যেন কত অভিমান !
আপনি বলেন আসি "ভালবাসি ভালবাসি",
সন্দেহ করেছি যেন প্রণয়ে তাঁহার,
তা লাগি করেছি যেন কত তিরস্কার !
সহসা কাননে এলে আমারে দেখিতে পেলে
লুকাইয়া দ্রুত পদে পালান চকিতে
মনে ভাবি' আমি তাঁরে পাই নি দেখিতে !
কি করি ! কি হবে মোর ! বড় হয় ভয় !
লজ্জা ক'রে ললিতা রে হারালি প্রণয় !
লজ্জা কই, ললিতার লজ্জা কোথা আজ ?
ভেঙেছেও ললিতা সে ভেঙেছে ত লাজ !

[ক্রুদ্ধ হইয়া]

ধিক্ রে ! এই কি লজ্জা ভাঙিবার কাল ?
ভেঙেছে শরম যবে ভেঙেছে কপাল !
আর কিছু দিন আগে ঘোচে নাই ভ্রম ?
আর কিছু দিন আগে ভাঙে নি শরম ?
কাঁদিতে বসিলি আজ শিশুটির মত ?
কিছু দিন আগে কেন ভাবিলি নে এত ?
মিছা কি মনেরে তুই দিস রে প্রবোধ ?
দেখি নি তো' হতে আর অধম অবোধ !
তুই যদি কষ্ট পাস দোষ দিব কার ?
তোর মত অবোধের কষ্ট পুরস্কার !
যত কষ্ট আছে তুই সব কর্ ভোগ—
অশ্রুজলে তোর দিন অবসান হোক !
নিজের চরণ দিয়া নিজহৃদি বিদলিয়া
হৃদয়ের রক্তবিন্দু গোন্ দিন রাত !
হারায়ে সর্ব্বস্ব ধন কর্ অশ্রুপাত !
আগে কেন বুঝিলি নে, আগে কেন ভাবিলি নে,
কিছু দিন আগে লজ্জা নারিলি ভাঙিতে !
মিছা হৃদয়েরে আজ চাস প্রবোধিতে !
যেমন করিলি কাজ ফল ভোগ কর্ আজ,
পর হোক যেই জন ছিল আপনার—
তুই যদি কষ্ট পাস দোষ দিব কার ?

সপ্তদশ সর্গ

মুরলা। প্রান্তরে

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে—
তারি তরে উঠে রবি শশী তারা,
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাইক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
একটি যাহার নাই সখা সখী
কেহই তাহার নহেক পর!
আর কি সে চায়? রয়েছে যখন
আপনি সে আপনার,
কিসের ভাবনা তার?
কিন্তু যে জনের প্রাণের মনের
একজন শুধু আছে,
রবি শশী তার সেই এক জন,
সেই তার প্রাণ, সেই তার মন,
সেই সে জগৎ তাহার কাছে—
জগৎ সেজন-ময়,
আর কেহ কেহ নয়!
পৃথিবীর লোক সেই এক জন—
যদি সে হারায় তাকে
আর তার তরে রবি নাহি উঠে,
আর তার তরে ফুল নাহি ফুটে,
কিছু তার নাহি থাকে!
বহিছে তটিনী, বহিছে তটিনী,
তটিনী বহিছে না—

গাহিছে বিহগ, গাহিছে বিহগ,
বিহগ গাহিছে না।
সমস্ত জগৎ গেছে ধ্বংস হয়ে,
নিভেছে তপন শশী—
সারা জগতের শ্মশানমাঝারে
সে শুধু একেলা বসি!
কি একটি বালু-কণার উপরে
তাহার সমস্ত জগৎ ছিল!
নিশ্বাস লাগিতে খসিল বালুকা,
নিমেষে জগৎ মিশায়ে গেল!
হা রে হা অবোধ, জীবন লইয়া
হেন ছেলেখেলা করিতে আছে।
ক্ষণস্থায়ী ওই তিলেকের 'পরে
সমস্ত জগৎ গড়িতে আছে!
মুহূর্ত্তকালের ক্ষীণমুষ্টিমাঝে
তোর চিরকাল রাখিতে আছে!
রাখ্‌ রে ছড়ায়ে হৃদয়টি তোর
সমস্তজগৎময়!
জগৎসাগরে বিম্ব যত আছে
কেহই কাহারো নয়!
সে বিম্বের 'পরে রাখিস্‌ নে তুই
কোন আশা মন মোর!
সহসা দেখিবি বিম্বটির সাথে
ভেঙেছে সর্ব্বস্ব তোর।
ওরে মন, তোর অগাধ বাসনা
সমস্ত জগৎ করুক্‌ গ্রাস!
সমস্ত জগৎ ঘেরিয়া রাখ্‌ রে,
হৃদয় রে, তোর সুখের আশ।
সন্ন্যাসিনী তুই, কাঁদিস রে কেন?
কেন রে ফেলিস দুখের শ্বাস?

গেছে ভেঙে তোর একটি জগৎ,
আরেক জগতে করিবি বাস।
সে জগৎ তোর তরে হয় নি রে,
অদৃষ্টের ভুলে গেছিলি সেথা—
সেথায় আলয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কতই না তুই পাইলি ব্যথা!
তোর নিজদেশে এসেছিস এবে,
কেহ নাই তোরে কহিতে কথা—
আদর কাহারো পাস নে কখনো,
আদর কাহারো চাস নে হেথা।
এখনো ত এই নূতন জীবনে
সুখ দুখ কিছু ঘটে নি তোর—
দিবসের পরে আসিছে দিবস,
রজনীর পরে রজনী ভোর!
দিবস রজনী নীরব চরণে
যেমন যেতেছে তেমনি যাক—
কাঁদিস নে তুই, হাসিস নে তুই
যেমন আছিস তেমনি থাক্!
সে জগতে ছিল কাহারো বা দুখ
কারো বা সুখের রাশি,
এ জগতে যত নিবাসী জনের
নাহিক রোদন হাসি—
সকলেই চায় সকলের মুখে,
শুধায় না কেহ কথা—
নাইক আলয়, চলেছে সকলে
মন যায় যায় যেথা!

অষ্টাদশ সর্গ

ললিতা

আদর করিয়া কেন না পাই আদর ?
লজ্জা নাই কিছু নাই, না ডাকিতে কাছে যাই—
সঙ্কোচে চরণ যেন করে থর থর—
ধীরে ধীরে এক পাশে বসি পদতলে !
বড় মনে সাধ যায় মুখখানি তুলে চায়,
বারেক হাসিয়া কাছে বসিবারে বলে !
বড় সাধ কাছে গিয়ে মুখখানি তুলে নিয়ে
চাপিয়া ধরি গো এই বুকের মাঝার,
মুখপানে চেয়ে চেয়ে কাঁদি একবার !
সে কেন বারেক চেয়ে কথাও না কয়,
পাষাণে গঠিত যেন, স্থির হয়ে রয় !
যেন রে ললিতা তার কেহ নয়— কেহ নয়—
দাসীর দাসীও নয়, পথের পথিকো নয় !
যেন একেবারে কেহ— কেহ নাই কাছে,
ভাবনা লইয়া তার একেলা সে আছে !
কি যেন দেখিছে ছবি আকাশের পটে,
মুহূর্ত্তের তরে যেন মনে মনে ভাবে হেন—
"ললিতা এসেছে বুঝি, বসেছে নিকটে,
সে এমন মাঝে মাঝে এসে থাকে বটে !"
মাঝে মাঝে আসে বটে, পারে না যে নাথ—
সখা গো, নিতান্ত তাই কথাটি শুধাতে নাই ?
বারেক করিতে নাই স্নেহনেত্রপাত ?
নিতান্তই পদতলে পড়ে থাকে বটে !
সখা, তাই কি গো তারে তুলিয়া উঠাবে না রে,
বারেক রাখিবে নাকি বুকের নিকটে !
লতা আজ লুটাইয়া আছে পদমূলে,

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে— আপনারে ভুলে—
প্রাণপণে ভালবেসে জড়ায়ে জড়ায়ে শেষে
এক দিন উঠিবে সে বুকে মাথা তুলে,
শাখাটি বাঁধিতে দিবে আলিঙ্গনে তার,
দুখিনীর সে আশা কি বড় অহঙ্কার ?
কি করেছি অপরাধ বুঝিতে না পারি !
দিন রাত্রি, সখা, আমি রয়েছি তোমারি—
কিসে তুমি ভাল রবে, কিসে তুমি সুখী হবে,
দিন রাত সে ভাবনা জাগিছে অন্তরে !
মুহূর্ত্ত ভাবি না আমি আপনার তরে ।
তারি বিনিময়ে কি গো এত অনাদর !
শতখানা ফেটে যায় বুকের ভিতর !
সখা, আমি অভিমান কভু করি নাই—
মনে করিতেও তাহা লাজে মরে যাই ।
ধীরে ধীরে এসে কাছে মনে মনে হাস পাছে—
"দুখিনী ললিতা সেও অভিমান করিয়াছে !"
তাই অভিমান কভু মনেও না ভায়,
অশ্রুজল হেরে পাছে হাসি তব পায় !
বুকে বড় ব্যথা বাজে, তাই ভাবি মাঝে মাঝে
ভিক্ষুকের মত গিয়া পড়ি তব পায়—
কেঁদে গিয়ে ভিক্ষা করি করিয়া বিনয়,
"সর্ব্বস্ব দিয়েছি ওগো— পরাণ হৃদয়—
হৃদয় দিয়েছি বলে হৃদয় চাহি না ভুলে—
একটু ভালবাসিও, আর কিছু নয় !"
পাছে গো চাহিলে ভিক্ষা, ধরিলে চরণে,
বিরক্ত বা হও তাই ভয় করি মনে ।
তবে গো কি হবে মোর ! জানাব কি করে ?
এমন ক'দিন আর রব প্রাণ ধরে ?
হা দেবি ! হা ভগবতি ! জীবন দুর্ভর অতি !
কিছুতে কি পাব নাকো ভালবাসা তাঁর ?

তবে নে মা, কোলে নে মা, কোথাও আশ্রয় দে মা—
একটু স্নেহের ঠাঁই দেখা মা আমার !

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। ললিতাও হলি নাকি মুরলার মত !
তেমনি বিষাদময় আঁখি দুটি নত।
তেমনি মলিন মুখে আছিস কিসের দুখে,
তোদের একি এ হল ভাবি লো কেবল—
চপলারে তোরা বুঝি করিবি পাগল !
ছেলেবেলা বেশ ছিলি, ছিল না ত জালা—
সদা মৃদুহাসিময়ী লাজময়ী বালা।
এক দিন— মনে পড়ে ? সরসীর তীরে
বসেছিলি নিরিবিলি, কেবল দেখিতেছিলি
নিজের মুখের ছায়া পড়েছিল নীরে।
বুঝি মেতে গিয়েছিলি রূপে আপনার !
(তোর মত গরবিনী দেখি নি ত আর !)
সহসা পিছন হ'তে ডাকিলাম তোরে,
কি দারুণ শরমেতে গিয়েছিলি ম'রে ?
আজ তোর হ'ল কি লো ললিতা আমার ?
সে সব লাজের ভাব নাই যে লো আর !
শুধু বিষাদের হাসি, মুরলার মত !
বল্ তোরা হলি একি ? পৃথিবীর মাঝে দেখি
কেবল চপলা সুখী, দুঃখী আর যত !
মোরে কিছু বলিবি নে ?— আহা ম'রে যাই !—
অনিল সে কত ক'রে আদর করে যে তোরে
লুকায়ে লুকায়ে আমি যেন দেখি নাই !
ভাল, ভাল, বলিস নে, আমার কি তায় ?
চল্ তুই, ললিতা লো, মুরলা যেথায় !
যাহা তোর মনে আছে কহিস তাহারি কাছে,
তা হলে ঘুচিয়া যাবে হৃদয়ের ভার।
ত্বরা করে চল্ তবে ললিতা আমার !

[কবির প্রবেশ]

চপলা। [কবির প্রতি]

চল, কবি, মুরলার কাছে—

বড় সে মনের দুঃখে আছে!

তুমি, কবি, তারে দেখো— সদা কাছে কাছে রেখো,

তুমি তারে ভাল ক'রে করিও যতন!

তুমি ছাড়া কে তাহার আছে বা স্বজন!

কবি। মুরলার মুখ দেখে প্রাণে বড় বাজে—

কিসের যে দুঃখ তার শুধায়েছি কতবার,

কিছুতে আমার কাছে প্রকাশে না লাজে!

কত দিন হতে মোরা বাঁধা এক ডোরে—

যাহা কিছু থাকে কথা, যাহা কিছু পাই ব্যথা,

দুজনে তখনি তাহা বলি দুজনেরে।

কিছু দিন হতে একি হ'ল মুরলার,

আমারে মনের কথা বলে না সে আর!

মাঝে মাঝে ভাবি তাই— বড় মনে ব্যথা পাই—

বুঝি মোর 'পরে নাই প্রণয় তাহার!

এত কথা বলি তারে এত ভালবাসি,

সে কেন আমারে কিছু কহে না প্রকাশি!

ঊনবিংশ সর্গ

অনিল

উহ, কি না করিলাম হৃদয়ের সাধ!

মোর উন্মত্তের মত সঘনে ঘুরিনু কত,

অশান্তির বিপ্লাবনে গেছে দিন রাত!

নিশীথে গিয়েছি ছুটে দারুণ অধীর—

নয়নেতে নিদ্রা নাই, চোখে না দেখিতে পাই,
হাহা করে ভ্রমিয়াছি বিপাশার তীর !
করেছে দারুণ ঝড় বজ্রদন্ত কড়্মড়্,
চারি দিকে অন্ধকার সম্মুখে পশ্চাতে—
মাথার উপরে চাই— একটিও তারা নাই,
সৃষ্টি যেন ঠাঁই নাহি পেতেছে দাঁড়াতে !
সাধ গেছে, ঝটিকার রুদ্রদেবগণ
বিশাল চরণ দিয়া দলি যায় এই হিয়া—
নিষ্পেষিত করি ফেলে কীটের মতন।
চূর্ণ হয়ে একেবারে মিশে ধূলিরাশে
উড়ে পড়ে চারি দিকে বাতাসে বাতাসে !
অশান্তির এক উপদেবতার মত
নিজের হৃদয়-সাথে যুঝিয়াছি কত !
করি অশ্রুবারিপাত গেছে চলি দিনরাত,
অবশেষে আপনি হলেম পরাভূত !
ইচ্ছা করে ছিঁড়ি ছিঁড়ি হৃদয় আমার
শকুনী গৃধিনীদের যোগাই আহার।
এহেন অসার দীন হৃদি অতি বলহীন,
যোগ্য শুধু শিশুর খেলেনা গড়িবার।
এ হৃদি কি বলবান পুরুষের মন—
সামান্য বহিলে বায় সঘনে কাঁপিবে কায়,
মাটিতে নোয়াবে মাথা লতার মতন !
কেন ধরা, কেন এবে, জন্ম দিয়েছিলি মোরে ?
এমন অসার লঘু দুর্ব্বল এ প্রাণ ?
এখনি গো দ্বিধা হও, লও মোরে কোলে লও !
এ হীন জীবনশিখা কর গো নির্ব্বাণ !
আর একবার দেখি, যদি এ হৃদয়
পারি আমি বজ্রবলে করিবারে জয় !
কিন্তু হায় কে আমরা ? ভাগ্যের খেলেনা,
প্রচণ্ড অদৃষ্টস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণকণা !

অন্তরে দুর্দান্ত হৃদি পড়িছে উঠিছে,
বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে
যা কিছু ধরিতে চাই কিছুই খুঁজে না পাই,
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মত
দিশ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞানহত।
চোখে না দেখিতে পাই, কানে না শুনিতে পাই,
তীব্রবেগে বহে বায়ু বধিরি শ্রবণ—
চারি দিকে টলমল তরঙ্গের কোলাহল,
আকাশে ছুটিছে তারা উল্কার মতন—
ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে পড়ি গো আবর্ত্তে এসে,
চৌদিকে ফেনায়ে উঠে উর্ম্মির পর্ব্বত—
মস্তক ঘুরিয়া উঠে, সঘনে শোণিত ছুটে,
ঘুরিতে ঘুরিতে যাই কোথায় ভেবে না পাই—
তলায়ে তলায়ে যাই পাতালের পথ—
আঁধারে দেখিতে নারি এনু কোন্ ঠাঁই,
উর্দ্ধে হাত তুলি কিছু ধরিতে না পাই—
ঘুরি ঘুরি রাত্রি দিন হয়ে পড়ি জ্ঞানহীন,
নিম্নে কে চরণ ধরি করে আকর্ষণ!
কোথায় দাঁড়াব গিয়ে কে জানে তখন!
তবে আর কি করিব! যাই—যাই ভেসে—
পাষাণ বজ্রের মত অদৃষ্টের মুষ্টি শত
হৃদয়েরে আকর্ষিছে ধরি তার কেশে!
কি করিতে পারি বল আমি ক্ষুদ্র নর!
অদৃষ্টের সাথে কভু সাজে কি সমর!
দিন রাত্রি তুষানলে মরি তবে জ্ব'লে জ্ব'লে—
হাসুক সমস্ত ধরা তীব্র ঘৃণাহাসি,
সে মোরে করুক ঘৃণা যারে ভালবাসি!
আপনার কাছে সদা হয়ে থাকি দোষী,
হৃদয়ে ঘনাতে থাক্ কলঙ্কের মসী!
যার ভালবাসা-তরে আকুল হৃদয়,

যার লাগি সহি জ্বালা তীব্র অতিশয়—
তারে ভালবাসি ব'লে, তারি লাগি কাঁদি ব'লে,
তারি লাগি সহি ব'লে এতেক যাতনা—
সেই মোরে ঘৃণা ক'রে ভালবাসিবে না!
তাই হোক, তাই হোক, ভাগ্য, তাই হোক—
অভাগার কাছ হতে সবে দূরে র'ক।
যাই যাই ভেসে যাই— যা হবার হবে তাই—
কে আছে আমার তরে করিবারে শোক?

[ললিতার প্রবেশ]

এই যে, এই যে হেথা, ললিতা আমার,
আয়, আয়, মুখখানি দেখি একবার!
আসিবি কি ফিরে যাবি তাই যেন ভাবি ভাবি
অতি ধীর মৃদুগতি সঙ্কোচে তোমার—
আয় বুকে ছুটে আয়, ভাবিস নে আর!
কেন লো ললিতারাণি, বিষণ্ণ ও মুখখানি?
কেন লো অধরে নাই হাসির আভাস?
নয়ন এ মুখে কেন চাহিতে চাহে না যেন—
কি কথা রয়েছে মনে, বলিতে না চাস্!
অপরাধ করেছি কি প্রেয়সী আমার?
বল্ লো কি শাস্তি মোরে দিতে চাস তার!
যা দিবি তাহাই সব', মাথায় পাতিয়া লব,
তাহে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় লো তাহার!
সজনি, জানিস্ হা রে, ভাল তু বাসিস যারে
মন তার অতি নীচ, অতি অন্ধকার!
অপরাধ করিবে সে, আশ্চর্য্য কি তার?
সখি লো, মার্জ্জনা তুই করিস নে তারে,
চিরকাল ঘৃণা কর্ হৃদয়মাঝারে!
সখি, তুই কেন ভাল বাসিলি আমায়
তাই ভেবে দিবানিশি মরি যাতনায়!
কেন, সখি, দুজনের দেখা হল আমাদের,

দারুণ মিলন হেন কেন হল হায় ?
জানি যে রে এ হৃদয় দারুণকলঙ্কময় !
কি ব'লে দিব এ হৃদি চরণে তোমার !
চরণে ফেল লো দলি হেন উপহার !
সতত শরমে বিঁধি　　লুকাতে চাহি এ হৃদি—
এ হৃদে বাসিলে ভাল মরে যাই লাজে,
হেন নীচ হৃদয়েরে ভালবাসা সাজে !
ভাল আমি বাসি তোরে,　　চিরকাল বাসিব রে,
তবু চাহি নাকো আমি তোর ভালবাসা—
লয়ে তোর নিজ মন　　সুখে থাক্ অনুক্ষণ,
হেন নীচ হৃদয়ের রাখিস নে আশা !
বল লো কিসের ব্যথা পেয়েছিস মনে ?
থাক্, থাক্, কাজ নেই, থাক্ তা গোপনে—
হয়েছে ত যা হবার,　　বলে তা কি হবে আর !
হয়ত আমিই কিছু করিয়াছি দোষ !
কাজ কি সে কথা তুলে,　　সে-সব যা না লো ভুলে,
একবার কাছে আয় এইখেনে বোস্ !
আধেক অধর-ভরা দেখি সেই হাসি,
ঢাল্ লো তৃষিত নেত্রে সুধা রাশি রাশি !
সখি মুখ তুলে চা' লো,　　একটি কথা ক' না লো—
ললিতা রে, মৌন হয়ে থাকিস নে আর !
একবার দয়া করে কর্ তিরস্কার !
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে গেল দিনমান—
একটি রাখিবি কথা ?　গাহিবি কি গান ?

ললিতার গান

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা—　　সে-সব পুরাণো কথা
মনে করে দেয় শুধু, ভাঙে এ হৃদয়।

প্রতি হাসি, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার—
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর!
প্রেম যদি ভুলে থাক' সত্য ক'রে বল'-নাকো,
করিব না মুহূর্ত্তের তরে তিরস্কার!
আমি তো বলেই ছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর কারে ভালবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালবেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
পুরাণো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ!

অনিল। [স্বগত]

কি!— শেষে এই হ'ল, এই হ'ল হায়!
কি করেছি যার লাগি এ গান সে গায়?
তবে সে সন্দেহ করে প্রণয়ে আমার!
বিশ্বাস নাইক তবে মোর 'পরে আর!
বিশ্বাস নাইক তবে? তাই হবে, তাই হবে—
এত করে এই তার হ'ল পুরস্কার!
সন্দেহ করিবে কেন? কি আমি করেছি হেন!
সন্দেহ করিতে তার কোন্ অধিকার?
আমি কি রে দিন রাত রহি নি তাহারি সাথ?
সতত করি নি তারে আদর যতন?
বার বার তারে কি রে শুধাই নি ফিরে ফিরে
মুহূর্ত্তের তরে হেরি বিষণ্ণ আনন?
একটি কথার তরে কত-না শুধাই তারে—
একটি হেরিতে হাসি রজনী পোহাই!
তাই কি রে এই হল? শেষে কি রে এই হল?
তাইতে সংশয় এত? অবিশ্বাস তাই?
কল্পনায় অকারণে সে যদি কি করে মনে,
আমি কেন তার লাগি সব' তিরস্কার?
তবে কি সে মনে করে ভাল বাসি নাকো তারে!

সকলি কপট তবে প্রণয় আমার ?
নাহয় ভাল না বাসি, দোষ তাহে কার ?
কখনো সে কাছে এসে করেছে আদর ?
কখনো সে মুছায়েছে অশ্রুবারি মোর ?
আমি তারে যত্ন যত করেছি সতত
বিনিময় আমি তার পেয়েছি কি তত ?
করেছি ত আমার যা ছিল করিবার,
সহিতে হয় নি কভু অনাদর তার !
তবু সে কি করে আশা ! হৃদয়ের ভালবাসা ?
আদরেই ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ,
তবু সে করিবে কেন মোরে অবিশ্বাস ?

[প্রস্থান

ললিতা। আর কেন অনুক্ষণ রহি তার পাশে
নিতান্তই যদি মোরে ভাল নাহি বাসে ?
বিরক্তিতে ওষ্ঠ তার কাঁপিতেছে বার বার,
তবুও ললিতা তার পায়ে পড়ে আছে !
সঙ্গ তার তেয়াগিয়া আছেন বিরলে গিয়া,
সেথাও ললিতা ছুটে গেছে তাঁর কাছে !
এই মুখে হাসি ছিল তারে দেখি মিলাইল,
তবু সে রয়েছে বসি পদতলে তাঁর !
যেখানেই তিনি যান সেথাই দেখিতে পান
এই এক পুরাতন মুখ ললিতার !
প্রমোদ-আগারে বসি— সেথা এই মুখ !
বিরলে ভাবনা-মগ্ন— সেথা এই মুখ !
বিজনে বিষাদভরে নয়নে সলিল ঝরে,
সেথাও সমুখে আছে এই— এই মুখ !
কি আছে এ মুখে তোর ললিতা অভাগী ?
ওই মুখ— ওই মুখ— দিবানিশি ওই মুখ
যেথা যান সেথা লয়ে যাস্ রে কি লাগি ?
ছিনু ওই পদতলে প'ড়ে দিন রাত—

করেছিনু পথরোধ, দিয়েছে তাহার শোধ—
ভালই করেছ, সখা, করেছ আঘাত!
মনে করেছিনু, সখা, প্রণয় আমার
ফুলময় পথ হবে, তোমারে বুকেতে লবে—
চরণে কঠিন মাটি বাজিবে না আর!
কিন্তু যদি ও পদের কাঁটা হয়ে থাকি
এখনিই তুলে ফেল, এখনিই দ'লে ফেল—
এমন পথের বাধা কি হবে গো রাখি?
আজ হতে দিবানিশি রব নাকো কাছে?
নিতান্তই ফাটে বুক, অশ্রুবারি আছে—
বিজনে কাঁদিতে পারি— একেলা ভাবিতে পারি—
আর কি করি গো আশা? হবে যা হবার,
না ডাকিলে কাছে কভু যাবে নাকো আর!
এক দিন, দুই দিন, চলে যাবে কত দিন,
তবু যদি ললিতারে না পান দেখিতে—
যে ললিতা দিন রাত রহিত গো সাথে সাথ,
সতত রাখিত তাঁরে আঁখিতে আঁখিতে,
বহু দিন যদি তারে না দেখেন আর
তবু কি তাহারে মনে পড়ে নাকো তাঁর?
ভাবেন কি একবার— "তারে যে দেখি না আর?
ললিতা কোথায় গেল? কোথায় সে আছে?"
হয়ত গো একবার ডাকিবেন কাছে—
দেখিবেন ললিতার মুখে হাসি নাই আর,
কেঁদে কেঁদে আঁখি গেছে জ্যোতিহীন হয়ে—
একবার তবু কি রে আদর করেন মোরে
অতি শীর্ণ মুখ মোর বুকে তুলে লয়ে?
তখন কাঁদিয়া কব পা-দুখানি ধরে
"বড় কষ্ট পেয়েছি গো, আর, সখা, সহে নাকো!
মাঝে মাঝে একবার দেখা দিও মোরে!"

বিংশ সর্গ

নলিনী

গান

সখি লো, শোন্ লো তোরা শোন্,
আমি যে পেয়েছি এক মন!
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুধার,
সমস্ত আমার কাছে তার—
পেয়েছি পেয়েছি আমি, সখি,
একটি সমগ্র মন প্রাণ!
লাজ ভয় কিছু নাই তার,
নাই তার মান অভিমান!
রয়েছে তা আমারি মুঠিতে,
সাধ গেলে পারি তা টুটিতে,
যা ইচ্ছা করিতে পারি তাই—
সাধ গেলে হাসাই কাঁদাই;
সাধ গেলে ফেলে তারে দিই,
সাধ গেলে তুলে তারে রাখি,
ইচ্ছা হয় তাড়াইতে পারি,
ইচ্ছা হয় কাছে তারে ডাকি!
জানে না সে রোষ করিবারে,
ফিরে যেতে নাহি পারে আর,
শুধু জানে হাসিতে কাঁদিতে—
আর কিছু সাধ্য নাই তার!
সখি লো, এমন মন এক
পেয়েছি— পেয়েছি তোরা দেখ্!
আমি কভু চাই নি এ মন,
ইহাতে মোর কি প্রয়োজন?

পথিক সে, পথে যেতে যেতে
দেখা হ'ল চোখেতে চোখেতে—
মনখানা হাতে ক'রে নিয়ে
আপনি সে রেখে গেল পায়
চলে গেল দূর দূরান্তরে
মন পড়ে রহিল ধূলায়।
দু-দণ্ড চাহিয়া দেখিলাম,
ভাবিনু "মোর কি প্রয়োজন!"
আঁখি দুটি লইনু তুলিয়া,
দূরে যেতে ফিরানু বদন!
অমনি সে নূপুরের মত
চরণ ধরিল জড়াইয়া,
সাথে সাথে এল সারা পথ
রুণু ঝুনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সখি, আমি শুধাই তোদের
সত্য ক'রে মোরে বল্ দেখি,
পায়ে স্বর্ণভূষণের চেয়ে
হৃদয়ের নূপুর শোভে কি?
কি করিব বল্ দেখি তাহা—
আপনি সে গেল যদি রেখে!
আমি ত চাই নি তারে ডেকে!
আমারেই দিলে কেন আসি,
রূপসী ত ছিল রাশি রাশি!
সুহাসি কমলা ছিল না কি?
শুনেছি মধুর তার আঁখি!
বিনোদিনী ছিল ত সেথায়,
রূপ তার ধরে না ধরায়!
তবে কেন মনখানি তার
আমারে সে দিল উপহার?
দেব কি ইহারে দূরে ফেলে,

অথবা রাখিব কাছে ক'রে,
তাই ভাবিতেছি মনে মনে—
কি করিব বল্ তাহা মোরে।

একবিংশ সর্গ

অনিল

কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
ভেঙে দিলি হাল তুই, তুলে দিলি পাল তুই,
করিলি প্রবৃত্তিস্রোতে আত্মবিসর্জ্জন—
ভেবেছিলি যাবি ভেসে কোন ফুলময় দেশে
চাঁদের চুম্বনে যেথা ঘুমায়ে গোলাপ
সুখের স্বপনে কহে সুরভিপ্রলাপ!
কিন্তু রে ভাঙিলি তরী কঠিন শৈলের 'পরি,
কিছুতেই পারিলি নে সামালিতে আর!
এখন কি করিবি রে ভাব্ একবার!
ভগ্নকাষ্ঠ বুকে ধরি উন্মত্ত সাগর-'পরি
উলটিয়া পালটিয়া যাবি ভেসে ভেসে—
নাই দ্বীপ, নাই তীর, উনমত্ত জলধির
ফেনজটা ঊর্ম্মি যত নাচে অট্ট হেসে।
কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
এই ত নলিনী তোর? প্রাণের দেবতা তোর?
ছি ছি রে, কোথায় গিয়ে ঢাকিবি সরম?
নীচ হতে নীচ অতি— হীন হতে হীন—
পথের ধূলার চেয়ে অসার মলিন।
এই এক ধূলিমুষ্টি কিনিয়া রাখিতে
সমস্ত জগৎ তোর চেয়েছিলি দিতে!

রাজপথে মনের দোকান খুলিয়াছে—
রঙ মাখাইয়া কত ঝুঁটা মন শত শত
সাজাইয়া রেখেছে সে দুয়ারের কাছে,
যে কোন পথিক আসে ডাকি তারে লয় পাশে,
হৃদয়ের ব্যবসায় করে সে রমণী—
আমারেও প্রতারণা করেছে এমনি!
যে মন কিনিয়াছিনু কিছুই সে নয়,
রঙ-করা ঝুটা হাসি ঝুটা কথা -ময়!
প্রতি পিপাসিত আঁখি যে হাসি লুটিছে,
প্রতি শ্রবণের কাছে যে কথা ফুটিছে,
যে হাসির নাই বাস, নাই অন্তঃপুর,
চরণে যে বেঁধে রাখে মুখর নূপুর,
যে হাসি দিবস রাতি ভিক্ষার অঞ্জলি পাতি
প্রতি পথিকের কাছে নাচিয়া বেড়ায়—
অনিল রে! তারি তরে কেঁদেছিল হায়!
যে কথা, পথের ধারে পঙ্কের মতন,
জড়াইয়া ধরে প্রতি পান্থের চরণ,
সেই একটি কথা -তরে হৃদয় আমার,
দিবানিশি ছিলি পড়ে দুয়ারে তাহার!
হৃদয়ের হত্যা করা যার ব্যবসায়
সেই মহা পাপিষ্ঠার তুলনা কোথায়?
শরীর ত কিছু নয়, সে ত শুধু ধূলা—
ধূলির মুষ্টির সাথে হয় তার তুলা—
সমস্ত জগৎ তুল্য হৃদয়ের পাশে
সাধ ক'রে হেন হৃদি যেজন বিনাশে,
তোর মাথা পরশিল তাহারি চরণ!
তারেই দেবতা ব'লে করিলি বরণ!
তারি পদতলে তুই স'পিলি হৃদয়—
তোর হৃদি— যার কাছে কিছুই সে নয়!
শতেক সহস্র হেন মলিনী আসুক কেন

মনের পথের তোর ধূলিও না হয় !
বিধাতা, এ সৃষ্টি তব সব বিড়ম্বনা,
সত্য ব'লে যাহা কিছু   পরশিতে গেছি পিছু
ছুঁয়েছি যেমনি আর কিছুই রহে না !
হৃদে হৃদে ভালবাসা করেছ সঞ্চার,
অথচ দাও নি লোক ভালবাসিবার !
সমস্ত সংসার এই খুঁজিয়া দেখিলে
ছুটি হৃদি একরূপ কেন নাহি মিলে ?
ওই-যে ললিতা হেথা আসিছে আবার !
করেছে সমস্ত মুখ বিষণ্ণ আঁধার !
কেন ? তার হয়েছে কি ভেবে ত না পাই
যা লাগি বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে সদাই !
চায় কি সে দিন রাত্রি বুকে তারে রাখি,
অবাক্ মুখেতে তার তাকাইয়া থাকি ?
দিবানিশি বলি তারে শত শত বার
"ভালবাসি— ভালবাসি প্রেয়সী আমার" !
তবেই কি মুখ তার হইবে উজ্জ্বল ?
তবেই মুছিবে তার নয়নের জল ?
এত ভাল কত জন বাসে এ ধরায় ?
নিঃশব্দে সংসার তবু চ'লে কি না যায় !
ঘরে ঘরে অশ্রুবারি ঝরিত নহিলে,
জগৎ ভাসিয়া যেত নয়নসলিলে !
দিনরাত অশ্রুবারি   আর ত সহিতে নারি—
দূর হোক, হেথা হতে লইব বিদায়,
অদৃষ্টের অত্যাচার সহা নাহি যায় !

[অনিলের প্রস্থান

[ললিতার প্রবেশ]

ললিতা। এমনি ক'রেই তোর কাটিবে কি দিন ?
ললিতা রে, আর ত সহে না !
এ জীবন আর ত রহে না !

বিধাতা, বিধাতা, তোর ধরি রে চরণ—
বল্ মোরে কবে মোর হইবে মরণ ?
নাইক সুখের আশা— চাই নাকো ভালবাসা—
সুখসম্পদের আশা দুরাশা আমার—
কপালে নাইক যাহা চাই না তা আর !
এক ভিক্ষা মাগি ওরে— তাও কি দিবি নে মোরে ?
সে নহে সুখের ভিক্ষা— মরণ— মরণ !—
মরণ— মরণ দে রে— আর কিছু চাহি নে রে,
আর কোন আশা নাই— মরণ মরণ !—
এখনি মুদিলে আঁখি যদি রে আর না থাকি,
অমনি বায়ুর স্রোতে মিশাইয়া যাই—
এখনি এখনি আহা হয় যদি তাই !

[অনিলের প্রবেশ]

ললিতা। কোথা যাও, কোথা যাও, সখা, তুমি কোথা যাও—
একবার চেয়ে দেখ এই দিক-পানে !
কহি গো চরণ ধরে— ফেলিয়া যেও না মোরে !
আর ত যাতনা, সখা, সহে না এ প্রাণে।
ভালবাসা চাই না ত, সখা গো, তোমার—
একটুকু দয়া শুধু কোরো একবার !
একটুকু কোরো, সখা, মুখের যতন—
মুহূর্ত্তের তরে, সখা, দিও দরশন !
নিতান্ত সহিতে নারি যবে পা-দুখানি ধরি
আঘাত করিয়া, সখা, ফেলিও না দূরে—
এইটুকু দয়া শুধু কোরো তুমি মোরে !
কোথা যাও বল বল, কোথা যাও চলে !
যেতেছ কি হেথা হ'তে আমি আছি বলে ?
গভীর রজনী এবে ঘুমেতে মগন সবে—
বল, সখা, কোথা যাও, চাও কি করিতে ?

অনিল। মরিতে ! মরিতে বালা ! যেতেছি মরিতে !
ললিতা, বিধবা তুই আজ হতে হলি !

ফেল্ অনিলের আশা মন হতে দলি !
আর তুই সাথে সাথে আসিস নে মোর,
হেথা রহি যাহা ইচ্ছা করিস রে তোর !
আবার ! আবার !
থাক্ ওইখেনে তুই, এগোস নে আর !
শত শত বার ক'রে বলিতে কি হবে তোরে ?
দাঁড়া হোথা, এক পদ আসিস নে আর !
আসিস নে বলি তোরে, বলি বার বার !
শান্তিতে মরিব যে রে তাও তুই দিবি নে রে !
মরিতে যেতেছি, তবু রাহুর মতন
পদে পদে সাথে সাথে করিবি গমন ?
দাঁড়া হোথা, সাথে সাথে আসিস নে আর,
এই তোর 'পরে শেষ আদেশ আমার !

[অনিলের প্রস্থান ও ললিতার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

দ্বাবিংশ সর্গ

নলিনীর প্রতি বিনোদের গান

তুই রে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন।
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাননে করিস বিচরণ—
নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন !
তোর নহে সুখের জীবন !
যেথা দিয়া তুই যাস পদতলে চারি পাশ
ফুলেরা খুলিয়া দেয় প্রাণ !

বুকের উপর দিয়া যাস তুই মাড়াইয়া,
কিছু না করিস অবধান।
শুনিতে সুখের কথা আকুল হইয়া লতা
কত তোরে সাধাসাধি করে—
ছুটা কথা শুনিলি বা, ছুটা কথা বলিলি বা,
চলে যাস দূর দূরান্তরে!

পাখীরা খুলিয়া প্রাণ করে তোর গুণগান,
চারি দিকে উঠে প্রতিধ্বনি:
বকুলের বালিকারা হইয়া আপনা-হারা
ঝরি পড়ে সুখেতে অমনি!
তবু রে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন!

আছে যশ, আছে মান, আছে শত মন প্রাণ—
শুধু এ সংসারে তোর নাই
এক তিল দাঁড়াবার ঠাঁই!
তাই রে জোছনারাতে অথবা বসন্তপ্রাতে
গাস যবে উল্লাসের গান,
সে রাগিণী মনোমাঝে বিষাদের সুরে বাজে,
হাহাকার করে তাহে প্রাণ!

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়—
শ্যামল বাহুর ডোরে বাঁধিয়া রাখিব তোরে
ছোট সেই কুঞ্জটির ছায়!

তুই সেথা র'স যদি তবে সেথা নিরবধি
মধুর বসন্ত জেগে রবে,
প্রতি দিন শত শত নব নব ফুল যত
ফুটিবেক, তোরি সব হবে।
তোরি নাম ডাকি ডাকি একটি গাহিবে পাখী,
বাহিরে যাবে না তার স্বর!

সে কুঞ্জেতে অতি মৃদু মাণিক ফুটাবে শুধু
বাহিরের মধ্যাহ্নের কর।
নিভৃত নিকুঞ্জছায় হেলিয়া ফুলের গায়
শুনিয়া পাখীর মৃদু গান
লতার-হৃদয়ে-হারা সুখে-অচেতন-পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ!
তাই বলি, বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়!
অতৃপ্ত মনের আশ লুটিয়া সুখের রাশ,
কেন রে করিস্ হায় হায়!

ত্রয়োবিংশ সর্গ

কবি

মুরলা কোথায়?
সে বালা কোথায় গেল? কোথায়? কোথায়?
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, কিন্তু রে মুরলা কই?
খুঁজে খুঁজে ভ্রমি তারে হেথায় হোথায়?
সে মোর সন্ধ্যার দীপ, কোথা গেল বল্!
একটি আঁধার ঘরে একাকী সে জ্বলিত রে
সন্ধ্যার দীপের মত বিষণ্ণ উজ্জ্বল।
সন্ধ্যা হ'লে ধীরে ধীরে আসিতাম ঘরে ফিরে
শ্রান্ত পদক্ষেপে অতি মৃদু গান গেয়ে,
সুদূর প্রান্তর হতে দেখিতাম চেয়ে—
মোর সে বিজন ঘরে শূন্য বাতায়ন-'পরে
একটি সন্ধ্যার দীপ আলো করে আছে—

আমারি— আমারি তরে পথ চেয়ে আছে—
আমারেই স্নেহভরে ডাকিতেছে কাছে।
হা মুরলা, কোথা গেলি, মুরলা আমার ?
ওই দেখ্ ক্রমশই বাড়িছে আঁধার!
সমস্ত দিনের পরে কবি তোর এল ঘরে—
প্রশান্ত মুখানি কেন দেখি না তোমার ?
ওই ত দ্বারের কাছে দীপটি জ্বালানো আছে,
আসন আমার ওই রেখেছিস পেতে—
আমি ভালবাসি ব'লে যতনে আনিয়া তুলে
রজনীগন্ধার মালা দিয়েছিস গেঁথে!
কিন্তু রে দেখি না কেন তোর মুখখানি ?
শত শত বার ক'রে ভ্রমিতেছি ঘরে ঘরে—
কোথাও বসিতে নারি, শান্তি নাহি মানি!
হুহু করি উঠিতেছে সন্ধ্যার বাতাস,
প্রতি ঘরে ভ্রমিতেছে কার হাহুতাশ!
কাঁপে দীপশিখা তাহে, নিভিয়া যাইতে চাহে—
প্রাচীরে চমকি উঠে ছায়ার আঁধার!
সে মুখ দেখি নে কেন ? সে স্বর শুনি নে কেন ?
প্রাণের ভিতরে কেন করে হাহাকার ?
জানি না হৃদয়খানা ফাটিয়া কেন রে
আঁখি হতে শতধারে অশ্রুবারি ঝরে ?
কে যেন প্রাণের কাছে কি-জানি-কি বলিতেছে,
কি-জানি-কি ভাবিতেছি ভাবিয়া না পাই!
কোথা যাই— কোথা যাই— বল্ কোথা যাই!
মুরলা রে— মুরলা, কোথায় ?
কোথায় গেলি রে বালা ? কোথায় ? কোথায় ?

[চপলার প্রবেশ]

চপলা। কবি গো, কোথায় গেল মুরলা আমার ?
দারুণ মনের জ্বালা আর সহিল না বালা—
বুঝি চ'লে গেল তাই, ফিরিবে না আর!

বুঝি সে মুরলা মোর, সমস্ত হৃদয়
তোমারে সঁপিয়াছিল— আর কারে নয়।
বুঝি বা সে ভাল ক'রে পেলে না আদর,
কাঁদিয়া চলিয়া গেল দূর দেশান্তর।
চল কবি, মুরলারে খুঁজিবারে যাই—
আরেকটি বার যদি তার দেখা পাই,
ভাল ক'রে তারে তুমি করিও যতন,
কবি গো কহিও তারে স্নেহের বচন।
করুণ মুখানি তার বুকে তুলে নিও,
অশ্রুজলধারা তার মুছাইয়া দিও!

চতুর্বিংশ সর্গ

নলিনী

সে জন চলিয়া গেল কেন?
কি আমি করেছি বল্ হেন!
সে মোরে দেছিল ভালবাসা,
আমি তারে দিয়েছিনু আশা।
হেসেছি তাহার পানে চেয়ে,
তুষেছি তাহারে গান গেয়ে!
এক সাথে বসেছি হেথায়,
তবে বল' আর কি সে চায়?
চায় কি সঁপিব তারে প্রাণ,
করিব জগৎ মোর দান?
মোর অশ্রুজল— মোর হাসি—
আমার সমস্ত রূপরাশি?

কে তার হৃদয় চেয়েছিল ?
আপনি সে এনে দিয়েছিল।
পাছে তার মন ব্যথা পায়,
জ'লে মরে প্রেম-উপেক্ষায়,
দয়া ক'রে হেসেছিনু তাই—
তাই তার মুখপানে চাই।
দয়া ক'রে গান গেয়েছিনু,
দয়া ক'রে কথা কয়েছিনু।

একি তবে মন-বিনিময় ?
হৃদয়ের বিসর্জ্জন নয় ?
সখি, তোরা বল্ দেখি, সত্য চ'লে গেল সে কি ?
ফিরায়ে কি লইল হৃদয় ?
এবার যদি সে আসে যাইব তাহার পাশে,
ভাল করে কথা কব হেসে—
গান গাব তার কাছে এসে ?
এত দূরে গেছে তার মন,
গলাতে কি নারিব এখন ?

পঞ্চবিংশ সর্গ

মুরলা

ওই ধীরে সন্ধ্যা হয়-হয় !
গ্রামের কানন হল অন্ধকারময় !
যতই ঘনায়ে আসে সন্ধ্যার আঁধার—
কাঁদিয়া ওঠে গো কেন হৃদয় আমার ?

দুঃখ যেন অতিশয় ধীরে ধীরে আসে—
পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, বসে মোর পাশে!
মরমেতে আঁখি রাখে, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে,
কি মন্ত্র পড়িতে থাকে বুকের উপরে!
কেন গো এমন হয় প্রাণের ভিতরে?
সন্ধ্যাদীপ ঘরে ঘরে উঠিল জলিয়া—
বাহিরে যে দিকে চাই কিছু না দেখিতে পাই—
আঁধার বিশালকায়া আছে ঘুমাইয়া!
ভিতরে কুঁড়ের বুকে নিভৃতে মনের সুখে
ছোট ছোট আলোগুলি রয়েছে জাগিয়া!
আমার আলয় নাই— ভাই নাই, বন্ধু নাই,
কেহ নাই এক তিল করিবারে স্নেহ—
দিবস ফুরায়ে এলে মোর তরে কেহ
জালায়ে রাখে না কভু প্রদীপটি ঘরে,
পথপানে চেয়ে কেহ নাই মোর তরে!
দিবসের শ্রমে ক্লান্ত— সন্ধ্যা যবে হয়
কোথায় যে যাব, নাই স্নেহের আলয়!
বিরাম বিশ্রাম নাই— আদর যতন নাই—
পথপ্রান্তে ধূলি'পরে করি গো শয়ন,
চেয়ে দেখিবার লোক নাই এক জন।
অন্ধকার শাখা মেলি শুধু বৃক্ষ যত
কি ক'রে যে চেয়ে থাকে অবাকের মত!
তারকার স্নেহশূন্য লক্ষ লক্ষ আঁখি
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে দূরাকাশে থাকি!
স্নেহের অভাব মনে জেগে উঠে কেন?
আশ্রয়ের তরে মন হুহু করে যেন!
এত লক্ষ লক্ষ আছে সুখের কুটীর,
একটিও নহে ওর এই অভাগীর!
সারাদিন নিরাশ্রয় ঘুরিয়া বেড়াই,
সন্ধ্যায় যে কোথা যাব তারো নাই ঠাঁই!

কত শত দিন হ'ল ছেড়েছি আলয়—
আজো কেন ফিরে যেতে তবু সাধ হয় ?
ঘুরে ঘুরে পথশ্রান্ত, নাই দিখিদিক—
আকাশ মাথার 'পরে চেয়ে অনিমিখ !
লক্ষ্য নাই, আশা নাই, কিছু নাই চিতে—
এমন ক'দিন আর পারিব থাকিতে ?

আহা সে চপলা মোর, থাকিত সে কাছে।
হয়ত তাহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে !
আমি কোথা হ'তে এক আসিয়া আঁধার
মলিন করিয়া দিনু হৃদয় তাহার।
সদাই সে থাকে আহা প্রমোদের ভরে,
মুহূর্ত্ত সে মোর তরে কাঁদিবে কেন রে ?
এতক্ষণে কবি মোর এসেছে ভবনে,
কে রয়েছে তাঁর তরে বসি বাতায়নে ?
পদশব্দ শুনি তাঁর ত্বরায় অমনি
দিতেছে দুয়ার খুলি কে গো সে রমণী !
প্রতিদিন মালা গেঁথে দিতাম যেমন,
আজো কি তেমনি কেহ করে গো রচন ?
হয়ত আলয় তাঁর রয়েছে আঁধার,
হয়ত কেহই নাই বাতায়নে তার।
হয়ত গো কবি মোর ম্রিয়মাণ মন,
কেহ নাই যার সাথে কথাটিও কন !
হয়ত গো মুরলার তরে মাঝে মাঝে
করুণ হৃদয়ে তাঁর ব্যথা বড় বাজে !
হা নিষ্ঠুর মুরলা রে, কেন ছেড়ে এলি তাঁরে
নিতান্ত একেলা ফেলি কবিরে আমার—
হয়ত রে তোর তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর !
বড় স্বার্থপর তুই, নয় দুঃখে তোর
কাঁদিয়া কাটিয়া হ'ত এ জীবন ভোর,

তাই কি ফেলিয়া আসে কবিরে একেলা !
ফিরে চল্ মুরলা রে, চল্ এই বেলা !
হা অভাগী, সন্ন্যাসিনী, আবার, আবার ?
কোথা কবি ? কোন্ কবি ? কে গো সে তোমার ?
মাঝে মাঝে দেখিস রে একি স্বপ্ন মিছে !
স্বপনের অশ্রুজল ত্বরা ফেল্ মুছে !
জীবনের স্বপ্ন তোর ভাঙিবে ত্বরায়—
জীবনের দিন তোর ফুরায়-ফুরায় !
ওই দেখ্ মৃত্যু তোর সমুখে বসিয়া
কঙ্কালের ক্রোড় তার আছে প্রসারিয়া !
সম্বন্ধ হয়েছে তোর মরণের সাথে,—
দে রে তোর হাত তার অস্থিময় হাতে !
এ সংসারে কেহ যদি তোরে ভালবাসে
সে কেবল ওই মৃত্যু— ওই রে আকাশে !
গুরুভার রক্তহীন হিমহস্তে তার
আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার !
হে মরণ ! প্রিয়তম— স্বামী গো, জীবন মম,
কবে আমাদের সেই সম্মিলন হবে ?
জীবনের মৃত্যুশয্যা তেয়াগিব কবে ?

ষড়্‌বিংশ সর্গ

নলিনী

আজ তার সাথে দেখা হ'ল,
মুখ ফিরাইয়া চ'লে গেল !
হা অদৃষ্ট, কাল মোরে হেরিয়া যে জন
নলিনী নলিনী বলি হ'ত অচেতন,

নিমেষ ভুলিত আঁখি, পূরিত না আশ—
আমার সৌন্দর্য্যরাশি করিত যে গ্রাস,
মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন!
আঁখির পিপাসা তার হৃদয়ের আশা তার
নলিনীরে দেখে সেও ফিরালে নয়ন!
পাশ দিয়া চ'লে গেল স্পর্দ্ধিতগমন?
বিশ্বাসঘাতক যদি কাল পুন আসে
নলিনী নলিনী বলি ফিরে পাশে পাশে,
ভালবাসা ভালবাসা করে দিন রাত,
তাহার পানে কি আর ফিরে চাই একবার!
করি না কি বজ্রসম কটাক্ষনিপাত!
হাসির ছুরিকা দিয়ে বিঁধি তার মন
দারুণ ঘৃণার বিষে করি অচেতন!
ভিখারী বালক সেই দিবস রজনী যেই
একটি হাসির তরে ছিল মুখ চেয়ে,
একটি ইঙ্গিত পেলে আসিত যে ধেয়ে,
আজ মোরে— নলিনীরে— হেরি সেই জন
চ'লে গেল একেবারে ফিরায়ে নয়ন!
যেন আজ, আমি রে নলিনী নই আর—
কাল যাহা ছিল আজ কিছু নাই তার!
এ হৃদে আঘাত দিবে মনে করে সে কি!
সে যদি ফিরে না চায়, সে যদি চলিয়া যায়,
তাহা হ'লে নলিনী এ কেঁদে মরিবে কি!
এই যে উড়াই ধূলা চরণের ঘায়
বায়ুভরে এও ত পশ্চাতে চ'লে যায়,
তাই নলিনীর আঁখি অশ্রু বরষিবে না কি!
হা কপাল, এও সে কি ছিল মনে ক'রে

কথা না কহিয়া সেও ব্যথা দিবে মোরে !
এ যে হাসিবার কথা— সেও মোরে দিবে ব্যথা,
কাল যারে নিতান্ত করেছি অবহেলা,
কৃপা ক'রে দেখিতাম যার প্রেমখেলা,
সেও আজ ভাবিয়াছে ব্যথিবে এ মন
শুধু কথা না কহিয়া, ফিরায়ে নয়ন !

সপ্তবিংশ সর্গ

কবি

মুরলা রে— মুরলা, কোথায় ?
দেশে দেশে ভ্রমিতেছি কোথায়— কোথায় ?
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধুধু করিতেছে,
সে মাঠেতে অন্ধকার— বিস্তারিয়া বাহু তার
ভূমিতে রাখিয়া মুখ কেঁদে মরিতেছে !
কোথা তুই— কোথা মুরলা রে,
কোথা তুই গেলি বল— শুধাইব কারে ?
উদিল সন্ধ্যার তারা ওই রে গগনে !
ওই তারা কত দিন দেখেছি দুজনে !
তা কি তোর মুরলা রে মনে আর পড়ে না রে ?
সে সকল কথা তুই ভুলিলি কেমনে ?
কত দিন— কত কথা— কত সে ঘটনা—
মনের ভিতরে কি রে আকুলি ওঠে না ?
তবে তুই কি পাষাণে বেঁধেছিলি হিয়া ?
কেমনে কবিরে তোর গেলি তেয়াগিয়া ?
বিজন আকাশে মোর ছিলি রে সতত
স্থিরজ্যোতি ওই সন্ধ্যাতারাটির মত,
যদি রে মুহূর্ত্ত-তরে আপনারে ভুলে

মেঘখণ্ড রেখে থাকি এ হৃদয়ে তুলে,
তাই কি রে অভিমানে অস্ত যেতে হয় ?
এ জনমে আর কি রে হবি নে উদয় ?
আজ আমি লক্ষ্যহীন দিক হারাইয়া !
অসীম সংসারে কোথা বেড়াই ভাসিয়া !
দেখিতে যে পাব নাকো তোরে একেবারে—
সে কথা পারি নে কভু মনে করিবারে !
শব্দ কোন শুনিলেই আপনারে ছলি
মুদিয়া নয়ন-দুটি মনে মনে বলি—
"যদি এই শব্দ তারি পদশব্দ হয় !
যদি খুলিলেই আঁখি— অমনি তাহারে দেখি !
সুমুখে সে মুখ আসি হয় রে উদয় !"
কোথায় মুরলা ! দেখা দে রে একবার,
খুঁজিয়া বেড়াতে হবে কত দূর আর ?
মুরলা রে— মুরলা কোথায় !
একেলা ফেলিয়া মোরে গেলি রে কোথায় !

অষ্টবিংশ সর্গ

নলিনী

ভাল ক'রে সাজায়ে দে মোরে ।
বুঝি রূপ পড়িতেছে ঝ'রে !
করিতে করিতে খেলা জীবনের সন্ধ্যাবেলা
বুঝি আসে তিল তিল করে !
বড় ভয় হয় প্রতিক্ষণ
নলিনী হতেছে পুরাতন,
একে একে সবে তারে তেয়াগি যেতেছে হা রে—
কেন, সখি, হতেছে এমন !

ভুলে যে আমার কাছে আসে
তখনি ত যাই তার পাশে,
দ্বিগুণ আদরে ডাকি, হাসি, গাই, কাছে থাকি,
তবুও কেন লো থাকে না সে!
ছিল ত আমার রূপরাশ
একেবারে গেলে কি বিনাশ?
সংসারে কেবলি ভবে রূপের কাঙাল সবে?
কচি মুখানির সবে দাস?
ভালবাসা ব'লে কিছু নাই?
স্বার্থপর পুরুষ সবাই?
চির-আত্মবিসর্জ্জন করে যে ভকতমন
হেন মন কোথা, সখি, পাই?
মুখেরই রাজত্ব যদি ভবে
এ মুখ সাজায়ে দে লো তবে!

ঊনত্রিংশ সর্গ

ললিতা

সংসারের পথে পথে মরীচিকা অন্বেষিয়া
ভ্রমিয়া হয়েছি ক্লান্ত নিদারুণ কোলাহলে—
তাই বলি একবার আমারে ঘুমাতে দাও –
শীতল করি এ হৃদি বিরামের স্নিগ্ধ জলে!
শ্রান্ত এ জীবনে মোর আসুক নিশীথকাল,
বিস্মৃতি-আঁধারে ডুবি ভুলি সব দুখজ্বালা,
নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ,
মিশাতে মহাসমুদ্রে জীবনের স্রোতোমালা!
শরীর অবশ অতি— নয়ন মুদিয়া আসে
মৃত্যুর মায়ের কাছে বসিয়া সন্ধ্যার বেলা,

চৌদিকে সংসার-পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি—
আধ' স্বপ্নে আধ' জেগে দেখি গো মায়ার খেলা!
কত শত লোক আছে— কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
কেহ ঘৃণা করে, কেহ প্রাণপণে ভালবাসে—
একটি কথার তরে কেহ বা কাঁদিয়া মরে,
একটি চাহনি-তরে চেয়ে আছে কত মাস—
একটি হাসির ঘায়ে কেহ বা কাঁদিয়া উঠে,
একটি হেরিয়া অশ্রু কারো মুখে ফুটে হাস!
কেহ বসে, কেহ ওঠে— কেহ থাকে, কেহ যায়—
জীবনের খেলা দেখি মরণের দ্বারে শুয়ে—
হাসি নাই, অশ্রু নাই— সুখ নাই, দুঃখ নাই—
হাসি অশ্রু সুখ দুখ দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে।
শুধু শ্রান্তি, শুধু শ্রান্তি— আর কিছু, কিছু নহে—
নহে তৃষা, নহে শোক, নহে ঘৃণা, ভালবাসা—
দারুণ শ্রান্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম
সেই ঘুম ঘুমাইব— আর কোন নাই আশা!

ত্রিংশ সর্গ

নলিনী

বড় সাধ গেছে মনে ভালবাসিবারে—
সখি, তোরা বল্ দেখি ভালবাসি কারে?
বসন্তে নিকুঞ্জবনে বেষ্টিত সহস্র মনে
নলিনী প্রাণের খেলা শুধু খেলিয়াছে,
খেলা ছাড়া সত্যকার জীবন কি আছে?
সে জীবন দেখিবারে বড় সাধ গেছে!
মনেতে মিশায়ে মন সচেতনে অচেতন
জগত হইয়া আসে মূহুছায়াময়,

দুটি মন চেয়ে থাকে, দোঁহে দোঁহা ঢেকে রাখে—
সজনি লো, সে বড় সুখের মনে হয় !
সে সুখ কি পাই যদি ভালবাসি কারে ?
বড় সাধ যায়, সখি, ভালবাসিবারে !
এত যে হৃদয় আছে, ভ্রমে নলিনীর কাছে—
নলিনীর মহে কি গো একটিও তার ?
যদি কারো দ্বারে যাই, কাঁদিয়া আশ্রয় চাই,
কেহই কি খুলিবে না হৃদয়ের দ্বার ?
হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া
খেলেছি মনের খেলা সকলে মিলিয়া—
সিংহাসন নিরমিত', আমারে বসায়ে দিত,
পদতলে ফুল তুলে দিত সবে আনি—
গরবে উন্মত্তহিয়া আপনারে বিসরিয়া
ভাবিতাম আমি বুঝি হৃদয়ের রাণী ?
চারি দিকে আমার হৃদয়-রাজধানী !
দিবস সায়াহ্ন হ'ল, বসন্ত ফুরায়,
খেলাবার দিন যবে অবসান-প্রায়,
মাথায় পড়িল বাজ— সহসা দেখিনু আজ
আমি কেহ নই, শুধু খেলাবার রাণী—
বালুকার 'পরে গড়া খেলা-রাজধানী !
নিতান্ত ভিখারী আজি দীনহীন বেশে সাজি
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমি আশ্রয়ের তরে,
সবাই ফিরায় মুখ উপেক্ষার ভরে।
খেলা যবে ফুরাইল কে কোথায় চ'লে গেল—
তাই বড় সাধ যায় ভালবাসিবারে।
সখি, তোরা বল দেখি ভালবাসি কারে ?

একত্রিংশ সর্গ

অনিল ও কবি

অনিল। একবার এস তুমি, চল গো হোথায়—
দেখে যাও কি হৃদয় দোলেছ দু-পায়!
যখন কোরক সবে, খোলে নাই আঁখি,
তখন হৃদয়ে তার বসিয়া একাকী
দিনরাত— দিনরাত বিষদন্ত বিঁধি
আহা সেই-সুকুমার কিশলয়হৃদি
বিন্দু বিন্দু রক্ত তার করেছ শোষণ!
কথাটি সে বলে নাই— মুখটি সে তুলে নাই,
হৃদয়ঘাতীরে হৃদে দিয়েছে আসন!
আজ সে যৌবনে যবে খুলিল নয়ন—
দেখিল হৃদয়ে তার নাই রক্তলেশ,
যৌবনের পরিমল হয়েছে নিঃশেষ!
কথাটি সে বলিল না— মুখটি সে তুলিল না,
দুর্ব্বল মাথাটি আহা পড়িল গো নুয়ে—
মাটিতে মিশাবে কবে, চেয়ে আছে ভু'য়ে!
এস তবে বিষকীট, দেখ'সে আসিয়া—
হলাহলময় হাসি মরিও হাসিয়া—
একটু একটু করি কি করে যেতেছে মরি,
একটি একটি দল পড়িছে খসিয়া!
বিষাক্ত নিশ্বাসে তব বিষাক্ত চুম্বনে
কি রোগ পশিল তার সুকোমল মনে?
তার চেয়ে কেন তীব্র অশনি আসিয়া
দারুণ চুম্বনে তারে ফেলে নি নাশিয়া!
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে জরি জরি হলাহলে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিরে শিরে হ'ত না দহিতে,
মনের ব্যথার 'পরে দংশন সহিতে!

মুহূর্ত্তের আলিঙ্গনে মরিত, ফুরাত—
মুহূর্ত্ত জলিয়া শেষে সকল জুড়াত!
যে কৌশলে ধীরে ধীরে   হৃদয়ের শিরে শিরে
দারুণ মৃত্যুর রস করেছ সঞ্চার,
সে কৌশল সফল যে হয়েছে তোমার!
তাই একবার এস—   দেখ'সে ত্বরায়
কেমন করিয়া তার জীবন ফুরায়!
নিদারুণ বিষ তব ফলে কি করিয়া,
জরিয়া মরিতে হ'লে মরে কি করিয়া!
সে বালা, আসন্ন তার দেখিয়া মরণ,
কাঁদিয়া তোমারি কাছে করেছে প্রেরণ!
এখনো চাও গো যদি, শেষ রক্তে তার
দিবে গো সে প্রক্ষালিয়া চরণ তোমার।
নিতান্ত দুর্ব্বল বুকে করিবে ধারণ
ওই তব নিরদয় কঠিন চরণ!
রক্তময় পদতলে বুক ফাটি গিয়া
নিতান্ত মরিবে বালা কথা না কহিয়া!
তবে এস, তার কাছে এস একবার—
আরম্ভ করিলে যাহা শেষ দেখ তার!

দ্বাত্রিংশ সর্গ

নলিনী

আজ আমি নিতান্ত একাকী—
কেহ নাই, কেহ নাই হায়!
শূন্য বাতায়নে বসি পথপানে চেয়ে থাকি,
সকলেই গৃহমুখে চ'লে যায়— চ'লে যায়!
নলিনীর কেহ নাই হায়!

পুরাণো প্রণয়ী-সাথে চোখে চোখে দেখা হ'লে
সরমে আকুল হ'য়ে তাড়াতাড়ি যায় চ'লে !
প্রণয়ের স্মৃতি শুধু অনুতাপ-রূপে জাগে,
ভুলিবারে চাহে যেন ভাল যে বাসিত আগে।
বিবাহ করেছে তারা, সুখেতে রয়েছে কিবা—
ভাই বন্ধু মিলি সবে কাটাইছে নিশি দিবা।
সকলেই সুখে আছে যে দিকে ফিরিয়া চাই,
আমি শুধু করিতেছি 'কেহ নাই— কেহ নাই'।
তাদের প্রেয়সী যদি মোরে দেখিবারে পায়
হাসিয়া লুকানো হাসি মোর মুখ-পানে চায়—
অবাক হইয়া তারা ভাবে কত মনে মনে,
"এই কি নলিনী সেই মুখে যার হাসি নেই,
বিষাদ-আঁধার জাগে জ্যোতিহীন দু-নয়নে !
এই কি নাথের মন হরেছিল একেবারে !"
কিছুতে সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে নারে !
হয়ত সে অভিমানে তুলিয়া পুরাণো কথা
নাথের হৃদয়ে তার দিতে চায় মনোব্যথা।
অমনি সে সসঙ্কোচে যেন অপরাধী-মত
মরমে মরিয়া গিয়া বুঝাইতে চায় কত !
সেদিন খেলিতেছিল নীরদের ছেলে দুটি,
কচি মুখে আধ' আধ' কথা পড়িতেছে ফুটি,
অযতনে কপালেতে পড়ে আছে চুলগুলি—
চুপিচুপি কাছে গিয়ে কোলেতে লইনু তুলি।
বুকেতে ধরিনু চাপি, হৃদয় ফাটিয়া গিয়া
পড়িতে লাগিল অশ্রু দর দর বিগলিয়া !
ডাগর নয়ন তুলি মুখপানে চেয়ে চেয়ে
কিছুখন পরে তারা চলিয়া গেল গো ধেয়ে !
আজ মোর কেহ নাই হায়,
সকলেরি গৃহ আছে, গৃহমুখে চ'লে যায়—
নলিনীর কিছু নাই হায় !

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ

পর্ণশয্যায় শয়ান মুরলা। চপলা

চপলা। কি করিয়া এত তুই হলি রে নিষ্ঠুর,
ললিতা সে, এত ভাল বাসিতিস যারে,
কি করিয়া ফেলি তারে যাবি দূর— দূর—
এতদিনকার প্রেম ছিঁড়ি একেবারে!
কবি তোরে এত ভাল বাসে যে মুরলে,
তারেও কি তুই, সখি, ফেলে যাবি চ'লে?

[কবি ও অনিলের প্রবেশ]

কবি। কি করিলি বল্ দেখি! কি করেছি তোর?
মুরলা রে, মুরলা রে, মুরলা আমার, হা— রে,
কি করেছি এত তুই হলি যে কঠোর?
প্রাণ মোর, মন মোর, হৃদয়ের ধন মোর,
সমস্ত হৃদয় মোর, জগৎ আমার—
একবার বল্ বালা, বল্ একবার
ছাড়িয়ে যাবি নে মোরে ফেলি এ সংসার-ঘোরে,
নিতান্ত এ হৃদয়েরে রাখি অসহায়।
আয়, সখি, বুকে থাক্, এই হেথা মাথা রাখ্,
হৃদয়ের রক্ত ফেটে বাহিরিতে চায়।
মুরলা, এ বুক তুই ত্যজিস্ নে আর—
চিরদিন থাক্, সখি, হৃদয়ে আমার!

মুরলা। লও কবি, এই লও, এই মাথা তুলে লও—
অবসন্ন এ মাথা যে পারি নে তুলিতে,
একবার রাখ সখা, রাখ ও কোলেতে!
নিতান্তই স্বার্থপর হৃদয় আমার,
অতি নীচ হীন হৃদি এই মুরলার—
নির্দ্দয়— নির্দ্দয় বড়— পাষাণ হ'তেও দড়,
ধূলি হ'তে লঘুতর হৃদয় আমার!

নহিলে কি ক'রে আমি, কবি, কবি মোর,
(হৃদয়ে ঘনায়ে ছিল কি মোহের ঘোর !)
স্নেহময় তোমারেও ত্যজি অনায়াসে
কি ক'রে আইনু চলি এ দূর প্রবাসে ?
ও করুণ নয়নের অশ্রুবারিধার
একবারো মনে নাহি পড়িল আমার ?
অমন স্নেহের পানে ফিরে না চাহিয়ে
পারিনু আঘাত দিতে ও কোমল হিয়ে ?
মার্জ্জনা করিও এই অপরাধ তার,
কবি মোর, শেষ ভিক্ষা এই মুরলার !
এমন দুর্ব্বল হৃদি, এত নীচ, হীন,
এমন পাষাণে গড়া, এতই সে দীন,
এ যে চিরকাল ধ'রে ছিল তব কাছে
এ অপরাধের, কবি, মার্জ্জনা কি আছে ?
সখা, অপরাধ সারা অস্তিত্ব তাহার—
মরণে করিবে আজি প্রায়শ্চিত্ত তার !
কেন আজ মুখখানি শীর্ণ ও মলিন—
বড় যেন শ্রান্ত দেহ, অতি বলহীন—
রাখ কবি, মাথা রাখ, এই বুকে মাথা রাখ,
একটু বিশ্রাম কর হৃদয়ে আমার !
ছি ছি সখা, কেঁদো নাকো, মুরলার কথা রাখো—
ও মুখে দেখিতে নারি অশ্রুবারিধার !

কবি। এত দিন এত কাছে ছিনু এক ঠাঁই,
মিলনের অবসর মোরা পাই নাই।
কে জানিত ভাগ্যে, সখি, ঘটিবে এমন
মরণের উপকূলে হইবে মিলন !

মুরলা। কি যে সুখ পেতেছি তা বলিব কি ক'রে—
বল সখা, এখনি কি যাব আমি ম'রে ?
এই মরণের দিন না যদি ফুরায়
মরিতে মরিতে যদি বেঁচে থাকা যায়—

দিন যায়, দিন যায়, মাস চলে যায়,
তবু মরণের দিন না যদি ফুরায়!
সখা ওগো, দাও মোরে, দাও মোরে জল—
দুখেতে হয়েছি শ্রান্ত, অতি দুরবল।

কবি। বিবাহ হইবে, সখি, আজ আমাদের—
দারুণ বিরহ ওই আসিবার আগে, সই,
অনন্ত মিলন হোক এই দুজনের!
আকাশেতে শত তারা চাহিয়া নিমেষহারা,
উহারা অনন্ত সাক্ষী রবে বিবাহের!
আজি এই দুটি প্রাণ হইল অভেদ,
মরণে সে জীবনের হবে না বিচ্ছেদ।
হোক তবে, হোক, সখি, বিবাহ সুখের—
চিতায় বাসরশয্যা হোক আমাদের!

মুরলা। তবে তুলে আন ত্বরা রাশি রাশি ফুল!
চিতাশয্যা হোক আজি কুসুমে আকুল!
রজনীগন্ধার মালা গাঁথ গো ত্বরায়,
সে মালা বদল করি দিও এ গলায়—
সেই মালা প'রে আমি তোমার সমুখে, স্বামি,
করিব শয়ন সুখে সুখের চিতায়!
সেই মালা প'রে যেন দগ্ধ হয় কায়!

[অনিলের ফুল আনিতে প্রস্থান

কবি গো, বড়ই সাধ ছিল মনে মনে
এক দিন কেঁদে নেব ধরি ও চরণে—
দেখি, কবি, পা-দুখানি দেখি একবার,
বড় সাধ গেছে মনে সুখে কাঁদিবার!
কই, ফুল এল না ত, আসিবে কখন?
এখনি ফুরায়ে পাছে যায় এ জীবন!
আরো কাছে এস কবি, আরো কাছে মোর—
রাখ হাত দুইখানি হাতের উপর!
কবি গো, স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই কভু

শেষদিনে এত সুখ হবে মোর প্রভু।
এখনো এল না ফুল! সখা গো আমার,
বড় যে হতেছি শ্রান্ত, পারি নে যে আর!

[ফুল লইয়া অনিলের প্রবেশ

[অনিলের প্রতি] ললিতা কেমন আছে বল ভাই বল!

অনিল। ললিতা কেমন আছে? সে আছে রে ভাল!

মুরলা। চিরকাল ভাল যেন থাকে আদরিণী,
চিরকাল পতিসুখে থাকে সোহাগিনী!
কথা ক' চপলা, সখি, মাথা খা আমার—
নীরবে নীরবে বসি কাঁদিস না আর!
মরণের দিনে দুঃখ র'য়ে গেল চিতে
হাসিখুশি মুখ তোর পেনু না দেখিতে!
সুখে থাক্— সখি, তুই চিরসুখে থাক্—
হাসিয়া খেলিয়া তোর এ জীবন যাক্!
ওই-যে এসেছে মালা— কবি গো, ত্বরায়
পরায়ে দাও গো তাহা এ মোর গলায়।
এই লও হাত মোর রাখ তব হাতে—
ছেলেবেলা হতে মোরে কত দয়া স্নেহ ক'রে
রেখেছ এ হাত ধরি তব সাথে সাথে,
আবার মোদের যবে হইবে মিলন
এ হাত আমার, কবি, করিও গ্রহণ—
যেথা যাবে সেথা রব, দুই জনে এক হব,
অনন্ত বাঁধনে রবে অনন্ত জীবন!

কবি। বিবাহ মোদের আজ হল এই তবে,
ফুল যেথা না শুকায় সদা ফুটে শোভা পায়
সেথায় আরেক দিন ফুলশয্যা হবে!

মুরলা। [কবিকে] এস কবি, বুকে এস!
[অনিলকে] এস ভাই, কাছে বস!
[চপলাকে] একটি চুম্বন, সখি,— বুঝি প্রাণ যায়,
এই শেষ দেখা এই দুখের ধরায়!

আসিছে আঁধার ঘোর— কবি, কোথা তুমি মোর !
আরো কাছে, আরো কাছে, এস গো হেথায় !
আজ তবে বিদায়, বিদায় !
স্বামি, প্রভু, কবি, সখা, আবার হইবে দেখা,
আজ তবে বিদায় বিদায় !

চতুস্ত্রিংশ সর্গ

শয্যায় শয়ান ললিতা। অনিলের প্রবেশ

ললিতার গান

বায়ু ! বায়ু ! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা
কৌতুকে আকুল !
আমি একটি জুঁই ফুল !
সারা রাত এ মাথায় প'ড়েছে শিশির—
গণেছি কেবল !
প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত, হে সমীর,
অতি হীনবল !
ভাঙ্গা বৃন্তে ভর করি রয়েছি জীবন ধরি
জীবনে উদাস !
ওগো উষার বাতাস !
শ্রান্ত মাথা পড়ে নুয়ে— চাহিয়া রয়েছে ভুঁয়ে
মর'-মর' একটি জুঁই ফুল্ল।
কাছেতে এস না স'রে— এখনি পড়িবে ঝ'রে
সুকুমার একটি জুঁই ফুল !
ও ফুল গোলাপ নয় সুষমাসুরভিময়,
নহে চাঁপা, নহে গো বকুল !

ও নহে গো মৃণালিনী তপনের আদরিণী,
ও শুধু একটি জুঁই ফুল !
ওরে আসিয়াছ দিতে কি সংবাদ হায়
হে প্রভাতবায় ?
প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে ?
হাসুক সরসে !
শিশিরে গোলাপগুলি কাঁদিছে হরষে ?
কাঁদুক হরষে !
ও এখনি বৃন্ত হ'তে কঠিন মাটিতে
পড়িবে ঝরিয়া —
শান্তিতে মরে গো যেন মরিবার কালে,
যাও গো সরিয়া !
মুখখানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে
দাঁড়াইয়া কাছে—
দেখিবারে— ক্ষুদ্র জুঁই মুখ নত করি
অভিমান ক'রে বুঝি আছে !
নয় নয়, তাহা নয়, সে সকল খেলা নয়—
ফুরায় জীবন !
তবে যাও, চ'লে যাও— আর কোন ফুলে যাও
প্রভাতপবন !
ওরে কি শুধাতে আছে প্রেমের বারতা
মর'-মর' যবে ?
একটি কহে নি কথা, অনেক সহেছে—
মরমে মরমে কীট অনেক বহেছে—
আজ মরিবার কালে শুধাইছ কেন ?
কথা নাহি ক'বে !
ও যখন মাটি-'পরে পড়িবে ঝরিয়া
ওরে ল'য়ে খেলাস নে তুই !
উড়ায়ে যাস নে ল'য়ে হেথা হ'তে হোথা !
ক্ষুদ্র এক জুঁই !

যেথাই খসিয়া পড়ে সেথা যেন থাকে প'ড়ে,
ঢেকে দিস শুকানো পাতায় !
ক্ষুদ্র যূঁই ছিল কিনা কেহই ত জানিত না,
মরিলেও জানিবে না তায় !
কাননে হাসিত চাঁপা, হাসিত গোলাপ
আমি যবে মরিতাম কাঁদি,
আজো হাসিবেক তারা শাখায় শাখায়
হাতে হাতে বাঁধি !
সে অজস্র হাসি-মাঝে সে হরষরাশি-মাঝে
ক্ষুদ্র এই বিষাদের হইবে সমাধি !

সমাপ্ত

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড।

(নাটিকা)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা

বা ল্মী কি য ন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই !
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই !
আগ্রহে অধীর হ'য়ে   ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই—
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই !

রুদ্রচণ্ড

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য— পর্ব্বতগুহা। রাত্রি

কালভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। মহাকালভৈরব-মূরতি,

শুন, দেব, ভক্তের মিনতি !

কটাক্ষে প্রলয় তব, চরণে কাঁপিছে ভব,

প্রলয়গগনে জ্বলে দীপ্ত ত্রিলোচন।

তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া,

অমাবস্যারাত্রি-রূপে ছেয়েছে ভুবন।

জটায় জলদরাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি,

দশনবিদ্যুত-বিভা দিগন্তে খেলায়।

তোমার নিশ্বাসে খসি নিভে রবি, নিভে শশী,

শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায়।

প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের শ্মশানেতে

প্রেতসহচরগণ ভ্রমে ছুটে ছুটে—

নিদারুণ অট্টহাসে প্রতিধ্বনি কাঁপে ত্রাসে,

ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুকে করপুটে।

প্রলয়মূরতি ধর’, থরহর সুর নর,

চারি পাশে দানবেরা করুক বিহার—

মহাদেব, শুন শুন নিবেদিনু পুনঃ পুন
আমি রুদ্রচণ্ড, চণ্ড, সেবক তোমার।
যে সঙ্কল্প আছে মনে সঁপিনু তা ও চরণে,
কৃপা করি লও দেব, লও তাহা তুলে।
এ দারুণ ছুরিখানি অর্ঘ্যরূপে দিনু আনি,
দু-দণ্ড এ ছুরিকাটি রাখ পদমূলে।
কৃপা তব হবে কবে মনোআশা পূর্ণ হবে,
মন হ'তে নেবে যাবে প্রতিজ্ঞা-পাষাণ!
সঙ্কল্প হইলে সিদ্ধ এ হৃদি করিয়া বিদ্ধ
নিজের শোণিত দিব উপহারদান!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য — অরণ্য। রুদ্রচণ্ড ও অমিয়া

রুদ্রচণ্ড।—

বার বার ক'রে আমি ব'লেছি, অমিয়া, তোরে
কবিতা আলাপ-তরে নহে এ কুটীর,
তবু তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ গাহি
বনের আঁধার চিন্তা দিস্ ভাঙ্গাইয়া!
পাতালের গূঢ়তম অন্ধতম অন্ধকার!
অধিকার কর' এর বালিকা-হৃদয়,
ও হৃদের সুখ আশা ও হৃদের উষালোক
মৃদুহাসি মৃদুভাব ফেল গো গ্রাসিয়া!
হিমাদ্রিপাষাণ চেয়ে গুরুভার মন মোর,
তেমনি উহার মন হোক গুরুভার!
হিমাদ্রিতুষার চেয়ে রক্তহীন প্রাণ মোর,
তেমনি কঠিন প্রাণ হউক উহার!

কুটীরের চারি দিকে ঘনঘোর গাছপালা
আঁধারে কুটীর মোর রেখেছে ডুবায়ে—
এই গাছে, কতবার দেখেছি, অমিয়া, তুই
লতিকা জড়ায়েছিল আপনার মনে—
মুকুলন্ত লতিকা যত ছিঁড়িয়া ফেলেছি রোষে,
এ সকল ছেলেখেলা পারি নে দেখিতে!
আবার কহি রে তোরে, বসি চাঁদ কবি-সনে
এ অরণ্যে করিস নে কবিতা-আলাপ!

অমিয়া।—

যাহা যাহা বলিয়াছ সব শুনিয়াছি পিতা—
আর আমি আনমনে গাহি না ত গান,
আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা,
আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না ত মালা!
কিন্তু পিতা, চাঁদ কবি, এত তারে ভালবাসি,
সে আমার আপনার ভায়ের মতন—
বল মোরে বল পিতা, কেন দেখিব না তারে!
কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা!
সেকি পিতা? তারে তুমি দেখেছ ত কত বার,
তবু কি তাহারে তুমি ভালবাস নাই!
এমন মূরতি যাহা, সে যেন দেবতা-সম,
এমন কে আছে তারে ভাল যে না বাসে!
এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে
এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে!
এই যে কুটীর এও কোল বাড়াইয়া দেয়,
অভ্যর্থনা করে নি যে কোন অতিথিরে!
ভ্রূকুটি কোরো না পিতা, ওই ভ্রূকুটির ভয়ে
সমস্ত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন।
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর— এই ভিক্ষা দাও পিতা,
এ ভালবাসায় মোর করিও না রোষ!

রুদ্রচণ্ড। মাতৃস্তন্য কেন তোর হয় নাই বিষ!
অথবা ভূমিষ্ঠশয্যা চিতাশয্যা তোর!

অমিয়া। তাই যদি হ'ত, পিতা, বড় ভাল হ'ত!
কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজলরাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ!
আগে ত লাগিত ভালো জোছনার আলো,
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছ, বকুলতলাটি—
ভ্রূকুটির ভয়ে তব ডরিয়া ডরিয়া
তাহাদেরো 'পরে মোর জন্মেছে বিরাগ!
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
বড়ই হরষে পিতা সব যাই ভুলে,
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়!
সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে!
সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই!

রুদ্রচণ্ড। বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরজীবী হউক সে অগ্নিকুণ্ডমাঝে!
মুখ ঢাকিস নে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন!

অমিয়া। ও কথা বোল' না পিতা—

রুদ্রচণ্ড। চুপ্, শোন্ বলি;
জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর,
পাণ্ডুবর্ণ আঁখি-মুদা ছিন্ন মুণ্ড তার

ওই বৃক্ষশাখা-'পরে দিব টাঙাইয়া,
ভিজিবে বর্ষার জলে, পুড়িবে তপনে
যতদিনে বাহিরিয়া না পড়ে কঙ্কাল!
শুনিয়া কাঁপিতেছিস, দেখিবি যখন
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি!
আপনার ভাই তোর! কে সে চাঁদ কবি!
হতভাগ্য পৃথ্বীরাজ, তারি সভাসদ!
সে পৃথ্বীরাজের হীন জীবন মরণ
এই ছুরিকার 'পরে রয়েছে ঝুলান'!

অমিয়া। থাম পিতা, থাম থাম, ও কথা বোলো না!
শত শত অভাগার শোণিতের ধারা
তোমার ছুরিকা ওই করিয়াছে পান,
তবুও— তবুও ওর মিটে নি পিপাসা?
কত বিধবার আহা কত অনাথার
নিদারুণ মর্ম্মভেদী হাহাকারধ্বনি
তোমার নিষ্ঠুর কর্ণ করিয়াছে পান,
তবুও তবুও ওর মিটে নি কি তৃষা?

রুদ্রচণ্ড। [আপনার মনে]—
মিটে নাই! মিটে নাই! মোরে নির্ব্বাসন!
রাজ্য ছিল, ধন ছিল, সব ছিল মোর,
আরো কত শত আশা ছিল এই হৃদে—
রাজ্য গেল, ধন গেল, সব গেল মোর,
কূলে এসে ডুবে গেল যত আশা ছিল!
শুধু এই ছুরি আছে, আর এই হৃদি
আগ্নেয় গিরির চেয়ে জলন্ত গহ্বর!
মোরে নির্ব্বাসন! হায়, কি বলিব পৃথ্বী,—
এ নির্ব্বাসনের ধার শুধিতাম আমি
পৃথ্বীতে থাকিত যদি এমন নরক
যন্ত্রণা জীবন যেথা এক নাম ধরে,
জীবননিদাঘে যেথা নাই মৃত্যুছায়া!

মোরে নির্ব্বাসন! কেন, কোন্ অপরাধে?
অপরাধ! শতবার লক্ষবার আমি
অপরাধ করি যদি কে সে পৃথ্বীরাজ!
বিচার করিতে তার কোন্ অধিকার!
নাহয় দুরাশা মোর করিতে সাধন
শত শত মানুষের লয়েছি মস্তক—
তুমি কর নাই? তোমার দুরাশাযজ্ঞে
লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহুতি?
লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ কর নি উচ্ছিন্ন?
লক্ষ লক্ষ রমণীরে কর নি বিধবা?
শুধু অভিমান তব তৃপ্ত করিবারে—
ভ্রাতা তব জয়চাঁদ, তার রাজ্য দেশ
ভূমিসাৎ করিতে কর নি আয়োজন?
পৃথ্বীতেই তোমার কি হবে না বিচার?
নরকের অধিষ্ঠাতৃদেব, শুন তুমি,
এই বাহু যদি নাহি হয় গো অসাড়,
রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,
তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ!
হৃদয় এমন মোর হয়েছে অধীর
পারি নে থাকিতে হেথা স্থির হ'য়ে আর!
চলিনু, অমিয়া, আমি— তুই থাক্ হেথা,
চলিনু গুহায় আমি করিগে ভ্রমণ।
শোন্, শোন্, শোন্ বলি, মনে আছে তোর—
চাঁদ কবি পুনঃ যদি আসে এ কুটীরে
জীবন লইয়া আর যাবে না সে ফিরে!

[প্রস্থান

অমিয়া। বড় সাধ যায় এই নক্ষত্রমালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রি বাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া—
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখী যদি হইতাম, দু-দণ্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া উষার আলোকে
একবার প্রাণ ভ'রে দিতেম সাঁতার!
আহা, কোথা চাঁদ কবি, ভাই গো আমার!
এ রুদ্ধ অরণ্য-মাঝে তোমারে হেরিলে
দু-দণ্ড যে আপনারে ভুলে থাকি আমি!

[রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ]

না— না পিতা, পায়ে পড়ি, পারিব না তাহা,
আর কি তাহারে কভু দেখিতে দিবে না?
কোন্ অপরাধ আমি করেছি তোমার
অভাগীরে এত কষ্ট দিতেছ যা লাগি!
কে জানে বুকের মধ্যে কি যে করিতেছে!
দাও পিতা, ওই ছুরি বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ভেঙে ফেল যাতনার এ আবাসখানা!
ওই ছুরি কত শত বীরের শোণিতে
মাথা তার ডুবায়েছে হাসিয়া হাসিয়া,

ক্ষুদ্র এই বালিকার শোণিত বর্ষিতে
ও দারুণ ছুরি তব হবে না কুণ্ঠিত!
হেসো না অমন করি, পায়ে পড়ি তব,
ওর চেয়ে রোষদীপ্ত ভ্রূকুটিকুটিল
রুদ্র মুখপানে তব পারি নেহারিতে!

রুদ্রচণ্ড। ঘুমাগে ঘুমাগে তুই, অমিয়া, ঘুমাগে—
একটু রহিব একা, তাও কি দিবি না?
আজ আমি ঘুমাব না, একেলা হেথায়
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রাত্রি করিব যাপন।
এনে দে কুঠার মোর, কাটিয়া পাদপ
এ দীর্ঘ সময় আমি দিব কাটাইয়া।
বিশ্রাম আমার কাছে দারুণ যন্ত্রণা!
বিশ্রাম, কালের প্রতি মুহূর্ত্ত যেমন
দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার।
মরুভূমিপথমাঝে পথিক যখন
দূর গম্যদেশে তার করিতে গমন
যত অগ্রসর হয়, দিগন্তবিস্তৃত
নব নব মরু যদি পড়ে দৃষ্টিপথে,
তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর,
তেমনি আমার সেই উদ্দেশ্যের মাঝে
প্রত্যেক মুহূর্ত্তকাল প্রত্যেক নিমেষ
অস্থির করিয়া তুলে হৃদয় আমার!

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

চাঁদ কবি ও অমিয়া

চাঁদ কবি। কেন লো অমিয়া, তোর কচি মুখখানি
অমন বিবন্ন হেরি, অমন গম্ভীর ?
আয়, কাছে আয়, বোন, শোন্ তোরে বলি,
গান শিখাইব ব'লে দুটি গান আমি
আপনি রচনা ক'রে এনেছি অমিয়া !
বনের পাখীটি তুই, গান গেয়ে গেয়ে
বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে সাজে—

অমিয়া। চুপ কর, ওই বুঝি পদশব্দ শুনি !
বুঝি আসিছেন পিতা ! না না, কেহ নয় !
শোন ভাই, এ বনে এস না তুমি আর !
আসিবে না ? তা হ'লে কি অমিয়ার সাথে
আর দেখা হবে নাক ? হবে না কি আর ?

চাঁদ কবি। কি কথা বলিতেছিস, অমিয়া, বালিকা !

অমিয়া। পিতা যে কি বলেছেন, শোন নাই তাহা—
বড় ভয় হয় শুনে, প্রাণ কেঁপে ওঠে !
কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হতে !
যেমন করিয়া হোক, কাটিবেক দিন—
অমিয়ার তরে, কবি, ভেবোনাক তুমি।

চাঁদ কবি। আমি গেলে বল্ দেখি, বোনটি আমার,
কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে ?
আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোর !

অমিয়া। কেহ না, কেহ না চাঁদ! আমি বলি ভাই,
পিতারে বুঝায়ে তুমি বোলো একবার!
বোলো তুমি অমিয়ারে ভালবাস বড়,
মাঝে মাঝে তারে তুমি আস দেখিবারে!
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো!
তুমি যদি ভাল করে বলো বুঝাইয়া,
নিশ্চয় তোমার কথা রাখিবেন পিতা!
বলিবে?

চাঁদ কবি। বলিব বোন! ও কথা থাকুক!—
সে দিন যে গান তোরে দেছিনু শিখায়ে,
সে গানটি ধীরে ধীরে গা' দেখি অমিয়া!

গান

রাগিণী— মিশ্র ললিত

অমিয়া। বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল
বসন্তলাবণ্যে সাজি গো—
একি হর্ষ— হর্ষ আজি গো!
উষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙা!
কুসুমভগিনীগণ চারি দিক হতে
আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে।

আকাশ সুনীল আজি কিবা,
অরুণনয়নে হাস্তবিভা,
বিমল শিশিরধৌত তনু
হাসিছে কুসুমরাজি গো—
একি হর্ষ— হর্ষ আজি গো!

মধুকর গান গেয়ে বলে,
'মধু কই, মধু দাও দাও!'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে, 'এই লও লও।'
বায়ু আসি কহে কানে কানে,
'ফুলবালা, পরিমল দাও!'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল,
'যাহা আছে সব লয়ে যাও!'
হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চায় বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটিকুটি,
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি—
নূতন জগত দেখি রে
আজিকে হরষ একি রে!

—

অমিয়া। সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার,
না জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন!

চাঁদ কবি। অমিয়া, তুই তা, বল্, বুঝিবি কেমনে!
তুই সুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি,
যখনি মেলিলি আঁখি, দেখিলি চাহিয়া—
শুষ্ক জীর্ণ পত্রহীন অতি সুকঠোর
বজ্রাহত শাখা -'পরে তোর বৃন্ত বাঁধা

একটিও নাই তোর কুসুমভগিনী,
আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি—
যেমনি মেলিলি আঁখি অমনি সভয়ে
মুদিতে চাহিলি বুঝি নয়নটি তোর।
না দেখিলি রবিকর, জোছনার আলো,
না শুনিলি পাখীদের প্রভাতের গান!
আহা বোন, তোরে দেখে বড় হয় মায়া!
মাঝে মাঝে ভাবি ব'সে কাজ-কর্ম ভুলি,
'এতক্ষণে অমিয়া একেলা বসে আছে,
বিশাল আঁধার বনে কেহ তার নাই!'
অমনি ছুটিয়া আসি দেখিবারে তোরে!
আরেকটি গান তোরে শিখাইব আজি,
মন দিয়ে শোন্ দেখি অমিয়া আমার!

গান

রাগিণী— মিশ্র গৌড়-সারঙ্গ

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার।
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর।
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা?
কেহ না— কেহ না!

মধুকর কাছে এসে বলে,
'মধু কই, মধু চাই চাই।'

ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে, 'কিছু নাই নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও'
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে, 'আর কিবা আছে!'
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
খর দৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে,
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

অমিয়া। ওই আসিছেন পিতা, লুকাও লুকাও,
পায়ে পড়ি— লুকাও লুকাও এই বেলা,
একটি আমার কথা রাখ চাঁদ কবি!
সময় নাইক আর— ওই আসিছেন,
কি হবে? কি হবে ভাই? কোথা লুকাইবে?

[রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ]

পিতা, পিতা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে;
আপনি এসেছি আমি চাঁদ কবি -কাছে,
চাঁদের কি দোষ তাহে বল পিতা, বল!
এসেছিনু, কিছুতেই পারি নি থাকিতে—
নিজে এসেছিনু আমি, চাঁদের কি দোষ?

রুদ্রচণ্ড। অভাগিনী!

চাঁদ কবি। রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা।

অমিয়া। থাম চাঁদ, কোন কথা বোলো না পিতারে,
থাম থাম।

চাঁদ কবি। রুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা!

অমিয়া। পিতা, পিতা, এই পায়ে পড়িলাম আমি,

যাহা ইচ্ছা কর তাই এখনি— এখনি।
চেয়ো না চাঁদের পানে অমন করিয়া।

চাঁদ কবি। দাঁড়াম্থ কৃপাণ এই পরশ করিয়া—
সূর্য্যদেব, সাক্ষী রহ, আমি চাঁদ কবি
আজ হতে অমিয়ার হমু পিতা মাতা।
তোর সাথে অমিয়ার সমস্ত বন্ধন
এ মুহূর্ত্ত হতে আজ ছিন্ন হয়ে গেল।
মোর অমিয়ার কেশ স্পর্শ কর যদি
রুদ্রচণ্ড, তোর দিন ফুরাইবে ভবে!

[অমিয়ার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন
উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও রুদ্রচণ্ডের পতন]

রুদ্রচণ্ড। সম্বর সম্বর অসি, থাম চাঁদ, থাম!
কি! হাসিছ বুঝি! বুঝি ভাবিতেছ মনে,
মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচণ্ড!
জানিস নে মরণের ব্যবসায়ী আমি!
জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আজ
শত বার মৃত্যু এই হইল আমার!
রুদ্রচণ্ড যে মুহূর্ত্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে
রুদ্রচণ্ড সে মুহূর্ত্তে গিয়াছে মরিয়া!
আজ আমি মৃত সে রুদ্রের নাম লয়ে
কেবল শরীর তার, কহিতেছি তোরে—
এখনো জীবনে মোর আছে প্রয়োজন!
এখনো— এখনো আছে! এখনো আমার
সঙ্কল্প রয়েছে হ'য়ে দারুণ তৃষিত!
রুদ্রচণ্ড তোর কাছে ভিক্ষা মাগিতেছে
আর কি চাহিস চাঁদ? দিবি মোরে প্রাণ?

[অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ
চাঁদ কবির প্রতি]

দূত। মহাশয়, আসিতেছি রাজসভা হতে!
নিমেষ ফেলিতে আর নাই অবসর!
প্রতি মুহূর্ত্তের 'পরে অতি ক্ষীণ সূত্রে
রাজ্যের শুভাশুভ করিছে নির্ভর!
প্রশ্নোত্তর করিবার নাইক সময়!

[সত্বর উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। অনুগ্রহ ক'রে মোরে চ'লে গেল চাঁদ!
গৃহে ব'সে ভাবিতেছে প্রসন্নবদনে
রুদ্রচণ্ডে বাঁচালেম অনুগ্রহ ক'রে?
অনুগ্রহ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ করা!
এ অনুগ্রহের ছুরি মর্ম্মের মাঝারে
—যত দিন বেঁচে রব— রহিবে নিহিত!
দিনরাত্রি রক্ত মোর করিবে শোষণ।
দুগ্ধপোষ্য শিশু চাঁদ— তার অনুগ্রহ!
ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়!
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে
তখনি ধূলায় এরে করিব নিক্ষেপ,
চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব'।

[অমিয়ার প্রবেশ]

আবার রাক্ষসি, তুই আবার আইলি!
এ সংসারে আছে যত আপনার ভাই—

সকলেরে ডেকে আন্, পিতার জীবন
সে কুক্কুরদের মুখে করিস নিক্ষেপ।
পিতার শোণিত দিয়ে পুষিস তাদের।
দূর হ রাক্ষসি, তুই এখনি দূর হ।

অমিয়া। পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি
দূর হয়ে যাইতেছি এ কুটীর হ'তে—
বোলো না, অমন ক'রে বোলো না আমারে।
বুঝিতে পারি নে যে গো কি আমি করেছি।
চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছিনু—
কেন পিতা, তার তরে এত শাস্তি কেন ?

রুদ্রচণ্ড। চুপ কর্, 'কেন' 'কেন' শুধাস নে আর।
'দূর হ রাক্ষসি' এই আদেশ আমার !
দিনরাত্রি, পাপিয়সি, 'কেন কেন' করি
করিস নে মোর আদেশের অপমান।

অমিয়া। কোথা যাব পিতা, আমি পথ যে জানি নে।
কারেও চিনি নে আমি— কি হবে আমার !
পিতা গো, জান ত তুমি, অমিয়া তোমার
নিতান্ত নির্ব্বোধ মেয়ে কিছু সে বুঝে না—
না বুঝে করেছে দোষ ক্ষমা কর তারে।

রুদ্রচণ্ড। হতভাগী !

অমিয়া। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা !
আজ রাত্রে দূর ক'রে দিও না আমারে,
এক রাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে।

রুদ্রচণ্ড। শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিস তুই !
দুই ফোঁটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস !
এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্ তুই।
অশ্রুজলধারা মোর দু-চক্ষের বিষ।

আর নয়, শোন্ শেষ আদেশ আমার—
দূর হ রে—

অমিয়া। ধর পিতা, ধর গো আমায়—

রুদ্রচণ্ড। ছুঁস্ নে, ছুঁস্ নে মোরে, রাক্ষসি, ছুস্ নে।

[অমিয়ার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন ও তাহাকে তুলিয়া লইয়া বনান্ত-উদ্দেশে রুদ্রচণ্ডের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

অমিয়া। রাজপথে প্রাসাদসম্মুখে

অমিয়া। আর ত পারি না, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ।
বহিছে বহুক ঝড়, পড়ুক অশনি,
ঘোর অন্ধকার মোরে ফেলুক গ্রাসিয়া।
এ কি এ বিদ্যুৎ মাগো! অন্ধ হ'ল আঁখি।
চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার!
সারাদিন উপবাসে পথে পথে ভ্রমি
'চাঁদ চাঁদ' ব'লে আমি খুঁজেছি তোমায়।
কোথাও পেনু না কেন ভাই গো আমার?
অতি ভয়ে ভয়ে গেছি পান্থদের কাছে—
শুধায়েছি, কেহ কেন বলে নি আমারে?
এ প্রাসাদ যদি হয় তাঁহারি আলয়!
যদি গো এখনি চাঁদ বাহিরিয়া আসে,
হেথা মোরে দেখিয়া কি করেন তা হ'লে?

হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার।
উহু কি বাতাস! শীতে কাঁপি থর থর!
যদি না থাকেন তিনি, আর কেহ এসে
যদি কিছু বলে মোরে, কি করিব তবে?
কে আছ গো, দ্বার খোল— আমি নিরাশ্রয়,
অমিয়া আমার নাম, এসেছি দুয়ারে।

দ্বার খুলিয়া একজন। কে তুই?

অমিয়া। [সভয়ে] অমিয়া আমি।

দ্বাররক্ষক। হেথা কেন এলি?

অমিয়া। চাঁদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেথা?
বড় শ্রান্ত ক্লান্ত আমি চাহি গো আশ্রয়।

দ্বাররক্ষক। এ রাত্রে দুয়ারে মিছা করিস নে গোল।
হেথা ঠাঁই মিলিবে না, দূর হ ভিখারী।

[দ্বাররোধন। একটি পান্থের প্রবেশ]

পান্থ। উঃ! একি মুহুর্মুহু হানিছে বিদ্যুৎ!
এ দুর্য্যোগে পথপার্শ্বে কে বসিয়া হোথা?
এমন বহিছে ঝড়, গর্জ্জিছে অশনি,
আজ রাত্রে গৃহ ছেড়ে পথে কে রে তুই!
[কাছে আসিয়া]
একি বাছা, হেথা কেন একেলা বসিয়া?
পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংসারে?

অমিয়া। [কাঁদিয়া উঠিয়া]
ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
অমিয়া আমার নাম, বড় শ্রান্ত আমি,
সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ।

পান্থ। আয় মা, আমার সাথে আয় মোর ঘরে।

অরণ্যে আমার কুঁড়ে, বেশি দূর নয়।
আহা দাঁড়াবার বল নাই যে চরণে।
আয়, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে যাই।

অমিয়া। চাঁদ কবি, ভাই মোর, তারে জান তুমি?
কোথায় থাকেন তিনি পার কি বলিতে?

পান্থ। জানি নে মা, কোথাকার কে সে চাঁদ কবি।
আমরা বনের লোক, কাঠ কেটে খাই,
নগরে কে কোথা থাকে জানিব কি ক'রে?
চল্ মা, আজি এ রাত্রে মোর ঘরে চল্।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাঁদ কবি। শিবির

চাঁদ কবি। সহস্র থাকুক কাজ, আজ একবার
অমিয়ারে না দেখিলে নারিব থাকিতে।
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা
হয়ত সে সহিছে দ্বিগুণ অত্যাচার।
তোর দুঃখ গেনু আমি দূর করিবারে,
ফেলিনু দ্বিগুণ কষ্টে অমিয়া আমার।
জানিলি নে, অভাগিনী, সুখ কারে বলে!
শাসনের অন্ধকারে, অরণ্যবিজনে,
পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে
দারুণ কটাক্ষে তার থরথর কাঁপি
দিনরাত্রি রয়েছিস ম্রিয়মাণ হয়ে।
প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী—
কবে এ আঁধার রাতি ফুরাইবে তোর?

ওই মুখখানি নিয়ে প্রফুল্ল নয়নে
গান গাবি, খেলাইবি প্রশান্ত হৃদয়ে!
এই যুদ্ধ শেষ হলে, অভাগিনী তোরে
আনিব রে নিষ্ঠুর পিতার গ্রাস হতে।
আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে,
এতদিনকার দুঃখ দিব দূর ক'রে।
রাজপুত ক্ষত্রিয়েরে করিবি বিবাহ,
ভালবেসে দুই জনে কাটাবি জীবন।
অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল
দুঃস্বপ্নের মত শুধু পড়িবেক মনে।

[দূতের প্রবেশ]

মহাশয়, এসেছে এসেছে শত্রুগণ,
তিন ক্রোশ দূরে তারা ফেলেছে শিবির।
রাত্রিযোগে অলক্ষ্যেতে এসেছে তাহারা,
সহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা।

চাঁদ। চল তবে— বাজাও বাজাও রণভেরী।
সৈন্যগণ, অস্ত্র লও, উঠাও শিবির।
দুয়ারে এসেছে শত্রু, বিলম্ব সহে না।
দাও মোরে বর্ম্ম দাও, অশ্ব ল'য়ে এস।
ত্বরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী।

[কোলাহল]

সপ্তম দৃশ্য

বন

[একজন দূতের প্রবেশ]

দূত। একি ঘোর স্তব্ধ বন, একি অন্ধকার!
চারি দিকে ঝোপঝাপ, পথ নাই কোথা!
ওই বুঝি হবে তার আঁধার কুটীর,
ওইখানে রুদ্রচণ্ড বাস করে বুঝি!

[রুদ্রচণ্ডের প্রবেশ]

দূত। প্রণাম!
রুদ্র। কে তুই!
দূত। আগে কুটীরেতে চল!
এ:ক একে সব কথা করি নিবেদন!
রুদ্র। পথ ভুলে বুঝি তুই এসেছিস্ হেথা?
আমি রুদ্রচণ্ড, এই অরণ্যের রাজা।
নগরনিবাসী তোরা হেথা কেন এলি?
ঐশ্বর্য্যমাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিস,
ননীর পুঁতুল যত ললনারে লয়ে
আবেশে মুদিত আঁখি, গদ গদ ভাষা,
ফুলের পাপড়ি 'পরে পড়িলে চরণ
ব্যথায় অধীর হয়ে উঠিস যে তোরা—
নগরফুলের কীট হেথা তোরা কেন?
আমি পৃথ্বীরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড।
মৃদু মিষ্ট কথা শুনি আহ্লাদে গলিয়া
রাজ্যধন উপহার দিই নাক আমি!

বিশাল রাজসভার ব্যাধি তোরা যত
আমার অরণ্যে কেন করিলি প্রবেশ ?
পুষ্টদেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি
কুটীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক ?
মনে কি করিলি এই অরণ্যবাসীরে
দুটা অনুগ্রহবাক্যে কিনিয়া রাখিবি ?
তাই আজ প্রাতঃকালে স্বর্ণময় বেশে
বিশাল উষ্ণীষ এক বাঁধিয়া মাথায়
এলি হেথা ধাঁধিবারে দরিদ্রনয়ন ?
জানিস কি, বনবাসী এই রুদ্রচণ্ড—
যতেক উষ্ণীষধারী আছয়ে নগরে
সবার উষ্ণীষে করে শত পদাঘাত !

দূত। রুদ্রচণ্ড, মিছা কেন করিতেছ রোষ !
উপকার করিতেই এসেছি হেথায় !

রুদ্র। বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ ,
তোমরা নগরবাসী স্ফীতদেহ সবে
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত !
তোমাদের নগরের বালক সে চাঁদ
উপকার করিতে আসেন তিনি হেথা,
উপকার ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে !
এত উপকার তিনি করেছেন মোর
আর কারো উপকারে আবশ্যক নাই !

দূত। রুদ্রচণ্ড, বুঝি তুমি ভ্রমে পড়িয়াছ,
আমি নহি পৃথ্বীরাজ-রাজ-সভাসদ।
রাজরাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী
তিনিই আমারে হেথা করেন প্রেরণ—
অধীর হোয়ো না, সব শোন একে একে—
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিছেন তিনি,
বহুদূর পর্য্যটনে শ্রান্ত সৈন্যদল—
থাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন—

আজ এক রাত্রি-তরে এ অরণ্যমাঝে
রাজরাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয় !

রুদ্র। কি বলিলি দূত ! তোর মহম্মদ ঘোরী,
পৃথ্বীরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেথা !

দূত। এ বনে ত লোক নাই ? ধীরে কথা কও !

রুদ্র। ধীরে ক'ব ! যাব আমি নগরে নগরে,
ঊর্দ্ধকণ্ঠে কব আমি রাজপথে গিয়া,
'ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ !'

দূত। শোন রুদ্র, পৃথ্বী তব রাজ্যধন কেড়ে
নির্ব্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে—

রুদ্র। সংবাদের-আবর্জ্জনা-ভিক্ষুক কুক্কুর,
এ সংবাদ কোথা হতে করিলি সংগ্রহ ?

দূত। ধৈর্য্য ধর। পৃথ্বী তব রাজ্যধন লয়ে
নির্ব্বাসিত করেছেন এ অরণ্যদেশে !
প্রতিহিংসা সাধিবার সাধ থাকে যদি
এই তার উপযুক্ত হয়েছে সময়।
মহম্মদ ঘোরী হেথা—

রুদ্র। মহম্মদ ঘোরী ?
কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ় !
এত দিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস।
আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া ?
যেমন পৃথ্বীর শত্রু মহম্মদ ঘোরী
তেমনি আমারো শত্রু কহি তোরে দূত !
পৃথ্বীর রাজত্ব প্রাণ এসেছে কাড়িতে,
সমস্ত জগৎ মোর ছিনিতে এসেছে।
এখনি নগরে যাব কহি তোরে আমি।

অন্তত বারতা এই করিব প্রচার।

[কৃপাণ খুলিয়া রুদ্রচণ্ডকে দূতের সহসা আক্রমণ
উভয়ের যুদ্ধ ও দূতের পতন]

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্য। পথ

[নেপথ্যে গান]

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।
চাহিয়া দেখিল চারি ধার!
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর,
নিরদয় অসীম সংসার।
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা!
কেহ না, কেহ না!
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে
খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে—
ফুলটির মৃদুপ্রাণ হায়
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

[নেপথ্যে]

উত্তরের পথ দিয়া চল সৈন্যগণ!

[সেনাপতিগণ সৈন্যগণ ও চাঁদ কবির প্রবেশ]

চাঁদ কবি। অমিয়ার কণ্ঠ যেন শুনিনু সহসা,
এ মধ্যাহ্নে রাজপথে সে কেন আসিবে ?
সেনাপতি। সৈন্যগণ হেথা এসে দাঁড়াইলে কেন ?
বিশ্রাম করিতে কভু এই কি সময় ?
দ্বিতীয় সেনাপতি। শুনিনু যবনগণ যুঝে প্রাণপণে—
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত।
এখনো রয়েছে তারা সাহায্যের আশে,
নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে।
চাঁদ কবি। তবে চল, চল ত্বরা, আর দেরি নয় !

[গমনোদ্যম। অমিয়ার প্রবেশ]

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ— ভাই মোর—
সৈন্যগণ। কে তুই ! দূর হ !
সেনাপতি। স'রে দাঁড়া, পথ ছাড়্, চল সৈন্যগণ !
চাঁদ কবি। [স্তম্ভিত হইয়া] অমিয়া রে—
সেনাপতি। চাঁদ কবি, এই কি সময় !
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেনু একি পথের ধারেতে ?
চল চল, বাজাও, বাজাও রণভেরী !
চাঁদ। [যাইতে যাইতে] অমিয়া রে, ফিরে এসে—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি !

রণবাদ্য। প্রস্থান

[অমিয়ার অবসন্ন হইয়া পতন]

নবম দৃশ্য

নগর। রুদ্রচণ্ড

রুদ্র। বেধেছে তুমুল রণ; কোথা পৃথ্বীরাজ!
ওরে রে সংগ্রামদৈত্য শোণিতপিপাসী,
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজে রেখে দিস এ ছুরিকা-তরে।
পৃথ্বীরাজ আছে কোন্ শিবিরে না জানি!
ভ্রমিতেছি তার তরে প্রভাত হইতে।
আজ তার দেখা পেলে পুরাইব সাধ।
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে,
সম্মুখে, দক্ষিণে বামে সহস্র বর্ব্বর
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া!
চারি দিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন,
বাতায়ন হতে চেয়ে শত শত আঁখি!
এত লোক, এত গোল সহ্য নাহি হয়!

[একজন পান্থের প্রতি]

কে গো তুমি মহাশয়, মুখপানে মোর
একেবারে চেয়ে আছ অবাক্ হইয়া?
কখন কি দেখ নাই মানুষের মুখ?
যেথা যাই শত আঁখি মোর মুখ চেয়ে,
আঁখিগুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে!
যেথা হেরি চারি দিকে সূর্য্যের আলোক,
নয়ন বিঁধিছে মোর বাণের মতন!
একটু আড়াল পাই, একটু আঁধার,
বাঁচি তবে দুই দণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া!

একি হেরি ? ঊর্দ্ধশ্বাসে নাগরিকগণ
কোথায় ছুটেছে সব অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ?
ওগো পান্থ, বল মোরে ত্বরা ক'রে বল,
মরেছে কি পৃথ্বীরাজ ? ত্বরা ক'রে বল !

পান্থ। কে তুই অসভ্য বন্য, কোথা হতে এলি ?
অকল্যাণ বাণী যদি উচ্চারিস মুখে
রসনা পুড়াব তোর জ্বলন্ত অঙ্গারে !

[প্রস্থান

রুদ্র। [আর একজনের প্রতি]
শোন পান্থ, বল মোরে কোথা যাও সবে,
রণক্ষেত্রে অমঙ্গল ঘটে নি ত কিছু !

[উত্তর না দিয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। [একজন পান্থকে ধরিয়া]
অসভ্য বর্ব্বর যত, বল্ মোরে বল্ !
ছাড়িব না, যতক্ষণ না দিবি উত্তর !
বল্ শুধু পৃথ্বীরাজ রয়েছে বাঁচিয়া !

[বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইয়া পান্থের প্রস্থান

রুদ্র। নগরকুক্কুর যত মরুক— মরুক !
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল,
যুদ্ধের হুঙ্কার শুনে ডরিয়া মরুক !
নবনীগঠিত যত সুখের শরীর—
নিজের অস্ত্রের ভারে পিষিয়া মরুক !
ঐশ্বর্য্যধূলায় অন্ধ নগরের কীট
নিজের গরবে ফেটে মরুক— মরুক !

দশম দৃশ্য

অমিয়া। পথ

অমিয়া। চ'লে গেল!— সকলেই চ'লে গেল গো!
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্ত্তের তরে দেখা হল যদি,
চ'লে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া?
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো?
অমিয়া রে, এত কি নির্ব্বোধ তুই মেয়ে?
সকলেরি কাছে কি করিস অপরাধ?
পিতা তোরে জন্মতরে করিলেন ত্যাগ,
চাঁদ কবি ভাই তোর স্নেহের সাগর,
তাঁরো কাছে আজ কি রে হলি অপরাধী?
তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ?
কেহ তোর রহিল না অকূল সংসারে?
কে আছে গো, ক্ষুদ্র এই শ্রান্ত বালিকারে
একবার নেবে গো স্নেহের কোলে তুলে?
এই ত এসেছি সেই অরণ্যের পথে।
যাব কি পিতার কাছে? যদি রুষ্ট হন!
আবার আমারে যদি দেন তাড়াইয়া!
যাহা ইচ্ছা করিবেন, তাঁরি কাছে যাই!
ধরিয়া চরণ তাঁর রহিব পড়িয়া!
মা গো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর!
প্রাণের বন্ধন বুঝি ছিঁড়ে গেল সব!

চাঁদ, চাঁদ, ভাই মোর, দেখা হল যদি,
একবার ডাকিলে না 'অমিয়া' বলিয়া !

[প্রস্থান

একাদশ দৃশ্য

নাগরিকগণ

প্রথম। সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া—
শুনিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের।

দ্বিতীয়। অস্ত্রভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা
আয় সবে ত্বরা ক'রে, সময় যে নাই !
নগরদুয়ারে গিয়া দাঁড়াই আমরা।

সকলে। এখনি— এখনি চল যে আছ যেখানে !

তৃতীয়। চিতানল গৃহে গৃহে জ্বালাইতে বল,
নগরশ্মশানে আজ রমণীরা যত
প্রাণবিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা !

চতুর্থ। মরণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জ্বালি শোণিতমদিরা
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

[দূতের প্রবেশ]

দূত। শোন, শোন, পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন।

সকলে। বন্দী ?

প্রথম। রাজরাজ মহারাজ বন্দী আজি ?

দ্বিতীয়। লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে !

তৃতীয়। ভেঙে ফেল অট্টালিকা!

চতুর্থ। ভস্ম কর এ

সকলে। সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনানগরী।

দ্বাদশ দৃশ্য

রুদ্রচণ্ড

রুদ্রচণ্ড। এখনো ত কিছু তার পেনু না সংবাদ
পৃথ্বীরাজ মরেছে কি রয়েছে বাঁচিয়া।
হীন প্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ!
ঋণ-করা প্রাণ আর বহিতে পারি না,
কবে তোরে ত্যাগ ক'রে বাঁচিব আবার!
ছিছি, তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম,
জীবন নামেতে এক মরণ পাইনু!
অদৃষ্ট রে, আরো কি চাহিস করিবারে?
অনুগ্রহ 'পরে মোর জীবন রাখিলি!
অনুগ্রহ— শিশু চাঁদ, তার অনুগ্রহ!

[একটি দূতের প্রবেশ]

দূত। বন্দী পৃথ্বীরাজ আজ হত হয়েছেন।

রুদ্রচণ্ড। [চমকিয়া]—
হত? সে কি কথা? মিথ্যা বলিস নে মূঢ়!
মরে নি সে, মরে নি, মরে নি পৃথ্বীরাজ।

এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়,
বল্ তুই, এখনো সে আছে পৃথ্বীরাজ।
কোথা যাস বল্ তুই এখনো সে আছে!

দূত। সহসা উন্মাদ আজি হলে নাকি তুমি?
বন্দীভাবে পৃথ্বীরাজ হত হয়েছেন
যারে বলি সেই মোরে মারিতে উদ্যত,
কিন্তু হেন রোষ আমি দেখি নি ত কারো।

[প্রস্থান

রুদ্রচণ্ড। [ছুরি নিক্ষেপ করিয়া]—
মুহূর্ত্তে জগৎ মোর ধ্বংস হ'য়ে গেল।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন!
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচণ্ড, আর কেহ নয়।
যে দুরন্ত দৈত্যশিশু দিন রাত্রি ধ'রে
হৃদয়মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন—
এ মুহূর্ত্তে মরে গেল সেই বৎস মোর!
তারি নাম রুদ্রচণ্ড, আমি কেহ নই।
আয়, ছুরি, আয় তবে, প্রভু গেছে তোর—
এ শূন্য আসন তাঁর ভেঙ্গে ফেল্ তবে।

[বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া]
ভেঙ্গে ফেল্, ভেঙ্গে ফেল্, ভেঙ্গে ফেল্ তবে।

[অমিয়ার প্রবেশ]

অমিয়া। পিতা, পিতা, অমিয়ারে ক্ষমা কর পিতা!

[চমকিয়া স্তব্ধ]

রুদ্রচণ্ড। আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা!
এত দিন পিতা তোর ছিল না এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর!
আহা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে!
আর তোরে দুঃখ পেতে হবে না, বালিকা,
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন।

অমিয়া। [রুদ্রচণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া]—
ও কথা বোলো না পিতা, বোলো না, বোলো না—
অমিয়ার এ সংসারে কেহ নাই আর।
তাড়ায়ে দিয়েছে মোরে সমস্ত সংসার,
এসেছি পিতার কোলে বড় শ্রান্ত হয়ে।
যেথা তুমি যাবে পিতা যাব সাথে সাথে,
যা তুমি বলিবে মোরে সকলি শুনিব,
তোমারে তিলেক-তরে ছাড়িব না আর।

রুদ্রচণ্ড। আয় মা আমার তুই থাক্ বুকে থাক্।
সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিনু!
এখন সময় মোর ফুরায়ে এসেছে,
আজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা?
আশীর্ব্বাদ করি, বাছা, জন্মান্তরে যেন
এমন নিষ্ঠুর পিতা তোর নাহি হয়!
অমিয়া মা, কাঁদিস্ নে, থাক্ বুকে থাক্!

ত্রয়োদশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

ভ্রমিব সন্ন্যাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে।
অদৃষ্ট রে, একি তোর নিদারুণ খেলা,
এক দিনে করিলি কি ওলট্‌পালট্‌!
কিছু রাখিলি নে আজ, কাল যাহা ছিল!
পৃথ্বীরাজ, রাজদণ্ড, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
হাসি-কান্না-লীলা-ময় নগর নগরী,
অচল অটল কাল ছিল বর্ত্তমান,
আজ তার কিছু নাই! চিহ্ন মাত্র নাই!
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত,
এই যে মানুষগণ করে কোলাহল,
একি সব শ্মশানেতে মরীচিকা আঁকা!
মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে মিলাইয়া যায়,
জগতের শ্মশান বাহির হ'য়ে পড়ে!
চিতার কোলের পরে অস্থিভস্মমাঝে
মানুষেরা নাট্যশালা করেছে স্থাপন!
সন্ন্যাসী, কোথায় যাস্‌ শ্মশানে ভ্রমিতে!
নগর নগরী গ্রাম সকলি শ্মশান!
পৃথ্বীরাজ, তুমি যদি গেলে গো চলিয়া,
কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার!
যত দিন বেঁচে রব' যশোগান তব
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াব গাহিয়া।
কুটীরের রমণীরা কাঁদিবে সে গানে,
বালকেরা ঘেরি মোরে শুনিবে অবাক্‌!

দেশে দেশে সে গান শিখিবে কত লোক,
মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ,
দিশে দিশে সে নামের হবে প্রতিধ্বনি !
এই এক ব্রত শুধু রহিল আমার,
জীবনের আর সব গেছে ধ্বংস হ'য়ে !
আহা সে অমিয়া মোর, সে কি বেঁচে আছে ?
তার তরে প্রাণ বড় হয়েছে অধীর !
চৌদিকে উঠিছে যবে রণকোলাহল,
চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা,
করুণ সে মুখখানি, দীনহীন বেশ,
আঁখির সামনে ছিল ছবির মতন !
আকাশের পটে আঁকা সে মুখ হেরিয়া
ভীষণ সমরক্ষেত্রে কাঁদিয়াছি আমি !
তার সেই 'চাঁদ' 'চাঁদ' স্নেহের উচ্ছ্বাস,
কানেতে বাজিতেছিল আকুল সে স্বর !
একটি কথাও তারে নারিনু বলিতে ?
মুখের কথাটি তার মুখে র'য়ে গেল,
একটি উত্তর দিতে পেনু না সময় ?
চাহিয়া পাষাণদৃষ্টি আইনু চলিয়া !
পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল ?
যাই সে অরণ্যমাঝে যাই একবার !

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

চাঁদ কবি

চাঁদ কবি । উহু, কি নিস্তব্ধ বন, হাহা করে বায়ু,
পদশব্দে প্রতিধ্বনি উঠিছে কাঁদিয়া !

আশঙ্কায় দেহ যেন উঠিছে শিহরি,
অতিশয় ধীরে ধীরে পড়িছে নিঃশ্বাস !
এই যে কুটীর সেই, সাড়াশব্দ নাই,
গোপন কি কথা ল'য়ে স্তব্ধ আছে যেন !
কাঁপিছে চরণ মোর ! যাব কি ভিতরে ?

[দ্বার উদ্ঘাটন
গৃহমধ্যে রুদ্রচণ্ডের মৃতদেহ ও মুমূর্ষু অমিয়া]

অমিয়া, অমিয়া মোর, স্নেহের প্রতিমা !
চাঁদ কবি, ভাই তোর এসেছে হেথায়।

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ, আইলে কি ? এস কাছে এস—
কখন্ আসিবে তুমি সেই আশা চেয়ে
বুঝি এতক্ষণ প্রাণ যায় নি চলিয়া !
কত দিন কত রাত্রি পথে পথে খুঁজি
দেখা হল, ছুটে গেনু ভায়ের কাছেতে,
একবার দাঁড়ালে না ? চলে গেলে চাঁদ ?
না জানি কি অপরাধ করেছে অমিয়া !
আজ, চাঁদ, জীবনের শেষ দণ্ডে মোর
শুনিতে ব্যাকুল বড় সে কি অপরাধ !
দেখিতে পাই নে কেন ? কোথা তুমি ভাই ?
সংসার চোখের 'পরে আসিছে মিলায়ে।
ত্বরা ক'রে বল চাঁদ, সময় যে নাই,
একবার দাঁড়ালে না, চলে গেলে ভাই ?

[মৃত্যু]

চাঁদ কবি। একি হ'ল, একি হ'ল, অমিয়া, অমিয়া,
এক মুহূর্তের তরে রহিলি না তুই ?
করুণ অন্তিম প্রশ্ন মুখে রয়ে গেল,
উত্তর শুনিতে তার দাঁড়ালি নে বোন ?

যত দিন বেঁচে রব ওই প্রশ্ন তোর
কানেতে বাজিবে মোর দিবস রজনী,
জীবনের শেষ দণ্ডে ওই প্রশ্ন তোর
শুনিতে শুনিতে বালা মুদিব নয়ন।
অমিয়া, অমিয়া মোর, ওঠ্‌ একবার।
প্রশ্ন শুধাবারে শুধু বেঁচেছিলি বোন,
এক দণ্ড রহিলি নে উত্তর শুনিতে ?
ভাল বোন, দেখা হবে আর-এক দিন,
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা।

সমাপ্ত

কালমৃগয়া

কাল-মৃগয়া।

(গীতি-নাট্য।)

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে
অভিনয়ার্থ
রচিত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।
অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

মূল্য চারি আনা।

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

[ঋষিকুমারের প্রবেশ]

মিশ্র ভূপালী— খং

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়!
লীলা লীলা, খেলাবি আয়।

[লীলার প্রবেশ]

মিশ্র খাম্বাজ— কাওয়ালি

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি!
ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি!
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল।
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল!

মিশ্র খাম্বাজ— আড়খেমটা

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মত
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—
ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দ'লে পায়!

মিশ্র বিভাস— আড়খেমটা

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা
যাব নদীর কূলে—
শিব গড়িয়ে করব পূজো,
আনব কুসুম তুলে।
ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।
লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধ'রে,
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে!
ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই ফিরে—
একলা আছেন অন্ধ পিতা
আঁধার কুটীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

মিশ্র সিন্ধু— ঢিমে তেতালা

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া,
দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযু বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!
সকলে। এস সবে এস সখি,
মোরা হেথা ব'সে থাকি।
প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি!
সকলে। আঁখি-'পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

রাগিণী মিশ্র কেদারা— একতালা

সকলে। ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়'
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

ছায়ানট— আদ্ধা

প্রথম। নেহার' লো সহচরি,
কানন আঁধার করি,
ওই দেখ বিভাবরী আসিছে।

দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।

তৃতীয়। আয়, সখি, এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।

চতুর্থ। ওই দেখ নলিনী উথলিত সরসে
অস্ফুট-মুকুল-মুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।

সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচয়নে,
ফুটায়ে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে!

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্য্যতি দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥

তস্য প্রাচী দিগ্‌ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্ব্বৎসঃ স য এতমেবং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্র রোদং রোদিতি সোহহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্॥

জয়জয়ন্তী— ঝাঁপতাল

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে রে বাছা তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে।

[মেঘগর্জ্জন]

দেশ— ঢিমে তেতালা

না না কাজ নাই, যেও না বাছা,—
গভীরা রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে !
কেহ নাই, কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে—
তোরেও কি হারাব বাছা রে,
সে ত প্রাণে স'বে না !

খাম্বাজ— ঢিমে তেতালা

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি,
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

গৌড়মল্লার— কাওয়ালি

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী,
দিক-ললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে।
ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী,
গুরু গুরু নীরদগরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে—
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড় কড় বাজ!

[প্রস্থান

[বনদেবীগণের প্রবেশ]

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে। ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে।
দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা—

তৃতীয়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে!
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

মল্লার— কাওয়ালি

সকলে। আয় লো সজনি, সবে মিলে!
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জ্জন,
এ বরষা-দিনে,
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকাদোলায় দুলে!
প্রথম। ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন।
দ্বিতীয়। মাথাব বরণ ফুলে ফুলে।
তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লবশ্যাম-দুকূলে।
দ্বিতীয়। নাচিব, সখি, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে!

[ঋষিকুমারের প্রবেশ]

গারা— কাওয়ালি

ঋষিকুমার। কি ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা!
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে
সরযূতটিনী-তীরে—
কোথায় সে পথ!
ওই কল কল রব!

আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বরা।

বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে!
কি জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা!

ঋষিকুমার। না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা।
পিতা আমার কাতর তৃষায়,
যেতেছি তাই সরযূনদীতীরে।

মিশ্র বেলাওল— একতালা

বনদেবীগণ। মানা না মানিলি, তবুও চলিলি,
কি জানি কি ঘটে!
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে!
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্,
যা ঘরে যা ছুটে!
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয়স্নেহছায়ায়!
অয়ি বিভাবরী, রাখ বুকে ধরি
ভয় অপহরি রাখ এ জনায়!
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়!

পঞ্চম দৃশ্য

[শিকারীগণের প্রবেশ]

ইমন কল্যাণ— কাওয়ালি

বনে বনে সবে মিলে চল হো ! চল হো !
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয় !
এমন রজনী বহে যায় রে !
ধনু বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয়, আয়, আয়, আয় রে !
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে —
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

[দশরথের প্রবেশ]

সিন্ধুড়া

শিকারীগণ। জয়তি জয় জয় রাজন্ বন্দি তোমারে,
কে আছে তোমা সমান।
ত্রিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
তোমারে করি প্রণাম !

দশরথ। [শিকারীদের প্রতি]

বাহার

গহনে গহনে যা রে তোরা,
নিশি ব'হে যায় যে!
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ্ গে!
এই বেলা যা রে!
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—
ধনুর্ব্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল আলো
এই বেলা আয় রে!

[প্রস্থান

অহং— কাওয়ালি

প্রথম শিকারী। চল চল, ভাই,
ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন, সে বন।
তৃতীয়। চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই— কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
তৃতীয়। বরা'! বরা'!
প্রথম। আরে দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার।
চুপিচুপি আয়, চুপিচুপি আয়
অশথতলায়—
এবার ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে সবে থাক্—
সাবধান, ধর বাণ, সাবধান, ছাড় বাণ—

২।৩ জন। গেল গেল ওই ওই পালায় পালায়—
চল্ চল্—
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই।
[প্রস্থান

[বিদূষকের সভয়ে প্রবেশ]

দেশ— খেমটা

প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কি!
বাবা রে!
আমি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা,
দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না—
বাহাবা, সাবাস তোরে,
সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে
ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে!
মনে আশা ছিল মস্ত
চলবে ভাল দক্ষিণ হস্ত—
হা রে রে পোড়া কপাল,
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি!

[শিকারীগণের প্রবেশ]

শঙ্করা

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়—
তোমার আশায় সবাই ব'সে।

শিকারেতে হবে যেতে,
মিছি কোমর বাঁধ ক'ষে!
বন বাদাড়.সব ঘেঁটেঘুঁটে,
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!

বিদূষক। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!
শিকার করতে যায় কে মরতে—
ঢুঁ সিয়ে দেবে বরা' মোষে!
ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না,
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে।

[হাসিতে হাসিতে শিকারীগণের প্রস্থান

মিশ্র সিন্ধু

বিদূষক। আঃ, বেঁচেছি এখন!
শর্ম্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন।
বাবা! দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি
কে জানে কখন।
চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
চক্ষুদুটো মশাল-পারা,
গোঁ ভরে হেঁট-মুখে তাড়া
করে সে যখন—
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপসে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি
শঙ্কাতে তখন। [প্রস্থান

[শিকার স্কন্ধে শিকারীগণের প্রবেশ]

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার!
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার!
বনবাদাড় তোলপাড়,
করেছি রে উজাড়!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

[বনদেবীদের প্রবেশ]

মিশ্র মল্লার— পোস্ত

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া!
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে!
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণনয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
বিপদ ঘনছায়া ছাইয়া।
কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া!

[প্রস্থান

[দশরথের প্রবেশ]

খাম্বাজ— কাওয়ালি

না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন।
কোথা গেল সে করিশিশু, কোথা লুকাল!
একে ত জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন!
যাক্-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
যাব পিছে পিছে—
না না না না, ও কি শুনি!
ওই সে সরযূতীরে করিছে সলিল পান
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ!

নেপথ্যে বনদেবীগণ

ভৈরবী

হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল!
[বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন]

বেহাগ— আড়াঠেকা

কি করিনু হায়!
এ ত নয় রে করিশিশু, ঋষির তনয়!
নিঠুর প্রখর বাণে রুধিরে আপ্লুতকায়
কার রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায়!
কি কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
কি মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ!
দেবতা, অমৃতনীরে হারা-প্রাণ দাও ফিরে,
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায়!

[মুখে জলসিঞ্চন]

খট— ঝাঁপতাল

ঋষিকুমার। কি দোষ করেছি তোমার,
কেন গো হানিলে বাণ!

একই বাণে বধিলে যে
দুটি অভাগার প্রাণ!
শিশু বনচারী আমি
কিছুই নাহিক জানি—
ফল মূল তুলে আনি,
করি সামবেদ গান!
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে—
কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেও,
এ দেহ তাঁর কোলে দিও—
দেখো, দেখো ভুলোনাকো,
কোরো তাঁরে বারিদান!
মার্জ্জনা করিবেন পিতা,
তাঁর যে দয়ার প্রাণ!

[মৃত্যু]

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

মিশ্র ঝিঁঝিট খাম্বাজ— মধ্যমান

অন্ধঋষি। আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে—
হা তাত, একবার আয় রে!

ঘোরা রজনী, একাকী
কোথা রহিলে এ সময়ে !
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে—
কী হবে কে জানে !

[লীলার প্রবেশ]

রামকেলী— কাওয়ালি

বল বল পিতা, কোথা সে গিয়েছে !
কোথা সে ভাইটি মম, কোন্‌ কাননে !
কেন তাহারে নাহি হেরি !
খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তবু কেন এখন না এল ?
বনে বনে ফিরি 'ভাই' 'ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে !

বেহাগ— কাওয়ালি

অন্ধ। কে জানে কোথা সে !
প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি !
একা হেথা, কুটীরদুয়ারে—
বাছা রে এলি নে !
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে—
জল আনিয়ে কাজ নাই,
তুই যে আমার পিপাসার জল !
কেন রে জাগিছে মনে ভয় !
কেন আজি তোরে,
হারাই হারাই মনে হয় !
কে জানে !

[লীলার প্রস্থান

[মৃতদেহ লইয়া দশরথের প্রবেশ]

সিন্ধু— চৌতাল

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলি রে!
হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে!
কোথা ছিলি বনে, এ ঘোর রাতে,
এ দুর্য্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি!
আছি সারানিশি হায় রে
পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর—
দে মুখে বারি, কাছে আয় রে!

রাজবিজয়ী

দশরথ। অজ্ঞানে কর হে ক্ষমা, তাত, ধরি চরণে—
কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে!
আঁধারে সন্ধানি শর খরতর
করী-ভ্রমে বধি তব পুত্রবর,
গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে!

[দশরথ-কর্ত্তৃক ঋষির নিকটে
ঋষিকুমারের মৃতদেহ-স্থাপন]

বাহার— ঢিমে তেতালা

অন্ধ। কি বলিলে, কি শুনিলাম, একি কভু হয়!
এই যে জল আনিবারে গেল সে সরযূতীরে—
কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয়!
সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে,
আছে কি নিঠুর কেহ বধিবে যে তারে!
না না না, কোথা সে আছে— এনে দে আমার কাছে,
সারা নিশি জেগে আছি বিলম্ব না সয়!

এখনো যে নিরুত্তর— নাহি প্রাণে ভয়!
রে দুরাত্মা— কী করিলি—

[অভিশাপ]

পুত্রব্যসনজং দুঃখং
যদেতন্মম সাংপ্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন
রাজন্ কালং করিষ্যসি॥

মিশ্র ভূপালি— কাওয়ালি

দশরথ। ক্ষমা কর মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জনা নাহি কি মোর!
ও! সহে না যাতনা আর,
শান্তি পাইব কোথায়—
তুমি কৃপা না করিলে
নাহি যে কোন উপায়!
আমি দীন হীন অতি—
ক্ষম ক্ষম কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ
এ পাপের পাথারে।

কাফি— আড়াঠেকা

অন্ধ। আহা, কেমনে বধিল তোরে!
তুই যে স্নেহের পুতলি, সুকুমার শিশু ওরে!
বড় কি বেজেছে বুকে, বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধূলাতে কেন লুটায়ে, রাখিব বুকে ক'রে!

[কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও
অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া
দশরথের প্রতি]

ঝিঁঝিট

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে !

[পুত্রের প্রতি]

প্রভাতী

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাশরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি !
যাও রে অনন্তধামে, অমৃতনিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদারপ্রাণে !
দেব-ঋষি, রাজ-ঋষি, ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে এক তানে !
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে !

[যবনিকাপতন]

[পুনরুত্থান]

[ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ— একতালা

সকলি ফুরাল স্বপনপ্রায়,
কোথা সে লুকাল, কোথা সে হায় !
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
ও !   সব হেরি শূন্যময়,
কোথা সে হায় !
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল,
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও !   সে আর আসিবে না,
কোথা সে হায় !

যবনিকাপতন

সমাপ্ত

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র ১৮০৫ শক।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মনের বাগান-বাড়ি

ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে; হৃদয়ের যেখানে দেবত্রভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।

যাহাকে তুমি ভালবাস তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না; তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না। হাসির হীরা দাও, অশ্রুর মুক্তা দাও; হাসির বিদ্যুৎ দিও না, অশ্রুর বাদল দিও না। প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান তাহাকেই তুমি অমৃত দাও, যাহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাকেই অমৃত দাও। কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে— আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।

যাঁহাকে তুমি ভালবাস তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের সমস্তটা দেখাইও না। যেখানে তোমার হৃদয়ের পয়ঃপ্রণালী, যেখানে আবর্জ্জনা, যেখানে জঞ্জাল, সেখানে তাঁহাকে লইয়া যাইও না; তাহা যদি পার' তবে আর তোমার কিসের ভালবাসা! তাঁহাকে তোমার হৃদয়ের এমন অঞ্চলের টিকিট্ ক্রয় করিবে যেখানে ম্যালেরিয়া নাই, ওলাউঠা নাই, বসন্ত নাই। তাঁহাকে যে বাড়ি দিবে তাহার দক্ষিণ দিকে খোলা, বাতাস আনাগোনা করে, বড় বড় ঘর, সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে। ইহা যে করে সেই যথার্থ ভালবাসে। এমন স্বার্থপর প্রণয়ী বোধ করি নাই যে মনে করে তাহার প্রণয়ীকে তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাঁশঝাড়ে ঘুরাইয়া, সমস্ত পচাপুকুরে স্নান করাইয়া, না বেড়াইলে যথার্থ ভালবাসা হয় না। অনেকের মত তাহাই বটে, কিন্তু সঙ্কোচে পারিয়া উঠে না। এ বড় অপূর্ব্ব মত।

অনেকে বলিয়া উঠিবেন, "এ কিরকম কথা ; যাঁহাকে তুমি খুব ভালবাস, যাঁহাকে নিতান্ত আত্মীয় মনে করা যায়, তাঁহার নিকটে মনের কোন ভাগ গোপন করা কি উচিত ?" উচিত নহে ত কি ? সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় "নিজের" নিকটে স্বভাবতঃ অনেকটা গোপন করিতে হয়। না করিলে চলে না, না করিলে মঙ্গল নাই। প্রকৃতি যাহাদের চক্ষে পাতা দেন নাই, যাহারা আবশ্যকমত চোক বুজিতে পারে না, মনে যাহা কিছু আসে, যে অবস্থাতেই আসে, তাহাদের কুম্ভীরচক্ষে পড়িবেই, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দশা। আমরা অনেক মনোভাব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না, চোক বুজিয়া যাই। এরূপ করিলে সে ভাবগুলিকে উপেক্ষা করা হয়, অনাদর করা হয়। ক্রমে তাহারা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এই ভাবগুলি প্রবৃত্তিগুলি যদি ঢাকিয়া রাখা না যায়— পরস্পরের কাছে প্রকাশ করিয়া, বৈঠকখানার মধ্যে, কথাবার্ত্তার মধ্যে তাহাদের ডাকিয়া আনা হয়— তাহাদের সহিত বিশেষ চেনাশুনা হইয়া যায়— তাহাদের কদর্য্য মূর্ত্তি এমন সহিয়া যায় যে আর খারাপ লাগে না— সে কি ভাল ? ইহাতে কি তাহাদের অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয় না ? একে ত যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভাল জিনিষ দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিষ দিলে মন্দ জিনিষের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া, প্রহার দেওয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে ?

দোকানে-হাটে রাস্তায়-ঘাটে যাহাদের সঙ্গে আমাদের সচরাচর দেখাশুনা হয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানান কাজের সম্বন্ধ। তাহাদের সঙ্গে আমাদের নানা সাংসারিক ভাবের আদান প্রদান চলে। পরস্পরে দেখাশুনা হইলে, হয় কথাই হয় না, নয় অতি তুচ্ছ বিষয়ে কথা হয়, নয় কাজের কথা চলে। ইহারা ত সাধারণ মনুষ্য। কিন্তু এমন এক এক জনকে আমার চোখের সামনে আমার মনের প্রতিবেশী করিয়া রাখা উচিত, যে আমার আদর্শ মনুষ্য। সে যে সত্যকার আদর্শ মনুষ্য এমন না হইতে পারে ; তাহার মনে যতটুকু আদর্শভাব সেইটুকু সে আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার অন্য কোন কাজকর্ম্মের সম্পর্ক নাই, কেনা বেচার সম্বন্ধ নাই, দলিল দস্তাবেজের আত্মীয়তা নাই। আমি তাহার নিকট আদর্শ, সে আমার নিকট আদর্শ। আমার মনের বাগান-বাড়ি তাহার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি, সে তাহার বাগানটি আমার জন্য রাখিয়াছে। এ বাগানের কাছে কদর্য্য কিছুই নাই, দুর্গন্ধ কিছুই নাই। পরস্পরের উচিত, যাহাতে নিজের নিজের বাগান পরস্পরের নিকট রমণীয় হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। যত ফুলগাছ রোপণ করা যায়, যত কাঁটা-গাছ উপড়াইয়া ফেলা হয়, ততই ভাল। এত বাণিজ্য ব্যবসায় বাড়িতেছে, এত

কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে, যে, গাছপালা-ফুলে-ভরা হাওয়া খাইবার জমি করিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত তোমার মনের এক অংশে গাছপালা রোপণ করিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে তোমার প্রিয়তম তোমার মনের মধ্যে আসিয়া মাঝে মাঝে হাওয়া খাইয়া যাইতে পারেন। সে স্থানে অস্বাস্থ্যজনক দূষিত কিছু না থাকে যেন, যদি থাকে তাহা আবৃত করিয়া রাখিও।

সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভালবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন এক জনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চ্চা হইতে থাকে। ভালবাসার খাতিরে লোককে মনের মধ্যে ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়, ইহাতে তাহার নিজের মনের স্বাস্থ্য-সম্পাদন হয়, আর তাহার মনোবিহারী বন্ধুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত উপযোগী। নিজের মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জমিটুকু অন্যকে দেওয়ার, ভালবাসা ছাড়া অমন আর কে করিতে পারে? তাই বলিতেছি ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ করা নহে, ভালবাসা অর্থে ভাল বাসা, অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা। যাঁহাদের হৃদয়কাননের ফুল শুকাইয়াছে, ফুলগাছ মরিয়া গিয়াছে, চারি দিকে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে, এমন সকল অনুর্ব্বরহৃদয় বিজ্ঞ বৃদ্ধেরাই ভালবাসার নিন্দা করেন।

গরীব হইবার সামর্থ্য

অনেকের গরীব-মানুষি করিবার সামর্থ্য নাই। এত তাহাদের টাকা নাই যে, গরীব-মানুষি করিয়া উঠিতে পারে। আমার মনের এক সাধ আছে যে, এত বড় মানুষ হইতে পারি যে, অসঙ্কোচে গরীব-মানুষি করিয়া লইতে পারি! এখনো এত গরীব মানুষ আছি যে গিল্‌টি-করা বোতাম পরিতে হয়, কবে এত টাকা হইবে যে সত্যকার পিতলের বোতাম পরিতে সাহস হইবে! এখনো আমার রূপার এত অভাব যে অন্যের সমুখে রূপার থালায় ভাত না খাইলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। এখনো আমার স্ত্রী কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাহার গায়ে আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক আয় বাঁধিয়া দিতে হয়! আমার বিশ্বাস ছিল রাজশ্রী ক বাহাদুর খুব বড়-মানুষ লোক। সে দিন তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম তিনি নিজে গরীব

উপরে বসেন ও অভ্যাগতদিগকে নীচে বসান, তখন জানিতে পারিলাম যে তাঁহার গরীব-মানুষি করিবার মত সম্পত্তি নাই। এখন আমাকে যেই বলে যে, ক রায়-বাহাদুর মস্ত বড়মানুষ লোক, আমি তাহাকেই বলি, "সে কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে তিনি গদীর উপর বসেন কেন?" উপার্জ্জন করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, অনেক টাকা করিয়াছি, কিন্তু এখনো এত বড়মানুষ হইতে পারিলাম না যে আমি যে বড়মানুষ এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারিলাম। সর্ব্বদাই মনে হয় আমি বড়মানুষ। কাজেই আংটি পরিতে হয়, কেহ যদি আমাকে রাজাবাহাদুর না বলিয়া বাবু বলে, তবেই চোক রাঙাইয়া উঠিতে হয়। যে ব্যক্তি অতি সহজে খাবার হজম করিয়া ফেলিতে পারে, যাহার জীর্ণ খাদ্য অতি নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে শরীরের রক্ত নির্ম্মাণ করে, সে ব্যক্তির চব্বিশ ঘণ্টা 'আহার করিয়াছি' বলিয়া একটা চেতনা থাকে না। কিন্তু যে হজম করিতে পারে না, যাহার পেট ভার হইয়া থাকে, পেট কামড়াইতে থাকে, সে প্রতি মুহূর্ত্তে জানিতে পারে যে, হাঁ, আহার করিয়াছি বটে। অনেকের টাকা আছে বটে, কিন্তু নিঃশব্দে টাকা হজম করিতে পারে না, পরিপাকশক্তি নাই— ইহাদের কি আর বড়মানুষ বলে! ইহাদের বড়মানুষি করিবার প্রতিভা নাই। ইহারা ঘরে ছবি টাঙায় পরকে দেখাইবার জন্য; শিল্পসৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্য ঘরটাকে একেবারে ছবির দোকান করিয়া তুলে। ইহারা গণ্ডা গণ্ডা গাহিয়ে বাজিয়ে নিযুক্ত রাখে, পাড়াপ্রতিবেশীদের কানে তালা লাগাইয়া দেয়, অথচ যথার্থ গান বাজনা উপভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। এই সকল চিনির বলদদিগকে প্রকৃতি গরীব মনুষ্য করিয়া গড়িয়াছেন। কেবল কতক-গুলা জমিদারী ও টাকার থলিতে বেচারাদিগকে বড়মানুষ করিবে কি করিয়া?

কিন্তু-ওয়ালা

বড়মানুষির কথা হইতে আরেক কথা মনে পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ বড়মানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে এ কথা পুরানো হইয়া গিয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন, অনেক জল থাকিলে মেঘ নামিয়া আসে, অনেক ফল ফলিলে গাছ নুইয়া পড়ে। গল্প আছে, নিউটন বলিয়াছেন তিনি জ্ঞানসমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়াইয়াছেন। নিউটন নাকি বিশেষ বড়মানুষ লোক, তিনি ছাড়া এ কথা যে-সে লোকের মুখে আসিত না, গলায় বাঁধিয়া যাইত। অতএব দেখা যাইতেছে যাহারা

স্বভাবতঃ গরীব, প্রায় তাহারা অহঙ্কারী হইয়া থাকে। ইহাও সহ্য হয়, কিন্তু এমন গরীবও আছে যাহারা প্রাণ খুলিয়া পরের প্রশংসা করিতে পারে না। প্রকৃতি সে ক্ষমতা তাহাদের দেন নাই। এমন লোক সংসারে পদে পদে দেখা যায়। এরূপ স্বভাব কাহাদের হয়? সকলে যদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন – যাহারা স্বাভাবিক অহঙ্কারী অথচ নিজের এমন কিছু নাই যাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারে, তাহারাই এইরূপ করিয়া থাকে। একটা ভাল কবিতাপুস্তক দেখিয়াই তাহাদের মনে হয় 'আমিও এইরূপ লিখিতে পারি', অথচ তাহারা কোন জন্মে কবিতা লিখে নাই। অহঙ্কার করিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না, অথচ প্রশংসা করাও দায় হইয়া পড়িয়াছে। সে বলিতে চায়, এ কবিতাটি বেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেয়েও ভাল কবিতা একটি আছে, অর্থাৎ সে কবিতাটি এখনো লেখা হয় নাই, কিন্তু লেখা যাইতেও পারে। ভাল কবিতাটি বাহির করিতে পারে না নাকি, সেই জন্য তাহার গায়ের জ্বালা ধরে। সুতরাং প্রশংসার মধ্যে একটা হুলবিশিষ্ট 'কিন্তু'র কীট না রাখিয়া থাকিতে পারে না। একটা যে বিকটাকার 'কিন্তু' রাহু তাহার সকল প্রশংসাই গ্রাস করিয়া থাকে, সে রাহুটি আর কেহ নহে, সে তাহার অঙ্গহীন 'আমি', তাহার অপরিতৃপ্ত ক্ষুধিত অহঙ্কার। সে দৈত্য, তাহার প্রশংসাসুধা খাইবার অধিকার নাই, এই জন্য সকল সুধাকর চাঁদকে মলিন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার নিজের জ্ঞান আছে সে একটা মস্ত লোক, অথচ প্রমাণ দিয়া অপরকে তাহা বুঝাইতে পারিতেছে না, সুতরাং সে সকলের যশকেই অসম্পূর্ণ রাখিয়া দেয়। সে মনে করে, 'আমার ভাবী যশের জন্য অথবা ন্যায্য যশের জন্য অনেকটা জায়গা করিয়া রাখা উচিত। আমি ত নিজে কোন যশের কাজ করিতে পারি নাই, অন্যের কোন কাজকেই যখন খাতিরেই আনি না, তখন লোকদের বুঝা উচিত যে, হাতে-কলমে যদি কাজে প্রবৃত্ত হই তবে না জানি কি কারখানাই হয়!' সে মনে করে যে, সেই ভাবী সম্ভাবিত যশের জন্য একটা সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত, অন্যান্য সকলের যশের রত্নগুলি ভাঙিয়া এই সিংহাসনটি প্রস্তুত করা আবশ্যক। 'কিন্তু'-নামক অস্ত্র দিয়া সকলের যশ হইতে রত্নগুলি ভাঙিয়া ইহারা রাখিয়া দেয়। আহা, এ বেচারীরা কি অসুখী! ইহাদের এ রোগ নিবারণ হয়, যদি সত্য সত্য ন্যায্য উপায়ে ইহারা যশ উপার্জন করিতে পারে। ইহাদের এমন স্বভাব নাই যে পরের প্রশংসা করিতে পারে, এমন শিক্ষা নাই যে পরের প্রশংসা করিতে পারে, এমন সম্বল নাই যে পরের প্রশংসা করিতে পারে— যে দিকে চাহি সেই দিকেই দারিদ্র্য। অনেক বড়মানুষ অহঙ্কারী আছে যাহাদের পরের প্রশংসা

করিবার মত সম্বল আছে, কিন্তু এমন হতভাগ্য দরিদ্র অহঙ্কারী আছে যে নিজের অহঙ্কার করিতেও পারে না আবার পরের প্রশংসা করিতেও পারে না। ইহাদের 'কিন্তু'-পীড়িত প্রশংসাতে কেহ যেন ব্যথিত না হন, কারণ ইহাতে তাহাদেরই দারিদ্র্য প্রকাশ করে। এই 'কিন্তু'গুলি তাহাদেরই ভিক্ষার ঝুলি। বেচারী যশ উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, এই নিমিত্ত তোমার উপার্জ্জিত যশ হইতে কিছু অংশ চায়, তাই 'কিন্তু'র ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছে।

দয়ালু মাংসাশী

বাঙ্গালীদের মাংস খাওয়ার পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমার বিশ্বজনীন প্রেম, সকলের প্রতি দয়া এত প্রবল যে, আমি মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য কাজ মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব পূর্ণ-আত্মার মধ্যে লীন করিয়া দেওয়াই সাধনার চরম ফল! পূর্ণতর জীবের মধ্যে অপূর্ণতর জীবের নির্ব্বাণমুক্তি প্রার্থনীয় নহে ত কি? একটা পশুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, সে মানুষ হইয়া গেল; মানুষের জীবনীশক্তিতে অভাব পড়িলে একটা পশু তাহা পূরণ করিতে পারিল; মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া গিয়া মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সুখ, স্বাস্থ্য, উত্তম তেজ নির্ম্মাণ করিতে পারিল, ইহা কি তাহার সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয়! প্রথমতঃ সে নিজে স্বপ্নের অগোচর সম্পূর্ণতা লাভ করিল, দ্বিতীয়তঃ মানুষের মত একটা উন্নত জীবকে সম্পূর্ণতর করিল। ছাগলদের মধ্যে এমন দার্শনিক কি আজ পর্য্যন্ত কেহ জন্মায় নাই, যে তাহার লম্বা দাড়ি নাড়িয়া সমবেত শিশুশিশুবর্গকে এই নির্ব্বাণমুক্তির সম্বন্ধে ভ্যাকরণ-শুদ্ধ উপদেশ দেয়! আহা, যদি কেহ এমন ছাগহিতৈষী জন্মিয়া থাকে তবে তাহার নিকট আমার ঠিকানাটা পাঠাইয়া দিই এবং সেই সঙ্গে লিখিয়া দিই যে, জ্ঞানালোকিত ইয়ং-ছাগদের মধ্যে যাঁহার মুক্তিকামনা আছে তিনি উক্ত ঠিকানায় আগমন করিলে সদয়হৃদয় উপস্থিত লেখক মহাশয় তাঁহাকে মুক্তিদানপূর্ব্বক বাধিত করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, পশুদের উপকার করিবার জন্য, ব্যয়সাধ্য হইলেও, দয়ার্দ্রচিত্ত লোকদের মাংস খাওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহাদের মত এই যে,

ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজত্ব অর্থাৎ পকত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি ইংরাজদের মধ্যে একেবারে লীন হইয়া যাইতে পারে, তবে সুখের বিষয় হয়।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাই, যেমন ছাগল, ভেড়া, গরু। অধিক উদাহরণের আবশ্যক নাই— মুসলমানেরা আমাদের খাইয়াছেন, ইংরাজেরা আমাদের খাইতেছেন। যদি প্রমাণ হইল যে, আমরা বোকা জানোয়ারের মাংস খাইয়া থাকি, তবে দেখা যাক— বোকা জানোয়ারেরা কি খায়। তাহারা উদ্ভিজ্জ খায়। অতএব উদ্ভিজ্জ যাহারা খায় তাহারা বোকা। এমন দ্রব্য খাইবার আবশ্যক? নির্বোধদের আমরা গাধা, গরু, মেড়া, হস্তিমূর্খ কহিয়া থাকি। কখনো বিড়াল, ভল্লুক, সিংহ, বা ব্যাঘ্রমূর্খ বলি না। উদ্ভিজ্জভোজীদের এমন নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, বুদ্ধির যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করিলেও তাহাদের দুর্নাম ঘুচে না। নহিলে "বাঁদর" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে লোকে কেন মনে করে, তাহাকে নির্বোধ বলা হইল? পশুদের মধ্যে বানরের বুদ্ধির অভাব বিশেষ লক্ষিত হয় নাই, তাহার একমাত্র অপরাধ সে বেচারী উদ্ভিদ্‌ভোজী। অতএব অনর্থক এমন একটা দুর্নামভাজন হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি? আর একটা কথা— উদ্ভিদ্‌ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভাল হজম হইল না; পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী তুলুতুমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না, আহার করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া মাঝের হইতে বলহানি হইল, রোগ হইবার উপক্রম হইল। অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক। নহিলে আত্মম বিসর্জন করিয়া পরের দেহের রক্ত নির্মাণ করাই আমাদের চরম সিদ্ধি হইবে। মাংস খাইবার এক আপত্তি আছে যে, শাস্ত্রে মাংসকে অপবিত্র বলে। কিন্তু সে কোন কাজের কথাই নহে। শাস্ত্রেই আছে, মেদিনী মাংসেই নির্মিত। আমরা মাংসের উপরেই বাস করি। এ মাংসের পৃথিবীতে মাংসেরই জয়।

অনধিকার

পূর্ব্বকালে মহারাজ জনকের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর অপরাধ করাতে জনকরাজ তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমার অধিকার-মধ্যে বাস করিতে পারিবেন না।" মহাত্মা জনক এইরূপ আজ্ঞা করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ, কোন্ কোন্ স্থানে আপনার অধিকার আছে আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; আমি অবিলম্বেই আপনার বাক্যানুসারে সেই সমুদয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার রাজ্যে গমন করিব।" ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, মহারাজ জনক তাহা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ-পূর্ব্বক মৌনভাবে চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় মহামোহে সমাক্রান্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্, যদিও এই পুরুষপরম্পরাগত রাজ্য আমার বশীভূত রহিয়াছে, তথাপি আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। আমি প্রথমে সমুদয় পৃথিবীতে, তৎপরে একমাত্র মিথিলানগরীতে, ও পরিশেষে স্বীয় প্রজামণ্ডলী-মধ্যে আপনার অধিকার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোন পদার্থেই আমার সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রতীত হইল না।"

—কালীসিংহের অনুবাদিত মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব্ব। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়।
দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৪২ পৃ

জনক রাজার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছুকে আমরা আমার বলি তাহার কিছুই আমার নয়। আমার সহিত তাহাদের ন্যূনাধিক সম্বন্ধ আছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাদের প্রতি আমার কিছু মাত্র অধিকার নাই। আমরা ষষ্ঠীকে যে সম্বন্ধ-কারক বলি তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহাকে Possessive Case বলে তাহা অতি ভুল। মানুষের ব্যাকরণে সম্বন্ধ-কারক আছে কিন্তু Possessive Case নাই। একটি পরমাণুও আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারি না, সম্পূর্ণ জানিতে পারি না, ধ্বংস করিতে পারি না, নিয়মিত কালের অধিক রাখিতে পারি না। এমন কি, আমাদের শরীর ও মনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের অধিকার নাই। আমরা নিতান্ত দরিদ্র, একটি ধনীর প্রাসাদে বাস করিতেছি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার কতকগুলি গৃহসজ্জা ব্যবহার করিতে দিয়াছেন মাত্র।

একটি মন দিয়াছেন, একটি শরীর দিয়াছেন, আরো কতকগুলি ব্যবহার্য্য পদার্থ দিয়াছেন। তাহার একটিকেও আমরা ভাঙ্গিতে পারি না, স্থানান্তর করিতে পারি না। যদি তাহা করিতে চেষ্টা করি, তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। যদি কখনো ভ্রমক্রমে আমরা মনে করি 'আমার শরীর আমার' ও সেই মনে করিয়া তাহার প্রতি যথেচ্ছাচার করি, তৎক্ষণাৎ রোগ আসিয়া তাহার শাস্তি দেয়। এই জন্যই আমার শরীরকে পরের শরীরের মত অতি সন্তর্পণে রাখিতে হয়, যেন কে তাহা আমার জিম্মায় রাখিয়াছে; সর্ব্বদা সশঙ্কিত, পাছে তাহাতে আঘাত লাগে, পাছে তাহাতে আঁচড় পড়ে, পাছে তাহা মলিন হয়। মনকে যদি তুমি মনে কর 'আমার' ও তাহার প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার কর, তবে চিরজীবন মনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য আমরা মনকে অতি সাবধানে রাখি, একটি কঠোর হস্ত তাহাকে ছুঁইবামাত্র আমরা সশঙ্কিত হইয়া উঠি। মন যদি আমার নয়, শরীর যদি আমার নয় ত কে আমার?

অধিকার

জনক রাজা কহিলেন, "এক্ষণে আমার মোহ নির্ম্মুক্ত হওয়াতে আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা আমি সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী। আমার আত্মাও আমার নহে; অথবা সমুদয় পৃথিবীই আমার। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে।"—

—মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব্ব। অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৫৩ পৃ

জনক রাজার উপরি-উক্ত উক্তি লইয়া একটা তর্ক উপস্থিত হইল, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

আমি। যাহা কিছু আমি দেখিতে পাই, সকলি আমার।

তুমি। সে কিরকম কথা?

আমি। নহে ত কি? যে গুণে তুমি একটা পদার্থকে আমার বল, সে গুণটি কি?

তুমি। অন্য সকলে যে পদার্থকে উপভোগ করিতে পার না, অথবা আংশিক

ভাবে পায়, আমিই কেবল যাহাকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পাই, তাহাই আমার।

আমি। পৃথিবীতে এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি? কোনটার ঘ্রাণ, কোনটার শব্দ, কোনটার স্বাদ, কোনটার দৃশ্য, কোনটার স্পর্শ আমরা ভোগ করি, অথবা একাধারে ইহাদের দুই-তিনটাও ভোগ করিতে পারি। কিম্বা হয়ত ইহাদের সকলগুলিকেই এক পদার্থের মধ্যে পাইলাম, কিন্তু তবু তাহাকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতে পারি কই? জগতে আমরা কিছুই সর্ব্বতোভাবে জানি না, একটি তৃণকেও না— তবে সর্ব্বতোভাবে ভোগ করিব কি করিয়া? কে বলিতে পারে আমাদের যদি আর একটি ইন্দ্রিয় থাকিত তবে এই তৃণটির মধ্যে দৃষ্টি স্বাদ গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি ব্যতীতও আরো অনেক উপভোগ্য গুণ দেখিতে না পাইতাম?

তুমি। তুমি অত সূক্ষ্মে গেলে চলিবে কেন? "সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করা"র অর্থ এই যে, মানুষের পক্ষে যত দূর সম্ভব তত দূর উপভোগ করা।

আমি। এ স্থলে তুমি উপভোগ শব্দ ব্যবহার করিয়া অতিশয় ভ্রমাত্মক কথা কহিতেছ। প্রচলিত ভাষায় স্বত্ব থাকা, উপভোগ করা, উভয়ের এক অর্থ নহে। মনে কর এক জন হতভাগ্য নিজে ভাঙ্গা ঘরে কুশ্রী পদার্থের মধ্যে বাস করে ও গৌরাঙ্গ প্রভুদের জন্য একটি অট্টালিকা ভাল ভাল ছবি, রঙ্গীন কার্পেট ও ঝাড়-লণ্ঠন দিয়া সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে— সে অট্টালিকা, সে ছবি, সে উপভোগ করে না বলিয়াই কি তাহা তাহার নহে?

তুমি। উপভোগ করে না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে।

আমি। সে কথা নিতান্তই ভুল, যদি সে কোন অবস্থায় ছবি উপভোগ করিতে পারিত তবে তাহা নিজের ঘরেই টাঙ্গাইত। মূর্খ একটি বই কিনিয়া কোন মতেই তাহা বুঝিতে না পারুক, তথাপি সে বইটিকে আপনার বলিতে সে ছাড়িবে না।

তুমি। আচ্ছা, উপভোগ করা চুলায় যাউক। যে বস্তুর উপর সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা তোমার অধিক ক্ষমতা খাটে, যে বইটিকে তুমি ইচ্ছা করিলে অবাধে পোড়াইতে পার, রাখিতে পার, দান করিতে পার, অন্যের হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পার, তাহাতেই তোমার অধিকার আছে।

আমি। তবুও কথাটা ঠিক হইল না। শারীরিক ক্ষমতাকেই ত ক্ষমতা বলে না। মানসিক ক্ষমতা তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ। তাহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ভ্রম সহজেই দেখিতে পাইবে। তুমি অরসিক, তোমার বাগানের গাছ হইতে

একটি গোলাব ফুল তুলিয়াছ, তোমার হাতে সেটি রহিয়াছে, আমি দূর হইতে দেখিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে সে গোলাপটি ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিতে পার, সে ক্ষমতা তোমার আছে, কিন্তু সে গোলাপটির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই— ইচ্ছা করিলে আর সব করিতে পার, কিন্তু মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে উপভোগ করিতে পার না— আর, আমি তাহাকে ছিঁড়িতে পারি না বটে, কিন্তু দূর হইতে দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি। তাহার গোলাব ছিঁড়িবার ক্ষমতা আছে, আমার গোলাপ উপভোগ করিবার ক্ষমতা আছে, কোন্ ক্ষমতাটি গুরুতর ? তবে কেন সে তাহাকে "আমার গোলাপ" বলে, আর আমি পারি না ? তবে, গোলাপ সম্বন্ধে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা আমার তাহা আছে, তবু সে গোলাবের অধিকারী আমি নহি। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, যে বলদ চিনি বহন করিয়া থাকে প্রচলিত ভাষায় তাহাকেই চিনির অধিকারী কহে। আর যে মানুষ ইচ্ছা করিলেই সে চিনি খাইতে পারে সে মানুষের সে চিনিতে অধিকার নাই।

তুমি হয়ত বলিবে, যাহার উপর আমাদের শারীরিক ক্ষমতা খাটে, চলিত ভাষায় তাহাকেই "আমার" কহে। তাহাও ঠিক নহে, যাহার সহিত আমার হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ আছে তাহাকেও ত আমি "আমার" কহি।

তুমি। আচ্ছা, আমি হার মানিলাম। কিন্তু তুমি কি সিদ্ধান্ত করিলে শুনি।

আমি। যে কোন পদার্থ আমরা দেখি, শুনি, ইন্দ্রিয় বা হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করি, তাহাই আমাদের। তুমি যে ফুলকে "আমার" বল তুমি তাহাকে দেখিতে পার, স্পর্শ করিতে পার, ঘ্রাণ করিতে পাও ; আমি আর কিছু পাই না, কিন্তু যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তবে সে মুহূর্ত্তেই তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ বাধিয়া গেল, সে সম্বন্ধ হইতে কেহ আমাকে আর বঞ্চিত করিতে পারিবে না ! তুমিও তাহার সব পাও নি, আমিও তাহার সব পাই নি, কারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব ; তুমিও তাহার কিছু পাইলে, আমিও তাহার কিছু পাইলাম, অতএব তোমারও সে, আমারও সে। এই জন্যই জনক কহিয়াছিলেন, "কোন পদার্থেই আমার অধিকার নাই, অথবা সমুদয় পদার্থেরই অধিকারী আমি। ফলতঃ ইহলোকে সকল বস্তুতেই সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে।" সন্ধ্যা বা উষাকে কেহ "আমার সন্ধ্যা" "আমার উষা" বলে না কেন ? যদি বল তাহার কারণ তাহারা সকল মানুষের পক্ষেই সমান, তাহা হইলে ভুল বলা হয়। আমি সন্ধ্যাকে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক উপভোগ করি, অতএব সেই উপভোগ-ক্ষমতার বলে তোমাদের কাছ হইতে সন্ধ্যার দখলি-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া সন্ধ্যাকে বিশেষ করিয়া "আমার সন্ধ্যা" বলি না কেন ? তাহার কারণ

আমি সন্ধ্যাকে সর্ব্বপ্রকারে অধিক উপভোগ করিতেছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের কাছ হইতে সে ত একেবারে ঢাকা পড়ে নাই। এইরূপে একটা পদার্থকে কেহ বা কিছু উপভোগ করে, কেহ বা অধিক উপভোগ করে, কিন্তু সে পদার্থটা তাহাদের উভয়েরই।

আত্মীয়ের বেড়া

একলা একজন মাত্র লোক কিছুই নহে। সে ব্যক্তিই নহে! সে, সাধারণ মনুষ্য সমাজের সম্পত্তি। শ্যামের সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, রামের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক। সে সরকারী। সে অমিশ্র জলজনন বাষ্পের মত। যতক্ষণ জলজনন বাষ্প অমিশ্র ভাবে থাকে, ততক্ষণ বায়ুর সঙ্গেও তাহার যে সম্পর্ক, জলের সঙ্গেও তাহার সেই সম্পর্ক। অবশেষে আর গুটি দুই তিন বাষ্প আসিয়া যখন তাহার সঙ্গে মেলে, তখন আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি সে জল কি বায়ু। তেমনি একক আমার সহিত যখন আর গুটি দুই তিন ব্যক্তি আসিয়া জমা হয়, তখন আমি ব্যক্তি-বিশেষ হইয়া দাঁড়াই। আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ আমার সীমা। সাধারণ মনুষ্যদের হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া রাখা, আমাকে ব্যক্তিবিশেষ করিয়া রাখাই তাঁহাদের কাজ। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের চারি দিকে কতকগুলি বিশেষ পরের আবশ্যক, সাধারণ পর হইতে তাহারা আমাদিগকে পর করিয়া রাখে। কতকগুলি পরকে আপনার করিতে না পারিলে আমি "আপনি" হইতে পারি না; "পর" দিয়া "আপনি"কে গড়িয়া তুলিতে হয়। নহিলে আমি মানুষ হই, ব্যক্তি হই না। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব -নামক কতকগুলি পর আছেন, তাঁহারা পরকে পর করেন, আপনাকে আপনি রাখেন। আমাদের কেহই যদি আত্মীয় না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরই বা কে থাকিত? তাহা হইলে সকলেরই সঙ্গে আমার সমান সম্পর্ক থাকিত। রেখাব-নামক একটি সুর যতক্ষণ স্বতন্ত্র থাকে ততক্ষণ সে বেহাগেরও যেমন সম্পত্তি কানেড়ারও তেমনি সম্পত্তি ও অমন শত সহস্র রাগিণীর সঙ্গে তাহার সমান যোগ। কিন্তু যেই তার চতুষ্পার্শ্বে আর কতকগুলি সুর আসিয়া একত্র হয় তখনি সে বিশেষ রাগিণী হইয়া দাঁড়ায় ও অবশিষ্ট সমুদায় রাগিণীকে পর বলিয়া গণ্য করে। তেমনি আমরা যে সকলে রেখাব গান্ধার প্রভৃতি একেকটি সুর

না হইয়া বেহাগ ভৈরবী প্রভৃতি একেকটি রাগিণী হইয়াছি, তাহা কেবল আমাদের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের প্রসাদে। আমরা যে একলা থাকিতে পাই, বিরলে থাকিতে পারি, তাহার কারণ আমাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ আমাদিগকে চারি দিকে ঘেরিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া। নতুবা আমরা মুক্ত জগতে লক্ষ লোকের মধ্যে গিয়া পড়িতাম, শত সহস্রের কোলাহলের মধ্যে আমাদিগকে বাস করিতে হইত। অতএব কতকগুলি লোক ঘনিষ্ঠ ভাবে আমাদের কাছাকাছি না থাকিলে আমরা একলা থাকিতে পাই না, বিরলে থাকিতে পারি না। আকারহীন, ভাষাহীন, অন্তঃপুরহীন, কুহেলিকাময় কতকগুলা অপরিস্ফুট ভাবের দল আমাদের মনের মধ্যে যেমন ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া আনাগোনা করে, পরস্পরের কোলাহলে পরস্পরে মিশাইয়া থাকে, সমাজের মধ্যে আমরা তেমনি থাকি। অবশেষে সে ভাবগুলিকে যখন বিযুক্ত করিয়া লইয়া তাহাদিগকে আকার দিয়া, ভাষাবদ্ধ করিয়া, তাহাদের জন্ত এক একটা স্বতন্ত্র অন্তঃপুর স্থাপন করিয়া দিই, তখন তাহারা যেমন বিরলে থাকে, একক হইয়া যায়, আমরাও সংসারী হইয়া তেমনি হই।

বেশী দেখা ও কম দেখা

সাধারণের কাছে প্রেমের অন্ধ বলিয়া একটা বদ্‌নাম আছে। কিন্তু অনুরাগ অন্ধ না বিরাগ অন্ধ? প্রেমের চক্ষে দেখার অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা। তবে কি বলিতে চাও, যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখে সে কিছুই দেখিতে পায় না? যে প্রতি কটাক্ষ দেখে, প্রতি ইঙ্গিত দেখে, প্রতি কথা শোনে, প্রতি নীরবতা শোনে, সে মানুষ চিনিতে পারে না? যে ভাবুক কবিতা ভালবাসে সে কবিতা বুঝিতে পারে না? যে কবি প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখে সে প্রকৃতিকে দেখিতে পায় না? বিজ্ঞানবিৎ কি কেবল দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সাহায্যেই বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেন, তাঁহার কাছে যে অনুরাগবীক্ষণ আছে তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না? তুমি বলিবে প্রেম যদি অন্ধ না হইবে তবে কেন সে দোষ দেখিতে পায় না? দোষ দেখিতে পায় না যে তাহা নহে। দোষকে দোষ বলিয়া মনে করে না। তাহার কারণ সে এত অধিক দেখে যে দোষের চারি দিক দেখিতে পায়, দোষের ইতিহাস পড়িতে পারে। একটা দোষবিশেষকে মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া দেখিলে তাহাকে যতটা কালো দেখায়, তাহার স্বস্থানে রাখিয়া

তাহার আস্তমধ্য দেখিলে তাহাকে ততটা কালো দেখায় না। আমরা যাহাকে ভালবাসি না তাহার দোষটুকুই দেখি, আর কিছু দেখি না। দেখি না যে মনুষ্য-প্রকৃতিতে সে দোষ সম্ভব, অবস্থাবিশেষে সে দোষ অবশ্যম্ভাবী ও সে দোষ সত্ত্বেও তাহার অন্যান্য এমন গুণ আছে যাহাতে তাহাকে ভালবাসা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিরাগে আমরা যতটুকু দেখিতে পাই অনুরাগে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দেখি। অনুরাগে আমরা দোষ দেখি, আবার সেই সঙ্গে তাহা মার্জ্জনা করিবার কারণ দেখিতে পাই। বিরাগে কেবল দোষ মাত্রই দেখি। তাহার কারণ বিরাগের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, তাহার একটা মাত্র চক্ষু। আমাদের উচিত, ভালবাসার পাত্রের দোষ গুণ আমরা যে নজরে দেখি, অন্যদের দোষ গুণও সেই নজরে দেখি। কারণ, ভালবাসার পাত্রদেরই আমরা যথার্থ বুঝি। যাঁহাদের ভালবাসা প্রশস্ত, হৃদয় উদার, বসুধৈব কুটুম্বকং, তাঁহারা সকলকেই মার্জ্জনা করিতে পারেন। তাহার কারণ, তাঁহারাই যথার্থ মানুষদের বুঝেন, কাহাকেও ভুল বুঝেন না। তাঁহাদের প্রেমের চক্ষু বিকশিত, এবং প্রেমের চক্ষুতে কখনো নিমেষ পড়ে না। তাঁহারা মানুষকে মানুষ বলিয়া জানেন। শিশুর পদস্খলন হইলে তাহাকে যেমন কোলে করিয়া উঠাইয়া লন, আত্মসংযমনে অক্ষম একটি দুর্ব্বল হৃদয় ভূপতিত হইলে তাহাকেও তেমনি তাঁহাদের বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে উঠাইতে চেষ্টা করেন। দুর্ব্বলতাকে তাঁহারা দয়া করেন, ঘৃণা করেন না।

বসন্ত ও বর্ষা

এক বিরহিণী আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন— বিরহের পক্ষে বসন্ত গুরুতর কি বর্ষা গুরুতর? এ বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ঢের ভাল বুঝেন। তবে উভয় ঋতুর অবস্থা আলোচনা করিয়া যুক্তির সাহায্যে আমরা একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া লইয়াছি। মহাকবি কালিদাস দেশান্তরিত যক্ষকে বর্ষাকালেই বিরহে ফেলিয়াছেন। মেঘকে দূত করিবেন বলিয়াই যে এমন কাজ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। বসন্তকালেও দূতের অভাব নাই। বাতাসকেও দূত করিতে পারিতেন। একটা বিশেষ কারণ থাকাই সম্ভব।

বসন্ত উদাসীন, গৃহত্যাগী। বর্ষা সংসারী, গৃহী। বসন্ত আমাদের মনকে চারি

দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে এক স্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। বসন্তে আমাদের মন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যায়, বাতাসের উপর ভাসিতে থাকে, ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে; আমাদের মন বাতাসের মত, ফুলের গন্ধের মত, জ্যোৎস্নার মত, লঘু হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বসন্তে বহির্জগৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের মনকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়। বর্ষায় আমাদের মনের চারি দিকে বৃষ্টিজলের যবনিকা টানিয়া দেয়, মাথার উপরে মেঘের চাঁদোয়া খাটাইয়া দেয়। মন চারি দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যবনিকার মধ্যে এই চাঁদোয়ার তলে একত্র হয়। পাখীর গানে আমাদের মন উড়াইয়া লইয়া যায়, কিন্তু বর্ষার বজ্রসঙ্গীতে আমাদের মনকে মনের মধ্যে স্তম্ভিত করিয়া রাখে। পাখীর গানের মত এ গান লঘু, তরঙ্গময়, বৈচিত্র্যময় নহে; ইহাতে স্তব্ধ করিয়া দেয়, উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ষাকালে আমাদের "আমি" গাঢ়তর হয়, আর বসন্তকালে সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাক, বসন্তকালের বিরহ ও বর্ষাকালের বিরহে প্রভেদ কি। বসন্তকালে আমরা বহির্জগৎ উপভোগ করি; উপভোগের সমস্ত উপাদান আছে, কেবল একটি পাইতেছি না; উপভোগের একটা মহা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি। সেই জন্যই আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। এত দিন আমার সুখ ঘুমাইয়াছিল, আমার প্রিয়তম ছিল না; আমার আর কোন সুখের উপকরণও ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না, বাতাস ও সুগন্ধে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সুখকে জাগাইয়া তুলিল; সে জাগিয়া দেখিল তাহার দারুণ অভাব বিদ্যমান। সে কাঁদিতে লাগিল। এই রোদনই বসন্তের বিরহ। দুর্ভিক্ষের সময় শিশু মরিয়া গেলেও মায়ের মন অনেকটা শান্তি পায়, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিয়া ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে থাকিলে তাঁহার কি কষ্ট!

বর্ষাকালে বিরহিণীর সমস্ত "আমি" একত্র হয়, সমস্ত "আমি" জাগিয়া উঠে; দেখে যে বিচ্ছিন্ন "আমি", একক "আমি" অসম্পূর্ণ। সে কাঁদিতে থাকে। সে তাহার নিজের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিবার জন্য কাহাকেও খুঁজিয়া পায় না। চারি দিকে বৃষ্টি পড়িতেছে, অন্ধকার করিয়াছে; কাহাকেও পাইবার নাই, কিছুই দেখিবার নাই; কেবল বসিয়া বসিয়া অন্তর্দেশের অন্ধকারবাসী একটি অসম্পূর্ণ, সঙ্গীহীন "আমি"র পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহাই বর্ষাকালের বিরহ। বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ অসম্পূর্ণ, বর্ষাকালে বিরহিণীর "স্বয়ং" অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। সুতরাং বর্ষাকালের বিরহ গুরুতর। এ বিরহে যৌবন মদন প্রভৃতি কিছু নাই, ইহা বস্তুগত নহে। মদনের শর বসন্তের

ফুল দিয়া গঠিত, বর্ষার বৃষ্টিধারা দিয়া নহে। বসন্তকালে আমরা নিজের উপর সমস্ত জগৎ স্থাপিত করিতে চাহি, বর্ষাকালে সমস্ত জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। ঋতুসংহারে কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তিনি এই কাব্যে বর্ষা ও বসন্তের যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া চিনা যায়। বসন্তের উপসংহারে তিনি বলেন—

মলয়পবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিরম্যো
সুরভিমধুনিষেকাল্লব্ধগন্ধপ্রবন্ধঃ।
বিবিধমধুপযূথৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমন্তাদ্
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায়॥

কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, বাহুসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বসন্তকাল তোমাকে সুখ প্রদান করুক। বর্ষায় কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতুর্-
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥

বর্ষাকাল তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত হিত অর্পণ করুক। বর্ষাকাল ত সুখের জন্য নহে, ইহা মঙ্গলের জন্য। বর্ষাকালে উপভোগের বাসনা হয় না, "স্বয়ং"-এর মধ্যে একটা অভাব অনুভব হয়, একটা অনির্দ্দেশ্য বাঞ্ছা জন্মে।

প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল

উপরে বসন্ত ও বর্ষার যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করিলাম, প্রভাত ও সন্ধ্যার সম্বন্ধেও তাহা অনেক পরিমাণে খাটে।

প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকী আর সমস্তই হারাইয়া যায়। প্রভাতে আমি শত সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন; তখন জগতের যন্ত্রের কাজ আমি সমস্তই দেখিতে পাই; বুঝিতে পারি আমিও সেই যন্ত্র-চালিত একটি জীব মাত্র; যে মহা নিয়মে সূর্য্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, জনকোলাহল জাগিয়াছে, আমিও সেই নিয়মে জাগিয়াছি, কার্য্যক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতেছি;

আমিও কোলাহলসমুদ্রের একটি তরঙ্গ, চারি দিকে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে নিয়মে উঠিতেছে পড়িতেছে, আমিও সেই নিয়মে উঠিতেছি পড়িতেছি। সন্ধ্যাকালে জগতের কল-কারখানা দেখিতে পাই না, এই জন্য নিজেকে জগতের অধীন বলিয়া মনে হয় না ; মনে হয় আমি স্বতন্ত্র, মনে হয় আমিই জগৎ।

প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা। প্রাতঃকালে আমা হইতে গণনা আরম্ভ হইয়া জগতে গিয়া শেষ হয়, আর সন্ধ্যাকালে অতি দূর জগৎ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়া আমাতে আসিয়া শেষ হয়। তখন আমিই জগতের পরিণাম, জগতের উপসংহার, জগতের পঞ্চমাঙ্ক। জগতের শোকান্ত বা মিলনান্ত নাটক আমাতে আসিয়াই তাহার সমস্ত উপাখ্যান কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। আমার পরেই যেন সে নাটকের যবনিকাপতন। প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি নাটকের সাধারণ পাত্রগণের মধ্যে একজন ছিল, সন্ধ্যাকালে সেই তাহার নায়ক হইয়া উঠে। প্রভাতে জগৎ অন্ধকারকে স্তব্ধতাকে ও সেই সঙ্গে "আমি"কে পরাজিত করিয়া তাহার নিজের রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া লয়। এইরূপে প্রাতঃকালে জগৎ রাজা হয় ও সন্ধ্যাকালে আমি রাজা হই। প্রাতঃকালের আলোকে "আমি" মিশাইয়া যাই ও সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে জগৎ মিশাইয়া যায়। প্রাতঃকাল চারি দিক উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে আমাদের নিকট হইতে অতি দূরে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যাকাল চারি দিক রুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের অতি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। এক কথায়, প্রভাতে আমি জগৎ-রচনার কর্মকারক ও সন্ধ্যাকালে আমি জগৎ-রচনার কর্তাকারক। প্রভাতে "আমি"-নামক সর্ব্বনাম শব্দটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাবেলায় সে উত্তম পুরুষ।

আদর্শ প্রেম

সংসারের-কাজ-চালানে, মন্ত্রবদ্ধ, ঘরকন্নার ভালবাসা যেমনই হউক, আমি প্রকৃত আদর্শ ভালবাসার কথা বলিতেছি। যে-হউক এক জনের সহিত ঘেঁষাঘেষি করিয়া থাকা, এক ব্যক্তির অতিরিক্ত একটি অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকা, তাহার পাঁচটা অঙ্গুলির মধ্যে ষষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া থাকাকেই ভালবাসা বলে না। দুইটা আঠাবিশিষ্ট পদার্থকে একত্রে রাখিলে যে জুড়িয়া যায়, সেই জুড়িয়া যাওয়াকেই ভালবাসা বলে

না। অনেক সময়ে আমরা নেশাকে ভালবাসা বলি। রাম ও শ্যাম উভয়ে উভয়ের কাছে হয়ত "মৌতাতের" স্বরূপ হইয়াছে, রাম ও শ্যাম উভয়কে উভয়ের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, রামকে নহিলে শ্যামের বা শ্যামকে নহিলে রামের অভ্যাস-ব্যাঘাতের দরুন কষ্ট বোধ হয়। ইহাকেও ভালবাসা বলে না। প্রণয়ের পাত্র নীচই হউক, নিষ্ঠুরই হউক, আর কুচরিত্রই হউক, তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকাকে অনেকে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু, ইহা বিবেচনা করা উচিত, নিতান্ত অপদার্থ দুর্ব্বল-হৃদয় নহিলে কেহ নীচের কাছে নীচ হইতে পারে না। এমন অনেক ক্রীতদাসের কথা শুনা গিয়াছে যাহারা নিষ্ঠুর নীচাশয় প্রভুর প্রতিও অন্ধভাবে আসক্ত, কুকুরেরাও সেইরূপ। এরূপ কুকুরের মত, ক্রীতদাসের মত ভালবাসাকে ভালবাসা বলিতে কোন মতেই মন উঠে না। প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন; তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাঁহার কর্ম্ম নহে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে না, তাহাকে কর্দ্দমবৃত্তি বলে। কর্দ্দম একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক! প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে— ভক্তের দাসত্বে স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে, কেননা দাসত্ববিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেই-খানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্য্যাদা, সেইখানেই সে হীন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্য্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তবে ভালবাসা নিপাত যাক।

বন্ধুত্ব ও ভালবাসা

বন্ধুত্ব ও ভালবাসায় অনেক তফাৎ আছে, কিন্তু ঝট্‌ করিয়া সে তফাৎ ধরা যায় না।

বন্ধুত্ব আটপৌরে, ভালবাসা পোষাকী। বন্ধুত্বের আটপৌরে কাপড়ে দুই-এক জায়গায় ছেঁড়া থাকিলেও চলে, ঈষৎ ময়লা হইলেও হানি নাই, হাঁটুর নীচে না পৌঁছিলেও পরিতে বারণ নাই। গায়ে দিয়া আরাম পাইলেই হইল। কিন্তু ভালবাসার পোষাক একটু ছেঁড়া থাকিবে না, ময়লা হইবে না, পরিপাটি হইবে। বন্ধুত্ব নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া তোলাপাড়া সয়, কিন্তু ভালবাসা তাহা সয় না। আমাদের ভালবাসার পাত্র হীন প্রমোদে লিপ্ত হইলে আমাদের প্রাণে বাজে, কিন্তু বন্ধুর সম্বন্ধে তাহা খাটে না; এমন-কি, আমরা যখন বিলাসপ্রমোদে মত্ত হইয়াছি তখন আমরা চাই যে, আমাদের বন্ধুও তাহাতে যোগ দিক! প্রেমের পাত্র আমাদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ হইয়া থাক্‌ এই আমাদের ইচ্ছা— আর, বন্ধু আমাদেরই মত দোষে গুণে জড়িত মর্ত্ত্যের মানুষ হইয়া থাক্‌ এই আমাদের আবশ্যক। আমাদের ডান হাতে বাম হাতে বন্ধুত্ব। আমরা বন্ধুর নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সাহায্য চাই ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই। কিন্তু ভালবাসার স্থলে আমরা সর্ব্বপ্রথমে ভালবাসার পাত্রকেই চাই ও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পাইতে চাই বলিয়াই তাহার নিকট হইতে মমতা চাই, সমবেদনা চাই, সঙ্গ চাই। কিছুই না পাই যদি, তবুও তাহাকে ভালবাসি। ভালবাসায় তাহাকেই আমি চাই, বন্ধুত্বে তাহার কিয়দংশ চাই। বন্ধুত্ব বলিতে তিনটি পদার্থ বুঝায়। দুই জন ব্যক্তি ও একটি জগৎ। অর্থাৎ দুই জনে সহযোগী হইয়া জগতের কাজ সম্পন্ন করা। আর, প্রেম বলিলে দুই জন ব্যক্তি মাত্র বুঝায়, আর জগৎ নাই। দুই জনেই দুই জনের জগৎ। অতএব বন্ধুত্ব অর্থে দুই এবং তিন, প্রেম অর্থে এক এবং দুই।

অনেকে বলিয়া থাকেন বন্ধুত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভালবাসায় উপনীত হইতে পারে, কিন্তু ভালবাসা নামিয়া অবশেষে বন্ধুত্বে আসিয়া ঠেকিতে পারে না। একবার যাহাকে ভালবাসিয়াছি, হয় তাহাকে ভালবাসিব নয় ভালবাসিব না; কিন্তু একবার যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছে, ক্রমে তাহার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে আটক নাই। অর্থাৎ বন্ধুত্বের উঠিবার নামিবার স্থান আছে। কারণ, সে সমস্ত স্থান আটক করিয়া থাকে না। কিন্তু ভালবাসার উন্নতি অবনতির স্থান নাই। যখন সে থাকে তখন সে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকে, নয় সে থাকে না।

যখন সে দেখে তাহার অধিকার হ্রাস হইয়া আসিতেছে তখন সে বন্ধুত্বের ক্ষুদ্র স্থানটুকু অধিকার করিয়া থাকিতে চায় না। যে রাজা ছিল সে ফকির হইতে রাজি আছে, কিন্তু করদ জায়গীরদার হইয়া থাকিবে কিরূপে? হয় রাজত্ব নয় ফকিরী, ইহার মধ্যে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। ইহা ছাড়া আর একটা কথা আছে— প্রেম মন্দির ও বন্ধুত্ব বাসস্থান। মন্দির হইতে যখন দেবতা চলিয়া যায় তখন সে আর বাসস্থানের কাজে লাগিতে পারে না, কিন্তু বাসস্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

আত্মসংসর্গ

দুঃখের সুর একঘেয়ে কেন? বলা বাহুল্য, মন যেখানে বৈচিত্র্য দেখে না সেখানে সে নিজের অন্তঃপুরের মধ্যে নিজে বসিয়া থাকে, কৌতূহল উদ্রেক না হইলে সে বাহির হইবার কোন আবশ্যক দেখে না। যাহা কিছু একঘেয়ে, তাহাই আমাদিগকে আমাদের নিজের কাছে প্রেরণ করে। এই জন্যই একঘেয়ে সুরের মধ্যে একটি করুণ ভাব আছে।

যখনি আমরা আমাদের নিজের কাছে থাকি, তখনই আমাদের দুঃখ। আমরা নিজের কাছ হইতে পলাইয়া থাকিতে পারিলেই সুখে থাকি। যখন বাহ্য জগৎ সুন্দর আকার ধারণ করে, তখন আমরা কেন সুখে থাকি? কারণ, তখন আমাদের মন তাহার নিজের হাত এড়াইয়া বাহিরে সঞ্চরণ করিতে পারে; আর যখন আমাদের চারি দিকে বাহ্য জগৎ কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন আমাদের মনকে দায়ে পড়িয়া নিজের কাছেই ফিরিয়া আসিতে হয় ও আমরা অসুখী হই। এই জন্যই, আমাদের অন্তর ও বাহির, আমাদের মন ও জগৎ, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ হইলেও জগতের উপর আমাদের মনের সুখ এতটা নির্ভর করে যে, জগৎ বেঁকিয়া দাঁড়াইলেই আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে। সে নিজের কাছে কোন মতেই থাকিতে চায় না। সে একটি অভাব মাত্র। সে এই বিশাল জগৎসংসারের মহাক্ষেত্রে প্রতি শব্দ, প্রতি দৃশ্য, প্রতি গন্ধ, প্রতি স্বাদকে শীকার করিয়া বেড়াইতেছে; যতক্ষণ শীকার করে ততক্ষণ থাকে ভাল, অবশেষে যখন রিক্তহস্তে শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরিয়া আসে তখনি তাহার দুঃখ। আমরা ভালবাসিতে চাই, কেননা আমরা আপনাকে চাই না, আর এক জনকে চাই; আমরা একটা কিছু কায করিতে চাই, কেননা আমরা নিজের

কাছে থাকিতে চাই না ; আমরা উপার্জন করিতে চাই, কেননা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিই অভাব। আমাদের মনের অর্থ— ভিক্ষার অঞ্জলি, জগতের অর্থ— ভিক্ষামুষ্টি। ভস্মলোচনকে যেমন নিজের মুখ দেখাইয়া বধ করা হইয়াছিল, তেমনি সমস্ত জগৎ যদি একটি বিশাল দর্পণ হইত চারি দিকে কেবল আমাদের নিজের মুখ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমরা মরিয়া যাইতাম। তাহা হইলে আমরা কি দেখিতাম ? একটা ক্ষুধা, একটা দুর্ভিক্ষ, একটা প্রার্থনা, একটা রোদন। আমাদের মন গোটা-কতক ক্ষুধার সমষ্টি মাত্র। জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা। আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত রহস্য। আমরা প্রাণের সহচর চাই, কিন্তু "লাখে না মিলল একে"। আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্য্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়। আমরা কৃষ্ণবর্ণ ; সূর্য্যরশ্মির সমস্ত বর্ণধারা পান করিয়া থাকি, তথাপি আমরা কালো। সূর্য্যরশ্মি পান করিবার আমাদের অনন্ত পিপাসা। এইরূপে অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্যে হস্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায়, অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্যজীবন। এই নিমিত্তই মন নিজের কাছে থাকিতে চায় না, জগতের কাছে যাইতে চায় ; ক্ষুধা নিজের কাছে থাকিতে চায় না, খাদ্যের কাছে থাকিতে চায়। আমরা মানুষরা কতকগুলা কালো কালো অসন্তোষের বিন্দু, ক্ষুধার্ত্ত পিপীলিকার মত জগৎকে চারি দিক হইতে ছাকিয়া ধরিয়াছি ; উষাকে, জ্যোৎস্নাকে, গানের শব্দকে দংশন করিতেছি, একটুখানি খাদ্য পাইবার জন্য। হায় রে, খাদ্য কোথায় ! হে সূর্য্য, উদয় হও ! চন্দ্র, হাস ! ফুল, ফুটিয়া ওঠ ! আমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা কর ; আমাকে যেন আমার পাশে বসিয়া না থাকিতে হয় ; অনিচ্ছারচিত বাসরশয্যায় শুইয়া আমাকে যেন আমার আলিঙ্গনে পড়িয়া কাঁদিতে না হয় !

বধিরতার সুখ

অদ্বিতীয় রমণী ও অসাধারণ পুরুষ জর্জ এলিয়ট তাঁহার একটি উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে, আমরা জীবনে অনেক ছোট ছোট দুঃখঘটনা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা এত সাধারণ ও সামান্যকারণজাত যে, তাহাতে আর আমাদের করুণা উদ্রেক করিতে পারে না, তাহা যদি পারিত তবে জীবন কি কষ্টেরই হইত! যদি আমরা কাঠবিড়ালীর হৃদয়স্পন্দন শুনিতে পাইতাম, যখন একটি ঘাস মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গজাইতেছে তখন তাহার শব্দটুকুও শুনিতে পাইতাম, তবে আমাদের কানের পক্ষে কি দুর্দ্দশাই হইত! আমরা যেমন দিগন্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র প্রসারিত দেখিতে পাই, কিন্তু সমুদ্রের সীমা সেইখানেই নয়, তাহা অতিক্রম করিয়াও সমুদ্র আছে— তেমনি আমরা যাহাকে স্তব্ধতার দিগন্ত বলি তাহার পরপারেও শব্দের সমুদ্র আছে, তাহা আমাদের শ্রবণের অতীত। পিপীলিকা যখন চলে তখন তাহারো পদশব্দ হয়, ফুল হইতে শিশির যখন পড়ে তখন সেও নীরব অশ্রুজল নহে সেও বিলাপ করিয়া ঝরিয়া পড়ে।

জর্জ এলিয়ট অন্যের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা নিজের সম্বন্ধেও তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেখিব। মনে কর, আমাদের নিজের হৃদয়ের মধ্যে যাহা চলে তাহা সমস্তই আমরা যদি দেখিতে পাইতাম, শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত! জর্জ এলিয়ট দৃষ্টান্তস্বরূপে কাঠবিড়ালীর হৃদয়স্পন্দন ও তৃণ-উদ্ভেদের শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা যদি নিজের দেহের ক্ষীণতম হৃদয়-স্পন্দন, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-পতন, রক্তচলাচলের শব্দ, নখ ও কেশ -বৃদ্ধি, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে দেহায়তনবৃদ্ধির শব্দটুকুও অনবরত শুনিতে পাইতাম, তবে আমাদের কি দশাই হইত! যখন আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছি তখনো আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে অতিপ্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া যে একটি বিষাদ, একটি অভাব নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা যদি শুনিতে পাইতাম তবে কি আর হাসি বাহির হইত? যখন আমরা দান করিতেছি ও সেই সঙ্গে "নিঃস্বার্থ পরোপকার করিতেছি" মনে করিয়া মনে মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তখন যদি আমরা আমাদের সেই পরোপচিকীর্ষার অতি প্রচ্ছন্ন অন্তর্দেশে যশোলিপ্সা বা আর একটা কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ-পরতার বক্রমূর্ত্তি দেখিতে পাই, তবে কি আর আমরা সেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারি? আবার আর এক দিকে দেখ। যেমন, এমন শব্দ আছে যাহা

আমাদের কাছে নিস্তব্ধতা, তেমনি এমন স্মৃতি আছে যাহা আমাদের কাছে বিস্মৃতি। আমরা যাহা একবার দেখিয়াছি, যাহা একবার শুনিয়াছি, তাহা আমাদের হৃদয়ে চিরকালের মত চিহ্ন দিয়া গিয়াছে। কোনটা বা স্পষ্ট, কোনটা বা অস্পষ্ট, কোনটা বা এত অস্পষ্ট যে আমাদের দর্শন শ্রবণের অতীত। কিন্তু আছে। আমাদের স্মৃতিতে যত জিনিষ আছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যে শত সহস্র অচেনা লোককে চলিয়া যাইতে দেখিলাম তাহারা প্রত্যেকেই আমাদের মনের মধ্যে রহিয়া গেল। উপরি উপরি যদি অনেক বার তাহাদের দেখিতাম, তবে তাহারা আমাদের স্মৃতিতে স্পষ্টতর ছাপ দিতে পারিত এই মাত্র। এইরূপে বাল্য-কাল হইতে যাহা কিছু দেখিয়াছি, যাহা কিছু শুনিয়াছি, যাহা কিছু পড়িয়াছি, সমস্তই আমার হৃদয়ে আছে, তিলার্দ্ধও এড়াইতে পারে নাই। ছেলেবেলা হইতে কত গ্রন্থের কত হাজার হাজার পাত পড়িয়াছি, যদিও তাহা আওড়াইতে পারি না কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মুদ্রাকর তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমাদের স্মৃতির পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মনে করিলে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িতে হয়। যদি আমরা আমাদের এই অতিবিশাল স্মৃতির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সমস্ত কণ্ঠস্বর একেবারেই শুনিতে পাইতাম, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতাম না, তাহা হইলে আমরা কি একেবারে পাগল হইয়া যাইতাম না? ভাগ্যে আমাদের স্মৃতি তাহার সহস্র মুখে একেবারে কথা কহিতে আরম্ভ করে না, তাহার সহস্র চিত্র একেবারে উদ্ঘাটন করিয়া দেয় না, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি। আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত কার্য্য দেখিতে পাই না বলিয়াই রক্ষা। আমাদের হৃদয়রাজ্যের অনেক বিস্তৃত প্রদেশ আমাদের নিজের কাছেই যদি অনাবিষ্কৃত না থাকিত, কখন্ আমাদের অনুরাগের প্রথম সূত্রপাত হইল, কখন্ আমাদের অনুরাগের প্রথম অবসানের দিকে গতি হইল, কখন্ আমাদের বিরাগের প্রথম আরম্ভ হইল, কখন্ আমাদের বিষাদের প্রথম অঙ্কুর উঠিল, তাহা সমস্ত যদি আমরা স্পষ্ট দেখিতাম তাহা হইলে আমাদের মায়া মোহ অনেকটা ছুটিয়া যাইত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখশান্তিও অবসান হইত।

শূন্য

এক এক জন লোক আছে, তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে, একটা শূন্য (০) মাত্র, কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি দশ (১০) হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে! সংসারে শত সহস্র 'শূন্য' আছে, বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে— তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না, কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল। এই সকল শূন্যদের এক মহা দোষ এই যে, পরে বসিলে ইহারা ১কে ১০ করে বটে, কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়মানুসারে ১কে তাহার শতাংশে পরিণত করে ('০১) অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারায় চালিত হইলেই চমৎকার কাজ করে বটে, কিন্তু অন্যকে চালনা করিলে সমস্ত মাটি করে। ইহারা এমন চমৎকার সৈন্য যে মন্দ সেনাপতিকেও জিতাইয়া দেয়, কিন্তু এমন খারাপ সেনাপতি যে ভাল সৈন্যদেরও হারাইয়া দেয়। স্ত্রী-মর্য্যাদা-অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন যে, স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১এর সহিত যতক্ষণ তাহারা যুক্ত না হয় ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১কে এমন বলীয়ান করিয়া তুলে যে, সে দশের কাজ করিতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১এর পূর্ব্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১ বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈণ পুরুষের আর এক নাম '০১। কিন্তু এই অযৌক্তিক লোকদের সঙ্গে আমি মিলি না।

স্ত্রৈণ

আমি দেখিতেছি মহিলারা রাগ করিতেছেন, অতএব স্ত্রৈণ কাহাকে বলে তাহার একটা মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। এই কথাটা সকলেই ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহার অর্থ অতি অল্প লোকেই সর্ব্বতোভাবে বুঝেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে কিছু বিশেষরূপ ভালবাসে সাধারণতঃ লোকে তাহাকেই স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রৈণ কে? না, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারে না, স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। বলিষ্ঠ পুরুষ হইয়াও অবলা নারীকে ঠেসান দিয়া থাকে! যে ব্যক্তি পড়িয়া

গেলে স্ত্রীকে ধরিয়া উঠে, মরিয়া গেলে স্ত্রীকে লইয়া মরে; যে ব্যক্তি সম্পদের সময় স্ত্রীকে পশ্চাতে রাখে ও বিপদের সময় স্ত্রীকে সম্মুখে ধরে; এক কথায় যে ব্যক্তি "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ইহাই সার বুঝিয়াছে, সেই স্ত্রৈণ। অর্থাৎ ইহারা সমস্তই উল্টাপাল্টা করে। ইংরাজ জাতিরা স্ত্রৈণের ঠিক বিপরীত। কারণ, তাহারা স্ত্রীকে হাত ধরিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দেয়, স্ত্রীর মুখে আহার তুলিয়া দেয়, স্ত্রীকে ছাতা ধরে ইত্যাদি। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে এতই দুর্ব্বল মনে করে যে, সকল বিষয়েই তাহাদিগকে সাহায্য করে। ইহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রৈণ জাতি মুখে কাপড় দিয়া হাসে ও বলে "ইংরাজেরা কি স্ত্রৈণ। কোথায় গর্ম্মি হইলে স্ত্রী সমস্ত রাত জাগিয়া তাহাকে বাতাস দিবে, না, সে স্ত্রীকে বাতাস দেয়! কোথায় যতক্ষণ না বলিষ্ঠ পুরুষদের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার নিঃশেষ হয় ততক্ষণ অবলা জাতিরা উপবাস করিয়া থাকিবে, না, বলীয়ান্ পুরুষ হইয়া অবলার মুখে আহার তুলিয়া দেয়! ছি ছি, কি লজ্জা! এমন যদি হইল তবে আর বল কিসের জন্ত!"

জমা খরচ

এক গণিত লইয়া এত কথা যদি হইল তবে আরো একটা বলি; পাঠকেরা ধৈর্য্য সংগ্রহ করুন। পাটীগণিতের যোগ এবং গুণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। সংসারের খাতায় আমরা এক একটা সংখ্যা, আমাদের লইয়া অদৃষ্ট অঙ্ক কষিতেছে। কখন বা শ্রীযুক্ত বাবু ৬এর সহিত শ্রীমতী ৩এর যোগ হইতেছে, কখন বা শ্রীযুক্ত ১এর সহিত শ্রীমান ½এর বিয়োগ হইতেছে ইত্যাদি। দেখা যায়, এ সংসারে যোগ সর্ব্বদাই হয়, কিন্তু গুণ প্রায় হয় না। গুণ কাহাকে বলে? না, যোগের অপেক্ষা যাহাতে অধিক যোগ হয়। ৩এ ৩ যোগ করিলে ৬ হয়, ৩এ ৩ গুণ করিলে ৯ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে গুণ করিলে যতটা যোগ করা হয়, এমন যোগ করিলে হয় না। মনোগণিত-শাস্ত্রে প্রাণে প্রাণে গুণে গুণে মিলকে গুণ বলে ও সামান্যতঃ মিলন হইলে যোগ বলে। সামান্যতঃ বিচ্ছেদ হইলে বিয়োগ বলে ও প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ হইলে ভাগ বলে। বলা বাহুল্য গুণে যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ হয়, ভাগে তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিয়োগ হয়। এমন-কি, আমার বিশ্বাস এই যে, অদৃষ্ট পাটীগণিতের যোগ বিয়োগ ও গুণ পর্য্যন্ত শিখিয়াছে, কিন্তু ভাগটা এখনো শিখে নাই, সেইটে কষিতে

অত্যন্ত ভুল করে। মনে কর, ৩কে ২ দিয়া গুণ করিয়া ৬ হইল, সেই ৬কে পুনর্ব্বার ২ দিয়া ভাগ কর, ৩ অবশিষ্ট থাকিবে। তেমনি রাধাকে শ্যাম দিয়া গুণ কর রাধাশ্যাম হইল ; আবার রাধাশ্যামকে শ্যাম দিয়া ভাগ কর, রাধা অবশিষ্ট থাকা উচিত, কিন্তু তাহা থাকে না কেন ? রাধারও অনেকটা চলিয়া যায় কেন ? শ্যামের সহিত গুণ হইবার পূর্ব্বে রাধা যাহা ছিল, শ্যামের সহিত ভাগ হইবার পরেও রাধা কেন পুনশ্চ তাহাই হয় না ? অদৃষ্টের এ কেমনতর অঙ্ক কষা ! হিসাবের খাতায় এই দারুণ ভুলের দরুন ত কম লোকসান হয় না ! প্রস্তাব-লেখক এইখানে একটি বিজ্ঞাপন দিতেছেন। একটি অত্যন্ত দুরূহ অঙ্ক কষিবার আছে, এ পর্য্যন্ত কেহ কষিতে পারে নাই। যে পাঠক কষিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দিব। আমার এই হৃদয়টি একটি ভগ্নাংশ ; আর একটি সংখ্যার সহিত গুণ করিয়া ইহা যিনি পূরণ করিয়া দিবেন তাঁহাকে আমার সর্ব্বস্ব পারিতোষিক দিব।

মনোগণিত

পাটীগণিত, রেখাগণিত ও বীজগণিতের নিয়মসকল পণ্ডিতগণ বাহির করিলেন ; কিন্তু এখনো মনোগণিতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রতিভাসম্পন্ন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, একটা আবিষ্কারের পথ এই "ঊনবিংশ শতাব্দীতেও" গুপ্ত রহিয়াছে। অনেক অশিক্ষিত লোকে যেমন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী ও নিয়ম না জানিয়াও কেবল বুদ্ধি অভ্যাস ও শুভঙ্করের নিয়মে অঙ্ক কষিতে পারে, তেমনি কবিগণ এত কাল ধরিয়া মনোগণিতের অঙ্ক কষিয়া আসিতেছেন। শকুন্তলা কষিতেছেন, হ্যামলেট কষিতেছেন এবং মহাভারত রামায়ণে অঙ্কের স্তূপ কষিতেছেন। এইরূপ করিয়াই, বোধ করি, ক্রমে মনোগণিতের নিয়মসকল বাহির হইবে। ইহা যে নিতান্ত দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য ; ফরাসী জাতি, ইংরাজ জাতি, জর্ম্মান জাতি এই মনোগণিতের এক একটা অঙ্কফল। ঐতিহাসিকগণ, কি কি অঙ্কের যোগে বিয়োগে এই সকল অঙ্কফল হইয়াছে তাহাই কষিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন। কাহারো ভুল হয়, কাহারো ঠিক হয়, কিন্তু এত বড় অঙ্কবিৎ কেহ নাই যে, ঠিক মীমাংসা করিয়া দিতে পারে। আমাদের মধ্যে অদৃশ্য অলক্ষিতভাবে ভিতরে ভিতরে কি কম অঙ্ক-কষাকষি চলিতেছে ! তোমাতে আমাতে মিলন হইল। তোমার

খানিকটা আমাতে আসিল, আমার খানিকটা তোমাতে গেল, আমার একটা গুণ হয়ত হারাইলাম, তোমার একটা গুণ হয়ত পাইলাম ও তাহা আমার আর একটা গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিল। এইরূপে মানুষে মানুষে ও তাহাই শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া সমস্ত জাতিতে ও অবশেষে জাতিতে জাতিতে যোগ গুণ ভাগ বিয়োগ হইয়া মনুষ্যজাতি-নামক একটা অতি প্রকাণ্ড অঙ্ক কষা হইতেছে। বিপ্লব (Revolution)-নাম কবিতায় Matthew Arnold বলেন যে "মানুষ যখন মর্ত্ত্যলোকে আসিবার উদ্যোগ করিল তখন ঈশ্বর তাহাদের হাতে রাশীকৃত অক্ষর দিলেন ও কহিলেন, এই অক্ষরগুলি যথারীতি সাজাইয়া এক একটা কথা বাহির কর। মানুষেরা অক্ষর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সাজাইতে আরম্ভ করিল; "গ্রীস" লিখিল, "রোম" লিখিল, "ফ্রান্স" লিখিল, "ইংলণ্ড" লিখিল। কিন্তু কে ভিতরে ভিতরে বলিতেছে যে, ঈশ্বর যে কথাটি লিখাইতে চান সেটি এখনও বাহির হইল না। এই নিমিত্ত মানুষেরা অসন্তুষ্ট হইয়া এক একবার অক্ষর ভাঙ্গিয়া ফেলে; ইহাকেই বলে বিপ্লব।" কবি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি। আমি বলি কি, ঈশ্বর মর্ত্ত্যভূমির অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে মনুষ্য-নামক কতকগুলি সংখ্যা দিয়াছেন ও পূর্ণ সুখ (যাহার আর এক নাম মঙ্গল)-নামক অঙ্ক-ফল দিয়াছেন। এবং পৃথিবীর পত্রে এই অঙ্কফলটি কষিবার আদেশ দিয়াছেন। সে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই নিতান্ত দুরূহ অঙ্কটি কষিয়া আসিতেছে, এখনো কষা ফুরায় নি, কবে ফুরাইবে কে জানে! তাহার এক একবার যখনি মনে হয় অঙ্কে ভুল হইল, তৎক্ষণাৎ সে সমস্তটা রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলে। ইহাকেই বলে বিপ্লব।

নৌকা

মানুষের মধ্যে এক একটা মাঝি আছে— তাহাদের না আছে দাঁড়, না আছে পাল, না আছে গুণ; তাহাদের না আছে বুদ্ধি, না আছে প্রবৃত্তি, না আছে অধ্যবসায়। তাহারা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া স্রোতের জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। মাঝিকে জিজ্ঞাসা কর, "বাপু, বসিয়া আছ কেন?" সে উত্তর দেয়, "আজ্ঞা, এখনো জোয়ার আসে নাই।" "গুণ টানিয়া চল না কেন?" "আজ্ঞা, সে গুণটি নাই।" "জোয়ার আসিতে আসিতে তোমার কাজ যদি ফুরাইয়া যায়?" "পাল-তুলা, দাঁড়-

টানা অনেক নৌকা যাইতেছে, তাহাদের বরাত দিব।" অন্যান্য চল্‌তি নৌকাসকল অনুগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে কাছি দিয়া পশ্চাতে বাঁধিয়া লয়, এইরূপে এমন শত শত নৌকা পার পায়। সমাজের স্রোত নাকি প্রায় একটানা, বিনাশের সমুদ্রমুখেই তাহার স্বাভাবিক গতি। উন্নতির পথে অমরতার পথে যাহাকে যাইতে হয়, তাহাকে উজান বাহিয়া যাইতে হয়। যেসকল দাঁড় ও পাল -বিহীন নৌকা স্রোতে গা-ভাসান দেয়, প্রায় তাহারা বিনাশসমুদ্রে গিয়া পড়ে। সমাজের অধিকাংশ নৌকাই এইরূপ, প্রত্যহ রাম শ্যাম প্রভৃতি মাঝিগণ আনন্দে ভাবিতেছে, 'যেরূপ বেগে ছুটিয়াছি, না জানি কোথায় গিয়া পৌঁছাইব।' একটি একটি করিয়া বিস্মৃতির সাগরে গিয়া পড়ে ও চোখের আড়াল হইয়া যায়। সমুদ্রের গর্ভে ইহাদের সমাধি, স্মরণস্তম্ভে ইহাদের নাম লিখা থাকে না।

বুদ্ধি খাটাইয়া যাহাদের অগ্রসর হইতে হয় তাহাদের বলে— দাঁড়টানা নৌকা। অত্যন্ত মেহন্নত করিতে হয়, উঠিয়া পড়িয়া দাঁড় না টানিলে চলে না। কিন্তু তবুও অনেক সময়ে স্রোত সামলাইতে পারে না। অসংখ্য দাঁড়ের নৌকা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়াও হটিতে থাকে, অবশেষে টানাটানি করিতে কাহারো বা দাঁড় হাল ভাঙিয়া যায়। সকলের অপেক্ষা ভাল চলে পালের নৌকা। ইহাদের বলে— প্রতিভার নৌকা। ইহারা হঠাৎ আকাশের দিক হইতে বাতাস পায় ও তীরের মত ছুটিয়া চলে। স্রোতের বিরুদ্ধে ইহারাই জয়ী হয়। দোষের মধ্যে যখন বাতাস বন্ধ হয়, তখন ইহাদিগকে নোঙর করিয়া থাকিতে হয়, আবার যখনি বাতাস আসে তখনি যাত্রা আরম্ভ করে। আর একটা দোষ আছে— পালের নৌকা হঠাৎ কাৎ হইয়া পড়ে। পার্থিব নৌকা হাল্কা, অথচ পালে স্বর্গীয় বাতাস খুব লাগিয়াছে, ঝট্ করিয়া উল্টাইয়া পড়ে। কেহ কেহ এমন কথা বলেন যে, সকলেরই কল বাহির হইতেছে, বুদ্ধিরও কল বাহির হইবে, তখন আর প্রতিভার পালের আবশ্যক করিবে না— মনুষ্যসমাজে স্টীমার চলিবে। মানুষ যতদিন অসম্পূর্ণ মানুষ থাকিবে ততদিন প্রতিভার আবশ্যক। যদি কখনো সম্পূর্ণ দেবতা হইতে পারে তখন কি নিয়মে চলিবে, ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রতিভার কল বাহির করিতে পারে, এত বড় প্রতিভা কোথায়?

ফল ফুল

পাঠক-খরিদ্দার লেখক-ব্যাপারীর প্রতি— "কেন হে, আজকাল তোমার এখানে তেমন ভাল ভাব পাওয়া যায় না কেন ?"

লেখক— "মহাশয়, আমার এ ফল ফুলের দোকান। মিঠাই মণ্ডার নহে, যে, নিজের হাতে গড়িয়া দিব। আমার মাথার জমিতে কতকগুলা গাছ আছে। আপনি আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আপনাকে নিয়মিত ফল ফুল যোগাইতে হইবে। কিন্তু ঠিক নিয়ম-অনুসারে ফল ফুল ফলেও না, ফুটেও না; কখন্ ফলে, কখন্ ফুটে বলিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু তাহা করিলে চলে না, আপনি প্রত্যহ তাগাদা করিতে থাকেন, কই হে, ফুল কই, ফল কই ? ফল ধোঁয়া দিয়া বলপূর্ব্বক পাকাইতে হয়, কাজেই আপনারা গাছপাকা ভাবটি পান না। এমন একটা প্রবন্ধ তৈরি হয়, তাহার আঁঠির কাছটা হয়ত টক, খোসার কাছে হয়ত ঈষৎ মিষ্ট; তাহার এক জায়গায় হয়ত থল্‌থোলে, আর এক জায়গায় হয়ত কাঁচা শক্ত। ফুল ছিঁড়িয়া ফোটাইতে হয়; এমন একটা কবিতা তৈরি হয় যাহার ভালরূপ রঙ্ ধরে নাই, গন্ধ জন্মে নাই, পাপ্‌ড়িগুলি কোঁক্‌ড়ানো। রহিয়া বসিয়া কিছু করিতে পারি না, সমস্তই তাড়াতাড়ি করিতে হয়। দেখুন দেখি গাছে কত কুঁড়ি ধরিয়াছে! কি দুঃখ যে, গাছে রাখিয়া ফুটাইতে পারি না! আমাদের দেশীয় কন্যার পিতারা যেমন মেয়েকুঁড়ি গাছে রাখিতে পারেন না, ৮ বৎসরের কুঁড়িটিকে ছিঁড়িয়া বিবাহ দিয়া বলপূর্ব্বক ফুটাইয়া তুলেন ও বেচারীদের বিশ বৎসরের মধ্যে ঝরিয়া পড়িবার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমার বলপূর্ব্বক-ফোটান' কবিতার কুঁড়িগুলিও দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার আর একটা আপ্‌শোষ আছে; আমার যে কুঁড়িগুলি ফুটিল না সেগুলি যদি ফুটিত, যে মুকুলগুলি ঝরিয়া গেল তাহাতে যদি ফল ধরিত, তবে কি কীর্ত্তিই লাভ করিতাম!"

মাছ ধরা

উপরের কথা হইতে একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে। ভাবের সরোবরে আমরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে পারি না; ছিপ ফেলিয়া ধরিতে হয়। মাছ ধরিবার জাল আবিষ্কার হয় নাই; জানি না, কোন কালে হইবে কি না। ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছি, কখন্ মাছ আসিয়া ঠোক্‌রায়; কিন্তু ঠোক্‌রাইলেই হইল না, মাছকে ডাঙায় তোলাই আসল কাজ। জলের মধ্যে অনেক ভাব কিল্‌বিল্ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের ডাঙায় উঠাইয়া তোলা সাধারণ ব্যাপার নহে। ঠোক্‌রাইল, বঁড়শি লাগিল না; বঁড়শি লাগিল, ছিঁড়িয়া পলাইল। অনেক মাছ যতক্ষণ জলে আছে, যতক্ষণ খেলাইতেছি, ততক্ষণ মনে হইতেছে প্রকাণ্ড; তুলিয়া দেখি, যত বড় মনে হইয়াছিল তত বড়টা নয়। ভাব আকর্ষণ করিবার জন্য কত প্রকার চার ফেলিতে হয়, কত কৌশল করিতে হয়, তাহা ভাবব্যবসায়ীরা জানেন। জল নাড়া না পায়, খুব স্থির থাকে; ভাব যখন বঁড়শিবিদ্ধ হইল, তবুও জোর করিতেছে, উঠিতেছে না, তখন যেন অধীর হইয়া টানাহেঁচড়া করিয়া উঠাইবার চেষ্টা না করা হয়— তাহা হইলে সুতা ছিঁড়িয়া যায়— যথেষ্ট খেলাইয়া আয়ত্ত করিয়া তুলিবে। আমরা পরের মনঃসরোবর হইতেও মাছ তুলিয়া থাকি। আমার এক সহচর আছেন, তাঁহার পুষ্করিণী আছে কিন্তু ছিপ নাই। অবসরমত আমি তাঁহার মন হইতে মাছ ধরিয়া থাকি, খ্যাতিটা আমার। নানা প্রকার কথোপকথনের চার ফেলিয়া তাঁহার মাছগুলাকে আকর্ষণ করিয়া আনি ও খেলাইয়া খেলাইয়া জমিতে তুলি।

ইচ্ছার দাম্ভিকতা

এক জন কবি স্মৃতি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, জীবনের প্রতি বিধাতার এ কি অভিশাপ যে, কাহারো প্রতি অনুরাগ বা কোন একটা প্রবৃত্তি ভুলিয়া যাওয়া যখন আমাদের আবশ্যক হয়— মহত্তর উন্নততর প্রশান্ততর কর্ত্তব্য আসিয়া যখন আদেশ করে 'ভুলিয়া যাও'— তখন আমরা ভুলি না; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি দিন, সামান্য ঘটনার তুচ্ছ ধূলিকণাসমূহ আনিয়া আমাদের স্মৃতি ঢাকিয়া দেয় ও অবশেষে আমরা

ভুলি; ভুলিতেই হইবে বলিয়া ভুলি, ভুলিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া ভুলি না।— বাস্তবিক, এ কি দুঃখ! আমরা নিজের মনের উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করিলাম, সে কোন কাজে লাগিল না, আর আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বহিঃস্থিত সামান্য কতকগুলা জড় ঘটনা সেই কাজ সিদ্ধ করিল! একটা কেন, এমন সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এক জন সর্ব্বতোভাবে ভালবাসিবার যোগ্যপাত্র— জানি তাহাকে ভাল বাসিলে সুখী হইব ও আমার সকল বিষয়ে মঙ্গল হইবে— প্রতিনিয়ত ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না। আর এক জনকে ভালবাসিলাম কেন? না, তাহার সঙ্গে কি লগ্নে, কি মাহেন্দ্র ক্ষণে দেখা হইয়াছিল, তাহার কি একটি সামান্য কথার ভাব, কি একটি তুচ্ছ ভাবের আধখানা মাত্র দেখিয়াছিলাম, বলা নাই কহা নাই, ব্যস্তসমস্ত হইয়া একেবারে সমস্ত হৃদয়টা তাহার পায়ের তলায় ফেলিয়া দিলাম। কোন লেখক যখন কেবলমাত্র ইচ্ছাকে ভাব শিকার করিতে পাঠান, তখন ইচ্ছার পায়ের শব্দ পাইলেই ভাবেরা কে কোথায় পলাইয়া যায় তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না ও সমস্ত দিনের পর শ্রান্ত ইচ্ছা তাহার বড় বড় কামান বন্দুক ফেলিয়া কপালের ঘর্ম্মজল মুছিতে থাকে, অথচ কোথা-হইতে-কি-একটা সামান্য বিষয় সহসা ভাসিয়া বিনা আয়াসে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শত সহস্র জীবন্ত ভাব আনিয়া উপস্থিত করে ও ইচ্ছার পশ্চাতে করতালি দিতে থাকে। কবিদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁহাদের কত বড় বড় ভাব দৈবাৎ কথার মিল করিতে গিয়া মনে পড়িয়াছে, ইচ্ছা করিলে মনে পড়িত না। মানুষের অনেক বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ার মূল অনুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে— একটা সামান্য একরত্তি ব্যাপার।

দেখা যাইতেছে আমাদের ইচ্ছা বলিয়া একটা বিষম দাম্ভিক ব্যক্তিকে আমাদের মন-গাঁয়ে অতি অল্প লোকেই মানিয়া থাকে, অথচ সে এক জন আপনি-মোড়ল। ছোট ছোট কতকগুলি সামান্য বিষয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য, অথচ সকলকেই তিনি আদেশ করিয়া বেড়ান। একটা কাজ সমাধা হইলে তিনি জাঁক করিয়া বেড়ান 'এ কাজের কল আমি টিপিয়া দিয়াছিলাম'। অথচ কত ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বিষয় তাঁহার নিজের কল টিপিয়া দিয়াছে তাহার খবর রাখেন না। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে, তিনি দেখিতেছেন দুশ্ছেদ্য লৌহের লাগাম দিয়া সমস্ত কাজকে তিনি চালাইয়া বেড়াইতেছেন, পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন না তাঁহাকে কে মাকড়্সার জালের চেয়ে সূক্ষ্মতর তুচ্ছতর সহস্র সূত্রে বাঁধিয়া নিয়মিত করিতেছে! মনে করিতে কষ্ট হয়— কত অল্প বিষয়ই আমাদের ইচ্ছার অধীন ও কত সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অধীন আমাদের ইচ্ছা!

অভিনয়

এই জন্যই বহুকাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে— আমরা অদৃষ্টের খেলেনা। আমাদের লইয়া সে খেলা করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে, নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। একটা নিয়ম আছে, একটা ফল আছে। অভিনয়ের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের তুলনা পুরাণো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেবল মাত্র সেই অপরাধে সে তুলনাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করা যায় না। অভিনয়ের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের অনেক মিল পাওয়া যায়। প্রত্যেক অভিনেতার অভিনয় আলাদা আলাদা করিয়া দেখিলে সকলি ছাড়া-ছাড়া বিশৃঙ্খল বলিয়া মনে হয়, একটা অর্থ পাওয়া যায় না। তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনলীলা সাধারণ মনুষ্যজীবন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে নিতান্ত অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়, অদৃষ্টের ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা নহে; আমরা একটা মহানাটক অভিনয় করিতেছি, প্রত্যেকের অভিনয়ে তাহার উপাখ্যানভাগ পরিপুষ্ট হইতেছে। এক এক জন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে, নিজের নিজের পালা অভিনয় করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, সে জানে না তাহার ঐ জীবনাংশের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের উপাখ্যানভাগ কিরূপে স্থজিত হইতেছে। সে নিজের অংশটুকু জানে মাত্র; সমস্তটার সহিত যোগটুকু জানে না। কাজেই সে মনে করিল, 'আমার পালা সাঙ্গ হইল এবং সমস্তই সাঙ্গ হইল।'

প্রত্যহ যে শত সহস্র অভিনেতা, সামান্যই হউক আর মহৎই হউক, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছে ও নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, সকলেই সেই মহা-উপাখ্যানের সহিত জড়িত, কেহ অধিক, কেহ অল্প; কেহ বা নিজের অভিনয়াংশের সহিত সাধারণ উপাখ্যানের যোগ কিয়ৎপরিমাণে জানে, কেহ বা একেবারেই জানে না। মনে কর, এই মহা-নাটকের"ফরাসীবিপ্লব"-নামক একটা গর্ভাঙ্ক অভিনয় হইয়া গেল, কত শত বৎসর ধরিয়া কত শত রাজা হইতে কত শত দীনতম ব্যক্তি না জানিয়া না শুনিয়া ইহার অভিনয় করিয়া আসিতেছে; তাহাদের প্রত্যেকের জীবন পৃথক্ করিয়া পড়িলে এক একটি প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সমস্তটা একত্র করিয়া পড়িবার ক্ষমতা থাকিলে প্রকাণ্ড একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নাটক পড়া যায়। একবার কল্পনা করা যাক্, পৃথিবীর বহির্ভাগে দেবতারা সহস্র তারকানেত্র মেলিয়া এই অভিনয় দেখিতেছেন। কি আগ্রহের সহিত তাঁহারা চাহিয়া রহিয়াছেন! প্রতি শতাব্দীর অঙ্কে অঙ্কে উপাখ্যান

একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রতি দৃশ্যপরিবর্ত্তনে তাঁহাদের কত প্রকার কল্পনার উদয় হইতেছে, কত কি অনুমান করিতেছেন! যদি পূর্ব্ব হইতেই এই কাব্য, এই নাটক পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি ব্যগ্রতার সহিত প্রত্যেক অভিনয়ের ফল দেখিবার জন্ম উৎসুক রহিয়াছেন! যেখানে একটা ঔৎসুক্যজনক গর্ভাঙ্ক আসন্ন হইয়াছে, সেইখানে তাঁহারা আগ্রহরুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনে মনে বলিতে থাকেন, এইবার সেই মহা-ঘটনা ঘটিবে। কি মহান্ অভিনয়! কি বিচিত্র দৃশ্য! কি প্রকাণ্ড রঙ্গবেদী!

খাঁটি বিনয়

ভাল জহরী নহিলে খাঁটি বিনয় চিনিতে পারে না। এক দল অহঙ্কারী আছে তাহারা অহঙ্কার করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী, বিস্তর লোকের নিকট হইতে যশের খাজনা আদায় হয়, এই নিমিত্ত তাহাদের বিনয় করিবার উপযুক্ত সম্বল আছে। তাহারা সখ করিয়া বিনয় করিয়া থাকে। বাহিরে নাকি জমিজমা যথেষ্ট আছে, এই জন্ম বাড়ির সমুখে একখানা বিনয়ের বাগান করিয়া রাখে। যে বেচারীর জমিদারী নাই, আধ পয়সা খাজনা মিলে না, সে ব্যক্তি পেটের দায়ে নিজের বাড়ির উঠানে, "অহং"এর বাস্তভিটার উপরে অহঙ্কারের চাষ করিয়া থাকে, তাহার আর সখ করিবার জায়গা নাই। নিজমুখে অহঙ্কার করিলে যে দারিদ্র্য প্রকাশ পায়, সে দারিদ্র্য ঢাকিতে পারে এত বড় অহঙ্কার ইহাদের নাই। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে এক দল সখ করিয়া বিনয়ী, আর এক দল দায়ে পড়িয়া অহঙ্কারী, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্য।

নিজের গুণহীনতার বিষয়ে অনভিজ্ঞ এমন নির্গুণ শতকরা নিরেনব্বই জন, কিন্তু নিজের গুণ একেবারে জানে না এমন গুণী কোথায়? তবে, চব্বিশ ঘণ্টা নিজের গুণগুলি চোখের সামনে খাড়া করিয়া রাখে না এমন বিনয়ী সংসারে মেলে। অতএব কে বিনয়ী? না, যে আপনাকে ভুলিয়া থাকে, যে আপনাকে জানে না, তাহার কথা হইতেছে না।

বড়মানুষ গৃহকর্ত্তা নিমন্ত্রিতদিগকে বলেন, "মহাশয়, দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন; আপনাদিগকে আজ বড় কষ্ট দেওয়া হইল" ইত্যাদি। সকলে বলে,

"আহা মাটির মানুষ!" কিন্তু ইহারা কি সামান্ত অহঙ্কারী! অপ্রস্তুত হইলে লোকে যে কারণে কাঁদে না, হাসে, ইহারাও সেই কারণে বিনয়বাক্য বলিয়া থাকে। ইহারা কোনমতেই ভুলিতে পারে না যে, ইহাদের বাসস্থান প্রাসাদ, কুটীর নহে। এ অহঙ্কার সর্ব্বদাই ইহাদের মনে জাগরূক থাকে। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সারাক্ষণ শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়, পাছে বিনয়ের অভাব প্রকাশ পায়। অভ্যাগত আসিলেই তাড়াতাড়ি ডাকিয়া বলিতে হয়, "মহাশয়, এ কুটীর, প্রাসাদ নহে।" তেমন বৃষ যদি কেহ থাকে তবে এই অহঙ্কারী মশাদের বলে, "বাপু হে, তুমি যে এতক্ষণ আমার শিঙে বসিয়াছিলে, তাহা আমি মূলে জানিতেই পারি নাই, ভোঁ ভোঁ করিতে আসিয়াছ বলিয়া এতক্ষণে টের পাইলাম। তোমার এ বাড়িটা প্রাসাদ কি কুটীর, সে বিষয়ে আমি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিও নাই, আমার নজরেই পড়ে নাই, অতএব ও কথা তুলিবার আবশ্যক কি?" আমাদের দেশে উক্ত প্রকার অহঙ্কারী বিনয়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সুকণ্ঠ বলেন "আমার গলা নাই", সুলেখক বলেন "আমি ছাই ভস্ম লিখি", সুরূপসী বলেন "এ পোড়ামুখ লোকের কাছে দেখাইতে লজ্জা করে"! এ ভাবটা দূর হইলেই ভাল হয়। ইহাতে না অহঙ্কার ঢাকা পড়ে, না সরলতা প্রকাশ হয়! আর, এই সামান্য উপায়েই যদি বিনয় করা যাইতে পারে, তবে ত বিনয় খুব শস্তা!

আসল কথা এই যে, "বিনয়বচন" বলিয়া একটা পদার্থ মূলেই নাই। বিনয়ের মুখে কথা নাই, বিনয়ের অর্থ চুপ করিয়া থাকা। বিনয় একটা অভাবাত্মক গুণ। আমার যে অহঙ্কারের বিষয় আছে এইটে না মনে থাকাই বিনয়, আমাকে যে বিনয় প্রকাশ করিতে হইবে এইটে মনে থাকার নাম বিনয় নহে। যে বলে 'আমি দরিদ্র' সে বিনয়ী নহে; যে স্বভাবতই প্রকাশ করে না যে 'আমি ধনী' সেই বিনয়ী। যাহার বিনয়বাক্য বলিবার আবশ্যক পড়ে না সেই বিনয়ী। তবে কি না, বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে ব্যাকরণ পড়িতে হয়, অভিধান মুখস্থ করিতে হয়; বিনয় যাহাদের পক্ষে বিদেশী, তাহাদিগকে বিনয়ের অভিধান মুখস্থ করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার মুখস্থ বিনয় সংসারের একজামিন পাস করিতেই কাজে দেখে, পরীক্ষাশালার বাহিরে কোন কাজে লাগে না।

ধরা কথা

সমস্ত জীবন যে তত্ত্বগুলিকে জানিয়া আসিতেছি, মাঝে মাঝে তাহাদের এক একবার আবিষ্কার করিয়া ফেলি। তাড়াতাড়ি পাশের লোককে ডাকিয়া বলি, ওহে, আমি এই তত্ত্বটি জানিয়াছি। সে বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, ও ত জানা কথা! কিন্তু ঠিক জানা কথা নয়। তুমি উহা জান বটে, তবুও জান না। একটা তুলনা দিলে স্পষ্ট হইবে। বাতাস সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তথাপি এক জন যদি বলিয়া উঠে 'ওহে, এইখানে বাতাস আছে' তবে তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, তেমনি আমরা যে সকল সাধারণ তত্ত্বের মধ্যে বাস করিয়া থাকি সেই তত্ত্বগুলি অবস্থাবিশেষে এক এক জনের গায়ে লাগে, অমনি সে বলে— অমুক তত্ত্বটি পাইতেছি। এক জন বন্ধু বলিতেছিলেন যে, আজকাল সার্ব্বজনীন-উদারতা (humanity) প্রভৃতি কতকগুলি প্রশস্ত কথা উঠিয়াছে, সহসা মনে হয়, কত কি মূল্যবান্ তত্ত্ব উপার্জন করিতেছি, কিন্তু সে সকল তত্ত্ব বাতাসের মত। বাতাস অত্যন্ত উপকারী পদার্থ বটে, কিন্তু এত সাধারণ যে তাহার কোন মূল্য নাই। তেমনি উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলি বড় বড় তত্ত্ব বটে, কিন্তু এত সাধারণ যে তাহার কোন মূল্য নাই; অথচ আজকাল তাহাদের এমনি বিশেষরূপে উত্থাপিত করা হইতেছে যে, যেন তাহারা কতই অসাধারণ! তাঁহার কথাটা ঠিক মানি না। মহাত্মাদিগের "বসুধৈব কুটুম্বকং" এ কথাটি সকলেই জানেন, অথচ সকলের গায়ে লাগে না। এ তত্ত্বটি মাঝে মাঝে এক এক জনের গায়ে প্রবাহিত হয় অমনি সে বসুধৈব কুটুম্বকং প্রচার করিয়া বেড়ায়। পুরাণো-কথা ধরা-কথা পারতপক্ষে কেহ বলিতে চাহে না; অতএব পুরাণো কথা যখন কাহারো মুখে শুনা যায়, তখন বিবেচনা করা উচিত— সে তাহা জানিত বটে কিন্তু আজ নূতন পাইয়াছে, আমাদের ভাগ্যে এখনো তাহা ঘটে নাই। অনেক "উড়ো-কথা"র অপেক্ষা ধরা-কথাকে আমরা কম জানি। আমরা নিজের চোক দেখিতে পাই না, দর্পণ পাইলেই দেখিতে পাই; ধরা-কথা ধরিতে পারি না, বিশেষ অভিজ্ঞতা পাইলে ধরি। অতএব যাহারা জানা-কথা জানে, তাহারা সাধারণের চেয়ে অধিক জানে।

অন্ত্যেষ্টিসংকার

ইংরাজশাসন-বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন— দেখ দেখি ইংরাজের কি অন্যায়! প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া তাহার সভ্যতা; ভারতবর্ষের বিষয় পাইয়া সে ধনী; অথচ সেই ভারতবর্ষের প্রতি তাহার কি অন্যায় ব্যবহার! আমার বক্তব্য এই যে, তাহারা ত ঠিক উত্তরাধিকারীর মত কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের মুখাগ্নি করিতেছে, ভারতবর্ষের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আরও কি চাও! ভূত ভারতবর্ষ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপদ্রব করিতেছিল, তখন বড় বড় কামান-গোলার পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে। তাহা ছাড়া শাস্ত্রে বলে, নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করিয়া লোকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। চিত্রগুপ্তের ছোট-আদালত হইতে এ ঋণের জন্য ইংরাজের নামে বোধ করি কোনো কালে ওয়ারেণ্ট্ বাহির হইবে না। যে দেশে, যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ পাইয়াছে, Jane Cow (John Bullএর স্ত্রীলিঙ্গ) সেইখানেই নিজের সন্তানগুলিকে চরাইয়া ও পরের সন্তানগুলিকে গুঁতাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব উত্তরাধিকারীর ও পূর্ব্বপুরুষের কর্ত্তব্য-সাধনে তাহাদের কোন প্রকার শৈথিল্য লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নালিশ কি লইয়া?

দ্রুত বুদ্ধি

অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকদের অনেকের সহসা নির্ব্বোধ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। তাহার কারণ— বুঝিবার পদ্ধতিকে, বুঝিবার ক্রম-বিশিষ্ট সোপানগুলিকে অনেকে বুঝা মনে করেন। এই উভয়কে তাঁহারা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারেন না, একত্র করিয়া দেখেন। যাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যুতের মত, বজ্রবেগে যাঁহাদের মাথায় ভাব আসিয়া পড়ে, যাঁহাদের বুঝার সোপান দেখা যায় না, কঙ্কাল দেখা যায় না, ইঁট ও মালমসলাগুলা দেখা যায় না, কেবল বুঝাটাই দেখা যায়, সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের নির্ব্বোধ মনে করে, কারণ তাহারা তাঁহাদের বুঝাকে বুঝিতে পারে না। যাদুকরেরা যাহা করে, তাহা যদি আস্তে আস্তে করে, তাহার প্রতি অঙ্গ যদি দেখাইয়া দেখাইয়া করে, তবে দর্শক বেচারীরা সমস্ত বুঝিতে পারে।

নহিলে তাহাদের ভেবাচেকা লাগিয়া যায়, কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে না ও সমস্তই ইন্দ্রজাল বলিয়া ঠাহরায়। অসাধারণ বুদ্ধির এক দোষ এই যে, সে বুঝিতে যেমন পারে বুঝাইতে তেমন পারে না। বুঝাইবে কিরূপে বল? নিজে সে একটা বিষয় এত ভাল জানে ও এত সহজে জানে যে, তাহাকেও আবার কি করিয়া সহজ করিতে হইবে ভাবিয়া পায় না। ইহারা আপনাকে অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ না করিয়া ফেলিলে অন্যকে বুঝাইতে পারে না। ইহাদের বুদ্ধি একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবামাত্র আবার তাহাকে সেখান হইতে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিতে হয়; যে পথ দিয়া বিদ্যুৎবেগে সে সেই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই পথ দিয়া অতি ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হয়; সে ব্যক্তি অভ্যাসদোষে মাঝে মাঝে ছুটিয়া চলিতে চায়, অমনি তাহাকে পাকড়া করিয়া বলিতে হয়—"আস্তে!" কেহ বা ইচ্ছা করিলে এইরূপ নির্ব্বোধ হইতে পারে, কেহ বা পারে না। অনেকের বুদ্ধি কোন মতেই রাশ মানে না, তাহাকে আস্তে চালাইবার সাধ্য নাই। এইরূপ লোকদের নির্ব্বোধ লোকেরা নির্ব্বোধ মনে করে। যাহারা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়-টানা নৌকায় যায়, তাহারা প্রতি ঝাঁকানিতে প্রতি দাঁড়ের শব্দে বুঝিতে পারে যে, নৌকা অগ্রসর হইতেছে। যাহারা পালের নৌকায় চলে, তাহারা সকল সময়ে বুঝিতে পারে না নৌকা চলিতেছে কি না।

লজ্জাভূষণ

সামাজিক লজ্জা বা অপরাধের লজ্জার কথা বলিতেছি না—আমি যে লজ্জার কথা বলিতেছি, তাহাকে বিনয়ের লজ্জা বলা যায়। তাহাই যথার্থ লজ্জা, তাহাই শ্রী। তাহার একটা স্বতন্ত্র নাম থাকিলেই ভাল হয়।

সম্বাদপত্রে দোকানদারেরা যেরূপ বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, যে ব্যক্তি নিজেকে সমাজের চক্ষে সেইরূপ বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেয়, সংসারের হাটে বিক্রেয় পুঁতুলের মত সর্বাঙ্গে রঙ্‌চঙ্‌ মাখাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, "আমি" বলিয়া দুটা অক্ষরের নামাবলী গায়ে দিয়া রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়াইতে পারে, সেই ব্যক্তি নির্লজ্জ। সে ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্র পেখমটি প্রাণপণে ছড়াইতে থাকে, যাহাতে করিয়া জগতের আর সমস্ত দ্রব্য তাহার পেখমের আড়ালে পড়িয়া যায় ও দায়ে পড়িয়া লোকের চক্ষু

তাহার উপরে পড়ে। সে চায়— তাহার পেখমের ছায়ায় চন্দ্রগ্রহণ হয়, সূর্য্যগ্রহণ হয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহণ লাগে। যে লোক গায়ে কাপড় দেয় না তাহাকে সকলে নির্লজ্জ বলিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি গায়ে অত্যন্ত কাপড় দেয় তাহাকে কেন সকলে নির্লজ্জ বলে না? যে ব্যক্তি রঙ্‌চঙে কাপড় পরিয়া হীরা জহরতের ভার বহন করিয়া বেড়ায়, তাহাকে লোকে অহঙ্কারী বলে। কিন্তু তাহার মত দীনহীনের আবার অহঙ্কার কিসের? যত লোকের চক্ষে সে পড়িতেছে তত লোকের কাছেই সে ভিক্ষুক। সে সকলের কাছে মিনতি করিয়া বলিতেছে, "ওগো, এই দিকে! এই দিকে! আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ!" তাহার রঙ্‌চঙে কাপড় গলবস্ত্রের চাদরের অপেক্ষা অধিক অহঙ্কারের সামগ্রী নহে।

আমাদের শাস্ত্রে যে বলিয়া থাকে "লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ" সে কি ভাসুরের সাক্ষাতে ঘোমটা দেওয়া, না, শ্বশুরের সাক্ষাতে বোবা হওয়া? "লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ" বলিলে বুঝায়, অধিক ভূষণ না পরাই স্ত্রীলোকের ভূষণ। অর্থাৎ লজ্জাভূষণ গায়ে পরিলে শরীরে অন্য ভূষণের স্থান থাকে না। দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের অন্য সকল ভূষণই আছে, কেবল লজ্জাভূষণটাই কম। রঙচঙ করিয়া নিজেকে বিক্রেয় পুত্তলিকার মত সাজাইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের অত্যন্ত অধিক। লজ্জার ভূষণ পরিতে চাও ত রঙ মোছ, শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর, ময়ূরের মত পেখম তুলিয়া বেড়াইও না। উষা কিছু অন্তঃপুরবাসিনী মেয়ে নয়, তাহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ হয়। কিন্তু সে এমনি একটি লজ্জার বস্ত্র পরিয়া, নিরলঙ্কার শুভ্র বসন পরিয়া, জগতের সমক্ষে প্রকাশ পায় ও তাহাতে করিয়া তাহার মুখে এমনি একটি পবিত্র বিমল প্রশান্ত শ্রী প্রকাশ পাইতে থাকে যে, বিলাস-আবেশ-ময় প্রমোদ-উচ্ছ্বাস উষার ভাবের সহিত কোন মতে মিশ খায় না— মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জা কেবল মাত্র ভূষণ নহে, ইহা তাহাদের বর্ম্ম।

ঘর ও বাসাবাড়ি

দশের চোখের উপরে যে দিনরাত্রি বাস করিতে চাহে, পরের চোখের উপরেই যাহার বাড়ি ঘর, তাহার আর নিজের ঘর বাড়ি নাই। সেই জন্যই সে রঙচঙ দিয়া

পরের চোখ কিনিতে চায়, সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইলেই সে ব্যক্তি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারা বাসাড়ে লোক, খামখেয়ালী ঘরওয়ালা উচ্ছেদ করিয়া দিলে ইহাদের আর দাঁড়াইবার জায়গা থাকে না। কিন্তু ভাবুক লোকদিগের নিজের একটা ঘরবাড়ি আছে, পরের চোখ হইতে বিদায় হইয়া তাহার সেই নিজের ঘরের মধ্যে আসিলেই সে যেন বাঁচে। ভাবুক লোকেরা যথার্থ গৃহস্থ লোক। আর যাহারা নিজের মনের মধ্যে আশ্রয় পায় না, তাহারা কাজেই পরের চক্ষু অবলম্বন করিয়া থাকে ও রঙচঙ মাখিয়া পরের চক্ষুর খোশামোদ করিতে থাকে। ভাবুকদিগের নিজের মনের মধ্যে কি অটল আশ্রয় আছে! এই জন্যই দেখা যায়, ভাবুক লোকেরা বাহিরের লোকজনের সহিত বড় একটা মিশিতে পারেন না, কণ্ঠাগ্র ভদ্রতার আইন কানুনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন না। যেখানে চল্লিশ জন অলস ভাবে হাসিতেছে সেখানে তিনি একচল্লিশ হইয়া তাহাদের সহিত একত্রে দন্ত বিকাশ করিতে পারেন না। দশ ব্যক্তির মধ্যে একাদশ হইবার ঐকান্তিক বাসনা তাঁহার নাই।

নিরহঙ্কার আত্মম্ভরিতা

কেনই বা থাকিবে? তিনি নিজের কাছে নিজে সর্ব্বদাই সম্ভ্রমে নত হইয়া থাকেন। তাঁহার নিজের সহচর নিজেই। অত বড় সহচর দশের মধ্যে কোথায় মিলিবে! প্রতিভা যখন মুহূর্ত্ত কালের জন্য অতিথি হইয়া এক জন কবিকে বীণা করিয়া তাঁহার তন্ত্রী হইতে সুর বাহির করিতে থাকে তখন তিনি নিজের সুর শুনিয়া নিজে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বাল্মীকি তাঁহার নিজের রচিত রামকে যেমন ভক্তি করিতেন এমন কোন ভক্ত করেন না এবং যতক্ষণ তিনি রামের চরিত্র সৃজন করিতেছিলেন ততক্ষণ তিনি নিজেই রাম হইয়াছিলেন ও তাঁহার নিজের মহান্ ভাবে নিজেই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা নিজেকে নিজেই ভক্তি করিতে পারেন, নিজের সাহচর্য্যে নিজে সুখ ভোগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর দশ জনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয় না। এক কথায়— যাঁহারা একলা থাকেন তাঁহারা আর পরের সহিত মিশিবার অবসর পান না। ইহাকেই বলে অহঙ্কারবিবর্জ্জিত আত্মম্ভরিতা।

আত্মময় আত্মবিস্মৃতি

কিন্তু ইহা বলিয়া রাখি, ভাবুক লোকদিগের নিজের প্রতি মনোযোগ দিবার যেমন অল্প অবসর ও আবশ্যক আছে, এমন আর কাহারো নহে। যাহাদের পরের সহিত মিশিতে হয় তাহাদের যেমন চব্বিশ ঘণ্টা নিজের চর্চ্চা করিতে হয়, এমন আর কাহাকেও না। তাহাদের দিনরাত্রি নিজেকে মাজিতে-ঘষিতে সাজাইতে-গোজাইতে হয়। পরের চোখের কাছে নিজেকে উপাদেয় করিয়া উপহার দিতে হয়। এইরূপে যাহারা পরের সহিত মেশে, নিজের সহিত তাহাদের অধিকতর মিশিতে হয়। ইহারাই যথার্থ আত্মম্ভরি। ভাবুকগণ কবিগণ সর্ব্বদাই নিজেকে ভুলিয়া থাকেন। কারণ তাঁহাদের নিজেকে মনে করাইয়া দিবার জন্ম পর কেহ উপস্থিত থাকে না। নিজের সহিত ব্যতীত আর কাহারো সহিত ইঁহারা ভাল করিয়া মেশেন না বলিয়া ইঁহারা নিজের কথা ভাবেন না। ইঁহারাই যথার্থ আত্মময় আত্ম-বিস্মৃত।

ছোট ভাব

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রাণপণ চেষ্টা এই যে, কিছুই ফেলা না যায়, সকলই কাজে লাগে। মনোবিজ্ঞান একটা ক্ষুদ্র বালকের, একটা বদ্ধ পাগলের, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম চিন্তা খেয়াল মনোভাব সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়— কাজে লাগিবে। সমাজ-বিজ্ঞান, শিশু সমাজের, অসভ্য সমাজের, প্রত্যেক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান, অর্থহীন প্রথা, পুঁথিতে জমা করিয়া রাখিতেছে— কাজে লাগিবে। এখনকার কবিরাও এমন সকল ক্ষুদ্র যৎসামান্ত বিষয়গুলিকে কবিতায় পরিণত করেন, যাহা প্রাচীন লোকেরা গল্পেরও অনুপযুক্ত মনে করিতেন।

এখনকার শিল্পেও, যাহা সাধারণ লোকে অনাবশ্যক পুরাণ' গলিত বলিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহাও একটা না একটা কাজে খাটিয়া যাইতেছে।

আমরা যখন বেড়াইতেছি, শুইয়া আছি, আহার করিতেছি, সংসারের ছোট-খাট খুঁটিনাটি কাজ সমাধা করিতেছি, তখন আমাদের মনের মধ্যে কত শত খুচরা বাজে ভাব আনাগোনা করিতে থাকে, সেগুলিকে আমরা নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া

আবর্জ্জনা মনে করিয়া ফেলিয়া দিই। খুব একটা দীর্ঘপ্রস্থ ভাব নহিলে আমরা তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করি না। আমরা আমাদের মনের মধ্যে যে জাল পাতিয়া রাখি তাহা বড় মাছ ধরিবার জাল; ছোট ছোট মাছেরা তাহার ছিদ্রের মধ্য দিয়া গলিয়া পালাইয়া যায়। কিন্তু এমনতর অমনোযোগিতা একালের রীতি-বহির্ভূত। ঐ ছোট ভাব ধরিয়া জিয়াইয়া রাখিলে কত বড় হইত কে বলিতে পারে। একবার হাতছাড়া হইলে বড় হইয়া আবার যে তোমাকে ধরা দিবে তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। তাহা ছাড়া, আয়তন লইয়া আবশুক স্থির করে বালকেরা। সমাজের যতই বয়স বাড়িতেছে ততই এ বিষয়ে তাহার উন্নতি দেখা যাইতেছে। আমার একটি বন্ধু আছেন, তিনি অতি সাবধানে তাঁহার মনের দ্বার আগলাইয়া বসিয়া আছেন, যখনি ভাব আসে তখনি পাকড়া করেন, তাহাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখেন; ভাবিতে থাকেন, ইহাকে কোন প্রকারে মাজিয়া ঘষিয়া ছাঁটিয়া বাড়াইয়া কমাইয়া অক্ষরে লিখিবার উপযোগী করিতে পারি কি না। এই উপায়ে ইঁহার এমনি হাত পাকিয়া গিয়াছে যে, তুমি যে ভাব ব্যবহার করিয়া বা ব্যবহারের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেও, তাহাই লইয়া দুই দণ্ডের মধ্যে ইনি ব্যবহারের জিনিষ বা ঘর সাজাইবার খেলেনা গড়িয়া দিতে পারেন। লোকের অব্যবহার্য্য ভাঙ্গাকাঁচের টুকরা কুড়াইয়া কারিগরেরা ফানুষ গড়ে, ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া লইয়া কাগজ গড়ে। আমার বন্ধুর প্রবন্ধগুলি সেইরূপ। তাহাদের মূল উপকরণ অনুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে ভাবের আবর্জ্জনা, ছিন্ন টুকুরা, অব্যবহার্য্য চিন্তাখণ্ড লইয়া সমস্ত গড়িয়াছেন।

সকলের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, কোন ভাব বিবেচনা না করিয়া যেন ফেলা না যায়। অনবরত এইটে যেন মনে করেন, এ ভাবটাকে কোন প্রকারে লিখিয়া ফেলিতে পারি কি না! যাহা কিছু মনে আসে সমস্ত ভাব লিখিয়া রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব অবিরত যেন হাতুড়ি, বাটালি, পালিশ করিবার যন্ত্রাদি হাতের কাছে মজুত থাকে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আমাদের মনে যত প্রকার ভাব উঠে সকলগুলিই লিখিবার উপযুক্ত। কিন্তু অতবড় লেখক হইবার উপযুক্ত প্রতিভা আমাদের নাই। বড় বড় কবিদিগের লেখা দেখিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ে এই বলিয়া আশ্চর্য্য হই যে, "এ ভাবটা আমার মনে কত শতবার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু আমি ত স্বপ্নেও মনে করি নাই এ ভাবটাও আবার এমন চমৎকার করিয়া লেখা যায়!" অনেকের মনে ভাব আছে, অথচ ভাব ধরা দেয় না, ভাব পোষ মানে না; ভাবের ভাব বুঝিতে পারা যায় না। আইস, আমরা অনবরত বুঝিতে চেষ্টা করি। মনোরাজ্যে এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া লই যে, বাজে খরচ

না হয়। কাহারো কি আশ্চর্য্য মনে হয় না যে কেবল মাত্র বেবন্দোবস্তের দরুন প্রত্যহ কত হাজার হাজার ভাব নিষ্ফল খরচ হইয়া যাইতেছে। তাহার হিসাব পর্য্যন্ত রাখা হইতেছে না। এক জন লেখক ও এক জন অলেখকের মধ্যে শুদ্ধ কেবল এই বন্দোবস্তের প্রভেদ লইয়া প্রভেদ। এক জন তাঁহার ভাব খাটাইয়া কারবার করেন, আর এক ব্যক্তির এই ভাবের টাকাকড়ির বিষয়ে এমনি গোলমেলে মাথা, যে কোন্ দিক্ দিয়া যে সমস্ত খরচ হইয়া যায়, উড়িয়া যায়, তাহার ঠিকানা করিতে পারেন না!

জগতের জন্ম-মৃত্যু

কত অসংখ্য কত বিচিত্র জগৎ আছে, তাহা একবার মনোযোগপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখা হউক দেখি! আমার কথা হয়ত অনেকে ভুল বুঝিতেছেন। অনেকে হয়ত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র একটি একটি গণনা করিয়া জগতের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু আমি আর এক দিক হইতে গণনা করিতেছি। জগৎ একটি বই নয়। কিন্তু প্রতি লোকের এক একটি যে পৃথক্ জগৎ আছে, তাহাই গণনা করিয়া দেখ দেখি! কত সহস্র জগৎ! আমি যখন রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছি তখন কেন জ্যোৎস্নার মুখ ম্লান হইয়া যায়, উষার মুখেও শ্রান্তি প্রকাশ পায়, সন্ধ্যার হৃদয়েও অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে? অথচ সেই মুহূর্ত্তে কত শত লোকের কত শত জগৎ আনন্দে হাসিতেছে! কত শত ভাবে তরঙ্গিত হইতেছে! না হইবে কেন? আমার জগৎ যতই প্রকাণ্ড, যতই মহান্ হউক না কেন, "আমি" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকণার উপর তাহার সমস্তটা গঠিত। আমার সহিত সে জন্মিয়াছে, আমার সহিত সে লয় পাইবে। সুতরাং আমি কাঁদিলেই সে কাঁদে, আমি হাসিলেই সে হাসে। তাহার আর কাহাকেও দেখিবার নাই, আর কাহারও জন্য ভাবিবার নাই। তাহার লক্ষ তারা আছে, কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য। এক জন লোক যখন মরিয়া গেল, তখন আমরা ভাবি না যে একটি জগৎ নিভিয়া গেল। একটি নীলাকাশ গেল, একটি সৌর-পরিবার গেল, একটি তরুলতাপশুপক্ষী-শোভিত পৃথিবী গেল।

অসংখ্য জগৎ

উপরের কথাটাকে আরো একটু বিস্তৃত করা যাক। একজন লোক মরিয়া গেল, আমরা সাধারণতঃ মনে করি সেই গেল, তাহার সহিত আর কিছু গেল না। এরূপ ভ্রমে পড়িবার প্রধান কারণ এই যে, আমরা সচরাচর মনে করি যে, সেও যে জগতে আছে আমরাও সেই জগতে আছি, সেও যাহা দেখিতেছে আমরাও তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু সেই অনুমানটাই ভ্রম নাকি, এই নিমিত্ত সমস্ত যুক্তিতে ভ্রম পৌঁছিয়াছে। সে যাহা দেখিতেছে আমরা তাহা দেখিতেছি না, সে যেখানে আছে আমরা সেখানে নাই। সে দেখিতেছে, ভাগীরথী পতিমিলনাশয়ে চঞ্চলা যুবতীর ন্যায় নৃত্য করিতেছে, গান গাইতেছে; আমি দেখিতেছি ভাগীরথী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় তটভূমিকে স্তনপান করাইতেছেন, তরঙ্গহস্তে অনবরত তাহার ললাটে অভিঘাত করিয়া কলকণ্ঠে বৈচিত্র্যহীন ঘুম পাড়াইবার গান গাহিতেছেন। উভয় জগতের উভয় জাহ্নবীর মধ্যে এত প্রভেদ। ঐই প্রকার, যত লোক আছে সকল লোকেরই জগৎ স্বতন্ত্র। লোক অর্থে, মনুষ্যবিশেষ এবং লোক অর্থে জগৎ বুঝায়। অর্থাৎ একজন মনুষ্য বলিলে একটি জগৎ বলা হয়। আমি কে? না, আমি যাহা কিছু দেখিতেছি— চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ইত্যাদি— সমস্ত লইয়া একজন। তুমিও তাহাই। অতএব প্রতি লোকের সঙ্গে সঙ্গে শত শত চন্দ্র সূর্য্য জন্মগ্রহণ করে ও শত শত চন্দ্র সূর্য্য মরিয়া যায়। অতএব দেখ, জগৎ যেমন অসংখ্য তেমনি বিচিত্র। কাহারো জগতে সূর্য্যোদয় আছে, আঁধারের অপগমন ও আলোকের আগমন আছে, কিন্তু প্রভাত নাই। সে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়-রূপ একটা ঘটনা দেখিতে পায় বটে, কিন্তু প্রভাত দেখিতে পায় না। প্রভাতশিশির, প্রভাতসমীরণ, প্রভাতমেঘমালা, প্রভাত-অরুণরাগের সামঞ্জস্য দেখিতে পায় না; সুতরাং তাহার জগতে প্রভাত ব্যতীত প্রভাতের আর সমস্তই আছে। কাহারো বা প্রভাত আছে, সন্ধ্যা নাই। বসন্ত আছে, শরৎ নাই। কাহারো জ্যোৎস্না হাসে, কাহারো জ্যোৎস্না কাঁদে। কাহারো জগতে টাকার ঝম্‌ঝম্ ব্যতীত সঙ্গীত নাই, মলের ঝম্‌ঝম্ ব্যতীত কবিতা নাই, উদরের বাহিরে সুখ নাই, ইন্দ্রিয়ের বাহিরে অস্তিত্ব নাই। এমন কত কহিব! এ সকল ত স্পষ্ট প্রভেদ; সূক্ষ্ম প্রভেদ কত আছে, তাহার নাম কে করিবে?

জগতের জমিদারী

তুমি জমি কিনিতেই ব্যস্ত, জগতের জমিদারী বাড়াইতে মন দাও না কেন? তুমি ত মস্ত ধনী, তোমার অপেক্ষা একজন কবি ধনী কেন? তোমার জগতের অপেক্ষা তাঁহার জগৎ বৃহৎ। অত বড় জমি কাহার আছে? তিনি যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তোমার জগতের মানচিত্রে উত্তরে আফিসের দেয়াল, দক্ষিণে আফিসের দেয়াল, পূর্ব্বেও তাহাই, পশ্চিমেও তাহাই। কবিদিগের কাছে, জ্ঞানীদিগের কাছে বিষয়কর্ম্ম শেখ। তোমার জগৎ-জমিদারীর সীমা বাড়াইতে আরম্ভ কর। আফিসের দেয়াল অতিক্রম করিয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাও, দিগন্ত অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত বেষ্টন কর, পৃথিবী অতিক্রম করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলে যাও এবং সমস্ত জগৎ অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে সীমা অগ্রসর করিতে থাক। আমি ত দেখিতেছি তোমার যতই জমি বাড়িতেছে ততই জগৎ কমিতেছে। এ যে ভয়ানক লোকসানের লাভ!

অল্প দিন হইল আমার এক বন্ধু গল্প করিতেছিলেন, যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন—জগৎ নিলাম হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য বিকাইয়া যাইতেছে। বোধ করি যেন এমন নিলাম হইয়া থাকে। ভাবুকগণ বুঝি পূর্ব্বজন্মে চড়া দামে চন্দ্র সূর্য্য তারা বসন্ত মেঘ বাতাস কিনিয়াছিলেন, আর আমরা একটা স্থূল-উদর স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলবুদ্ধি লইয়া নিজের ভারে এমনি অবনত হইয়া পড়িয়াছি, যে, ইহার উপরে এই সাড়ে তিন হস্তের বহির্ভূত আর কিছু চাপাইবার ক্ষমতা নাই। নিজের বোঝা যতই ভারী বোধ হইতেছে ততই আপনাকে ধনী মনে করিতেছি। ইহা দেখিতেছি না কত লোক জগতের বোঝা অবলীলাক্রমে বহন করিতেছেন।

প্রকৃতি পুরুষ

জগৎসৃষ্টির যে নিয়ম, আমাদের ভাবসৃষ্টিরও সেই নিয়ম। মনোযোগ করিয়া দেখিলে দেখা যায় আমাদের মাথার মধ্যে প্রকৃতি পুরুষ দুই জনে বাস করেন। এক জন ভাবের বীজ নিক্ষেপ করেন, আর এক জন তাহাই বহন করিয়া, পালন

করিয়া, পোষণ করিয়া তাহাকে গঠিত করিয়া তুলেন। এক জন সহসা একটা সুর গাহিয়া উঠেন, আর এক জন সেই সুরটিকে গ্রহণ করিয়া, সেই সুরকে গ্রাম করিয়া, সেই সুরের ঠাটে তাঁহার রাগিণী বাঁধিতে থাকেন। এক জন সহসা একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র নিক্ষেপ করেন, আর এক জন সেই স্ফুলিঙ্গটিকে লইয়া ইন্ধনের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া তাহাকে আগুন করিয়া তোলেন।

এমন অনেক সময় হয়, যখন আমাদের হৃদয়ে একটি ভাবের আদিম অস্ফুট মূর্ত্তি দেখা দেয়, মুহূর্তের মধ্যেই তাহাকে হয়ত বিসর্জন দিয়াছি, তাহাকে হয়ত বিস্মৃত হইয়াছি, আমাদের চেতনার রাজ্য হইতে হয়ত সে একেবারে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে— অবশেষে বহুদিন পরে এক দিন সহসা সেই বিস্মৃত পরিত্যক্ত অস্ফুট ভাব, পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া আমাদের চিত্তে বিকশিত হইয়া উঠে। সেই উপেক্ষিত ভাবকে এত দিন আমাদের ভাবরাজ্যের প্রকৃতি যত্নের সহিত বহন করিতেছিলেন, পোষণ করিতেছিলেন, বুকে তুলিয়া লইয়া স্তন দান করিতেছিলেন, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতেও পাই নাই, জানিতেও পারি নাই। তেমনি আবার এমন অনেক সময় হয় যখন আমাদের মনে হয় একটি ভাববিশেষ এই মাত্র বুঝি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইল, আমাদের হৃদয়রাজ্যে এই বুঝি তার প্রথম পদার্পণ, কিন্তু আসলে হয়ত আমরা ভুলিয়া গেছি, কিম্বা হয়ত জানিতেও পারি নাই, কখন্ সেই ভাবের প্রথম অদৃশ্য বীজ আমাদের হৃদয়ে রোপিত হয়— কিছু কাল পরিপুষ্ট হইলে তবে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরা জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের নিজ-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম বৃত্তিটি পর্য্যন্ত, কোন পদার্থের আদি মুহূর্ত্ত জানিতে পারি না, আমাদের নিজের ভাবের আরম্ভও আমরা জানিতে পারি না— আমাদের চক্ষে যখন কোন পদার্থের আরম্ভ প্রতিভাত হইল তাহার পূর্ব্বেও তাহার আরম্ভ হইয়াছিল। এই জন্যই বুঝি আমাদের মর্ত্ত্য-হৃদয়ের স্বভাব আলোচনা করিয়া আমাদের পুরাতন ঋষিগণ সন্দেহ-আকুল হইয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"অথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।"

কে জানে কি হইতে ইহা হইল। এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি করে নাই। যিনি ইহার অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে আছেন তিনি ইহা জানেন, অথবা জানেন না!

ঋষিদের সন্দেহ হইতেছে যে, যিনি ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও হয়ত জানেন

না কোথায় এই সৃষ্টির আরম্ভ। কেননা, ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্তা মানবেরাও জানে না তাহাদের নিজের ভাবের আরম্ভ কোথায়, আদি কারণ কি।

এইরূপে সংসারের কোলাহলের মধ্যে, কাজকর্ম্মের মধ্যে, কত শত ভাব আমরা অদৃশ্য অলক্ষিত ভাবে নিঃশব্দে বহন করিয়া পোষণ করিয়া বেড়াইতেছি, আমরা তাহার অস্তিত্বও জানি না। হয়ত এই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে এমন একটি ভাবের বীজ নিক্ষিপ্ত হইল যাহা অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত পরিপুষ্ট হইয়া নদীতীরস্থ দৃঢ়বদ্ধমূল বৃক্ষের ন্যায় নিজের অবস্থানভূমিকে প্রখর কালস্রোতের হস্ত হইতে বহু সহস্র বৎসর রক্ষা করিবে, যাহা তাহার ঘনপল্লব শাখার অমরচ্ছায়ায় আমার নামকে বহু সহস্র বৎসর জীবিত করিয়া রাখিবে, অথচ আমি তাহার জন্মদিন লিখিয়া রাখিলাম না, তাহার জন্মমুহূর্ত্ত জানিতেও পারিলাম না, তাহার জন্মকালে শঙ্খও বাজিল না, হুলুধ্বনিও উঠিল না। আমরা যখন আহার করি তখন আমরা জানিতে পারি না, আমাদের সেই খাদ্যগুলি জীর্ণ হইয়া রক্তরূপে কত শত শিরা উপশিরায় প্রধাবিত হইতেছে। তেমনি একজন ভাবুক যখন তাঁহার শত শত ভাব মস্তকে বহন করিয়া বিহঙ্গকূজিত ফুল্লপুষ্প শ্যামশ্রী বনের মধ্যে সূর্য্যালোকে বিচরণ করিতেছেন ও স্বভাবের শোভা উপভোগ করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাবরাজ্যের প্রকৃতিমাতা সেই সূর্য্যালোক সেই বনের শোভাকে রক্তরূপে পরিণত করিয়া অলক্ষিতভাবে তাঁহার শত সহস্র ভাবের শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত করাইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন না। যখন আমি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখি তখন আমি ভাবি যে, হয়ত ইনি এই মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ শতাব্দীকে মস্তকে পোষণ করিয়া বেড়াইতেছেন অথচ তিনি নিজেও তাহা জানেন না।

জগৎ-পীড়া

জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অস্বাস্থ্যকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগৎও তাহাই। জগৎও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য স্বাস্থ্যের উদ্যম। অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ। সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝাযুঝি। জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রযত্ন। অভিব্যক্তিবাদ (Evolution Theory) আর কি বলে? জগতের নিকৃষ্টতম প্রাণ

ক্রমশঃ মানুষে আসিয়া পরিণত হয়। জগতের নিকৃষ্টতম প্রাণীর মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রাণীতে-পরিণত-হইবার চেষ্টা কার্য্য করিতেছে। অভিব্যক্তিবাদকে প্রাণীজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে কেন? অভিব্যক্তিবাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? না, কিছুই আকাশ হইতে পড়িয়া হয় না, প্রকৃতিতে কিছুরই হঠাৎ মাঝখানে আরম্ভ নাই। তাহা যদি হয় তাহা হইলে মানিতে হয় যে, আমরা যাহাকে প্রাণ বলি তাহারো হঠাৎ আরম্ভ নাই। আমরা যাহাকে জড় বলি তাহা হইতেই সে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ কথা যদি না মান তবে "ঈশ্বর বলিলেন পৃথিবী হউক অমনি পৃথিবী হইল" এ কথা মানিতেও আপত্তি করা উচিত নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক জড় পরমাণু প্রাণ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম প্রাণ পূর্ণতর জীব হইতে চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক পূর্ণতর জীব (যেমন মনুষ্য) অপূর্ণতার হাত এড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বিশাল জগতের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে অভিব্যক্তির চেষ্টা অনবরত কার্য্য করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রোগের অর্থ অস্বাস্থ্য, কিন্তু সেই অস্বাস্থ্যের মধ্যে স্বাস্থ্যের ভাব কার্য্য করিতেছে। জগতের প্রত্যেক পরমাণু পীড়া, কিন্তু সেই প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সঞ্চারিত হইতেছে। এই নিয়ম বর্ত্তমান না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব এই জগতের যে চেতনা তাহা পীড়ার চেতনা। আমাদের যে অঙ্গে পীড়া হয় সেই অঙ্গ যেমন একটি বিশেষ চেতনা অনুভব করে, তেমনি জগতের যে চেতনা তাহা পীড়ার চেতনা। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রত্যেক পরমাণু অনবরত অভাববোধ অনুভব করিতেছে। আমরা যে পীড়ার বেদনা অনুভব করি তাহা আসলে খারাপ নহে, তাহার অর্থ ই এই, যে, এখনো আমাদের স্বাস্থ্য আছে, এখনো সে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে নাই। সেইরূপ সমস্ত জগতের যে একটি বেদনা বোধ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক পরমাণুতে যে অভাব অনুভূত হইতেছে, তাহার অর্থ ই এই যে, অভিব্যক্ত হইবার ক্ষমতা তাহার সর্ব্ব শরীরে কাজ করিতেছে। সুস্থ হইবার শক্তি জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। আপনাকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগই পীড়ার জীবন। সেই আত্মহত্যাপরায়ণতাই পীড়া। জগৎও সেইরূপ। জগৎ, জগৎ হইতে চায় না। তাহার উন্নতির শেষ সীমা আত্মহত্যা। তাহার চেষ্টারও শেষ লক্ষ্য তাহাই। জগৎ সম্পূর্ণ হইতে চায়, আর এক কথায় জগৎ আরোগ্য হইতে চায়— অর্থাৎ জগৎ, জগৎ হইয়া থাকিতে চায় না। এই নিমিত্ত সমস্ত জগতের মধ্যে এবং জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে, সমস্ত জগৎ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয় এবং জগতের একটি পরমাণুও নিজের অবস্থায়

সন্তুষ্ট নয়। এই অসন্তোষই বিশাল জগতের প্রাণ। বিজ্ঞানশাস্ত্র কাহাকে বলে? না, যে শাস্ত্র জগৎরূপ একটি মহাপীড়ার সমস্ত লক্ষণ সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্যদেহের একটি পীড়ার সমস্ত তথ্য জানিতে পারি না, আমরা জগৎ-পীড়ার সমস্ত লক্ষণ জানিতে চাই! আমাদের কি আশা! আমাদের নিজ-দেহের একটি পীড়াকে আমরা যদি সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারি তাহা হইলে আমরা সমস্ত জগৎপীড়ার নিয়ম অবগত হইতে পারি। কারণ এই নিয়ম সমস্ত জগৎ-সমষ্টিতে ও জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে কার্য্য করিতেছে! এই নিমিত্তই কবি টেনিসন্ কহিয়াছেন—

"Flower in the crannied wall
I pluck you out of the crannies ;—
Hold you here, root and all, in my hand
Little flower— but if I could understand,
What you are, root and all, and all in all,
I should know what God and man is."

ইহার অর্থ এই যে, জগৎকে জানাও যা একটি তৃণকে জানাও তাই, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জগৎ।

সমাপন

লিখিলে লেখা শেষ হয় না। পুঁথি যে ক্রমেই বাড়িতে চলিল। আর, সকল কথা লিখিলেই বা পড়িবে কে? কাজেই এইখানেই লেখা সাঙ্গ করিলাম।

আমার ভয় হইতেছে, পাছে এ লেখাগুলি লইয়া কেহ তর্ক করিতে বসেন। পাছে কেহ প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিতে আসেন। পাছে কেহ ইহাদের সত্য-অসত্য আবশ্যক-অনাবশ্যক উপকার-অপকার লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন। কারণ, এ বইখানি সে ভাবে লেখাই হয় নাই।

ইহা, একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সকলগুলি কি আমি মানি, না, বিশ্বাস করি? সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এইমাত্র। তাহারা সকলগুলিই সত্য, অর্থাৎ ইতিহাসের হিসাবে সত্য, যুক্তিতে মেলে কি না মেলে সে কথা আমি জানি না! যুক্তির সহিত না মিলিলে যে একেবারে কোন কথাই বলিব না এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া

বলিলে কি জানি পাছে এমন অনেক কথা না বলা হয় যেগুলি আসলে সত্য! কি জানি এমন হয়ত সূক্ষ্ম যুক্তি থাকিতে পারে, এমন অলিখিত তর্কশাস্ত্র থাকিতে পারে, যাহার সহিত আমার কথাগুলি কোন না কোন পাঠক মিলাইয়া লইতে পারেন! আর, যদি নাই পারেন ত সেগুলা চুলায় যাক। তাই বলিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি?

আর চুলাতেই বা যাইবে কেন? মিথ্যাকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখ না, ভ্রমের বৈজ্ঞানিক দেহতত্ত্ব শিক্ষা কর না। জীবিত দেহের নিয়ম জানিবার জন্ম অনেক সময় মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়। তেমনি অনেক সময়ে এমন হয় না কি, পবিত্র জীবন্ত সত্যের গায়ে অস্ত্র চালাইতে কোনমতে মন উঠে না, হৃদয়ের প্রিয় সত্যগুলিকে অসঙ্কোচে কাটাকাটি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতে প্রাণে আঘাত লাগে ও সেই জন্ম মৃত ভ্রম মৃত মিথ্যাগুলিকে কাটিয়া কুটিয়া সত্যের জীবন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হয়!

আর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ গ্রন্থ মনের ইতিহাসের এক অংশ। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মনের গঠনকার্য্য চলিতেছে। এই মহা শিল্পশালা এক নিমেষ কালও বন্ধ থাকে না। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের অদৃশ্য অভ্যন্তরে অনবরত কি নির্ম্মাণকার্য্যই চলিতেছে! অবিশ্রাম কত কি আসিতেছে যাইতেছে, ভাঙিতেছে গড়িতেছে, বর্দ্ধিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই গ্রন্থে সেই অবিশ্রান্ত কার্য্যশীল পরিবর্ত্তমান মনের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। কাজেই ইহাতে বিস্তর অসম্পূর্ণ মত, বিরোধী কথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবের নিবেশ থাকিতেও পারে। জীবনের লক্ষণই এইরূপ। একেবারে স্থৈর্য্য, সমতা ও ছাঁচে-ঢালা ভাব মৃতের লক্ষণ। এই জন্যই মৃত বস্তুকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সহজ। চলন্ত স্বাধীন ক্রীড়াশীল জীবনকে আয়ত্ত করা সহজ নহে, সে কিছু দুরন্ত। জীবন্ত উদ্ভিদে আজ যেখানে অঙ্কুর, কাল সেখানে চারা; আজ দেখিলাম সবুজ কিশলয়, কাল দেখিলাম সে পীতবর্ণ পাতা হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে; আজ দেখিলাম কুঁড়ি, কাল দেখিলাম ফুল, পরশু দেখিলাম ফল। আমার লেখাগুলিকেও সেই ভাবে দেখ। এই গ্রন্থে যে মতগুলি সবুজ দেখিতেছ, আজ হয়ত সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে ভাবের ফুলটি দেখিতেছ, আজ হয়ত সে ফল হইয়া গিয়াছে, দেখিলে চিনিতে পারিবে না। আমাদের হৃদয়বৃক্ষে প্রত্যহ কত শত পাতা জন্মিতেছে ঝরিতেছে, ফুল ফুটিতেছে শুকাইতেছে— কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের শোভা দেখিবে না? আজ যাহা আছে আজই তাহা দেখ, কাল থাকিবে না বলিয়া চোখ বুজিব কেন? আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মত,

ফুলের মত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম। ইহারা আমার মনের পোষণকার্য্যের সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়ত কাজে লাগিতে পারে।

আমি যখন লিখি তখন আমি মনে করি যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন তাঁহারাই আমার বই পড়িতেছেন। আমি যেন এককালে শত শত পাঠকের ঘরের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছি। আমি এই বঙ্গদেশের কত স্থানের কত শত পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি। আমি যাঁহাদের চিনি না তাঁহারা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা আমার পাশে বসিয়া আছেন, আমার মনের ভিতরে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ঘরকন্নার মধ্যে আমি আছি, তাঁহাদের কত শত সুখ দুঃখের মধ্যে আমি জড়িত হইয়া গেছি! ইহাদের মধ্যে কেহই কি আমাকে ভালবাসেন নাই? কোন জননী কি তাঁহার স্নেহের শিশুকে স্তনদান করিতে করিতে আমার লেখা পড়েন নাই ও সেই সঙ্গে সেই অসীম স্নেহের কিছু ভাগ আমাকে দেন নাই? সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় আমার মমতা, আমার স্নেহ, সহসা কি সান্ত্বনার মত কাহারো কাহারো প্রাণে গিয়া প্রবেশ করে নাই ও সেই সময়ে কি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে দূর হইতে আমাকে বন্ধু বলিয়া তাঁহারা ডাকেন নাই? কেহ যেন না মনে করেন আমি গর্ব্ব করিতেছি। আমার যাহা বাসনা তাহাই ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। মনে মনে মিলন হয় এমন লোক সচরাচর কই দেখিতে পাই? এই জন্য মনের ভাবগুলিকে যথাসাধ্য সাজাইয়া চারি দিকে পাঠাইয়া দিতেছি যদি কাহারো ভাল লাগে! যাঁহারা আমার যথার্থ বন্ধু, আমার প্রাণের লোক, কেবলমাত্র দৈববশতই যাঁহাদের সহিত আমার কোন কালে দেখা হয় নাই, তাঁহাদের সহিত যদি মিলন হয়! সেই সকল পরমাত্মীয়দিগকে উদ্দেশ করিয়া আমার এই প্রাণের ফুলগুলি উৎসর্গ করি।

আমি কল্পনা করিতেছি, পাঠকদের মধ্যে এইরূপ আমার কতকগুলি অপরিচিত বন্ধু আছেন, আমার হৃদয়ের ইতিহাস পড়িতে তাঁহাদের ভাল লাগিতেও পারে। তাঁহারা আমার লেখা লইয়া অকারণ তর্কবিতর্ক অনর্থক সমালোচনা করিবেন না, তাঁহারা কেবল আমাকে চিনিবেন ও পড়িবেন। যদি এ কল্পনা মিথ্যা হয় ত হোক, কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়া আমার লেখা প্রকাশ করি। নহিলে কেবলমাত্র শকুনি গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নির্ম্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে নিজের হৃদয়খানা কে ফেলিয়া রাখিতে পারে?

আর, আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি।— এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম,

সে তুমিই দেখিতে পাইবে। সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুই জনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! এক দিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক-একদিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল— এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।

১৮০৫ শকের ভাদ্র মাসে (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩) 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গগুলি ১২৮৮ ও ১২৮৯ সালের 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল। কেবল শেষ প্রবন্ধ "সমাপন" নূতন সংযোজন। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় 'ভারতী'র কোনো কোনো অংশ পরিত্যক্ত হয়; সেগুলি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট ও সংযোজিত হইল। একেবারে প্রারম্ভে একটু ভূমিকার মত ছিল।—

স্মরণ হইতেছে, ফরাসীস পণ্ডিত প্যাস্কাল একজনকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া অবশেষে উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"মার্জ্জনা করিবেন, সময় অল্প থাকাতে বড় চিঠি লিখিতে হইল, ছোট চিঠি লিখিবার সময় নাই।" আমাদের হাতে যখন বিশেষ সময় থাকিবে তখন মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠকদের উপহার দিব।

—ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯০

"অনধিকার" ও "অধিকার" প্রসঙ্গের পরে "উপভোগ" শীর্ষক একটি প্রসঙ্গ ছিল। তাহা এই—

উপভোগ

মনুষ্যের যতদূর উপভোগ করিবার, অধিকার করিবার ক্ষমতা আছে, স্পর্শেই তাহার চূড়ান্ত। যাহাকে সে স্পর্শ করিতে পারে তাহাকেই সে সর্বাপেক্ষা আয়ত্ত মনে করে। এই নিমিত্ত ঋষিরা আয়ত্ত পদার্থকে "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" বলিতেন। এই জন্য মানুষেরা ভোগ্য পদার্থকে প্রাণপণে স্পর্শ করিতে চায়। স্পর্শ করিতে পারাই তাহাদের অভিলাষের উপসংহার। আমাদের হৃদয়ে স্পর্শের ক্ষুধা চির জাগ্রত, এই জন্য যাহা আমরা স্পর্শ করিতে পারি তাহার ক্ষুধা আমাদের শীঘ্র মিটিয়া যায়, যাহা স্পর্শ করিতে পারি না তাহার ক্ষুধা আর শীঘ্র মেটে না। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাঁহার দ্বাদশসংখ্যক দপ্তরে একটি গীতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই গীতের একস্থলে আছে—

> "মণি নও মাণিক নও যে হার করে্য গলে পরি,
> ফুল নও যে কেশের করি বেশ।"

ইহা মনুষ্যহৃদয়ের কাতর ক্রন্দন। তোমার ঐ রূপ যাহা দেখিতে পাইতেছি, তোমার ঐ হৃদয় যাহা অনুভব করিতে পারিতেছি, উহা যদি মণির মত মাণিকের মত হইত, উহা যদি হার করিয়া গলায় পরিতে পারিতাম, বুকের কাছে উহার

স্পর্শ অনুভব করিতে পারিতাম, আহা, তাহা হইলে কি হইত! উহার অর্থ এমন নহে যে "বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড় পদার্থ কেন?" আমরা যখন বঁধুকে স্পর্শ করি, তখন তাহার দেহ স্পর্শ করি মাত্র। তাহার দেহের কোমলতা, শীতোষ্ণতা অনুভব করিতে পারি মাত্র, কিন্তু তাহার রূপ স্পর্শ করিতে পারি না ত, তাহার রূপ অনুভব করিতে পারি না ত। রূপ দৃশ্য হইল কেন, রূপ মণি মাণিকের মত স্পৃশ্য হইল না কেন? তাহা হইলে আমি রূপের হার করিতাম, রূপ দিয়া কেশের বেশ করিতাম। যখন কবিরা অশরীরী পদার্থকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমরা এত আনন্দ লাভ করি কেন? কবির কল্পনা-বলে মুহূর্তে আমাদের মনে হয় যেন তাহার শরীর আছে, যেন তাহাকে আমরা স্পর্শ করিতেছি। আমাদের বহুদিনের আকুল তৃষা যেন আজ মিটিল। যখন রাধিকা শ্যামের মুখ বর্ণনা করিয়া কহিল "হাসিখানি তাহে ভায়" তখন হাসিকে "হাসিখানি" কহিল কেন? যেন হাসি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, যেন হাসিকে ছুঁইতে পারি, যেন হাসিখানিকে লইয়া গলার হার করিয়া রাখিতে পারি! তাহার প্রাণের বাসনা তাহাই! যদি হাসি "হাসিখানি" হইত, শ্যাম যখন চলিয়া যাইত, তখন হাসিখানিকে লইয়া বসিয়া থাকিতাম! আমাদের অপেক্ষা কবিদের একটি সুখ অধিক আছে। আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, কল্পনায় তাঁহারা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেন। উষাকে তাঁহারা বালিকা মনে করেন, সঙ্গীতকে তাঁহারা নির্ঝর মনে করেন, নবমালিকা ফুলকে তাঁহারা যেরূপ স্পর্শ করিতে পারেন জ্যোৎস্নাকে তাঁহারা সেইরূপ স্পর্শ করিতে পারেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা সাহস করিয়া নবমালিকা লতার "বনজ্যোৎস্না" নামকরণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আমরা যাহাকে স্পর্শ করিতে পাইয়াছি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে চাই না, যাহাকে স্পর্শ করিতে পাই না তাহাকে স্পর্শ করিতে চাই! এ কি বিড়ম্বনা!

—ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ. ২৭-২৮

"ফল ফুল" প্রসঙ্গের পূর্বে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি ছিল—

অদূরদর্শীরা আক্ষেপ করেন আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ দরিদ্র। দূরদর্শীরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ দরিদ্র হইতে শিখিল না। সে দিন আমার বন্ধু ক দুঃখ করিতেছিলেন যে, আমাদের দেশে যথাসংখ্যক উপযুক্ত মাসিক পত্রিকার নিতান্ত অভাব। পণ্ডিত খ কহিলেন, "আহা, আমাদের দেশে এমন দিন কবে আসিবে যে দিন উপযুক্ত মাসিক পত্রিকার

যথার্থ অভাব উপস্থিত হইবে!" আসল কথা এই যে, দরিদ্র না হইলে বড়মানুষ হওয়া যায় না। নীচে না থাকিলে উপরে উঠা যায় না। বড়মানুষ নই বলিয়া দুঃখ করিবার আগে, দরিদ্র নই বলিয়া দুঃখ কর। যাহার অভাব নাই তাহার 'অভাব মোচন হইল না' বলিয়া বিলাপ করা বৃথা। এখন আমাদের সমাজকে এমন একটা ঔষধ দিতে হইবে যাহা প্রথমে ঔষধরূপে ক্ষুধা জন্মাইয়া পরে পথ্যরূপে সেই ক্ষুধা মোচন করিবে। একেবারেই খাদ্য দেওয়ার ফল নাই। আমাদের দেশে যাহারা খাবারের দোকান খোলে তাহারা ফেল হয় কেন? আমাদের সমাজে যখনি একখানি মাসিক পত্রের জন্ম হয় তখনি সমাজ রাজপুত পিতার ন্যায় ভূমিষ্ঠশয্যাতেই তাহাকে বিনাশ করে কেন? যাহার আবশ্যক কেহ বোধ করে না সে টেকিয়া থাকিতে পারে না, অতএব আবশ্যকবোধ জন্মে নাই বলিয়াই দুঃখ, দ্রব্যটি নাই বলিয়া নহে।

—ভারতী, আশ্বিন ১২৮৮, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ. ২৮৪-৫

"দ্রুত বুদ্ধি" প্রসঙ্গের নিম্নোদ্ধৃত শেষাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে—

কবিরা এইরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমান। তাঁহারা বুঝেন, কিন্তু এত বিদ্যুৎ-বেগে যুক্তির রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসেন যে, রাস্তা মনে থাকে না, কেবল বুঝেন মাত্র। কাজেই অনেক সমালোচককে রাস্তা বাহির করিবার জন্য জাহাজ পাঠাইতে হয়। বিষম হাঙ্গামা করিতে হয়। কবি উপস্থিত আছেন, অথচ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতে পারেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া শুনিতেছেন— কেহ বলিতেছে উত্তরে পথ, কেহ বলিতেছে দক্ষিণে পথ। দ্রুতগামী কবি সহসা এমন একটা দূর ভবিষ্যতের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন যে, বর্ত্তমান কাল তাঁহার ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারে না। কি করিয়া বুঝিবে? বর্ত্তমান কালকে এক এক পা করিয়া রাস্তা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেইখানে যাইতে হইবে; কাজেই সে হঠাৎ মনে করে কবিটা বুঝি পথ হারাইয়া কোন অজায়গায় গিয়া উপস্থিত হইল। কবিরা মহা দার্শনিক। কেবল দার্শনিকদের ন্যায় তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নির্ব্বোধ হইতে পারেন না। কিয়ৎ-পরিমাণে নির্ব্বোধ না হইলে এ সংসারে বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাতি হয় না।

—ভারতী, আশ্বিন ১২৮৮, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ. ২৯২

নলিনী

নলিনী।

(নাট্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

নলিনী

প্রথম দৃশ্য

অপরাহ্ণ

কানন

নীরদ

গান

পিলু—কাওয়ালি

হা কে ব'লে দেবে
সে ভালবাসে কি মোরে!
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধ'রে!

নলিনী ও বালিকা ফুলির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত) এ রকম সংশয়ে ত আর থাকা যায় না! এমন ক'রে আর কত দিন কাটবে! এত দিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি— ওগো, একবার হৃদয়ের দুয়ার খোল, আমাকে এক পাশে একটু আশ্রয় দাও— যে লোক এত দিন ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে চেয়ে আছে তাকে কি একটিবার প্রাণের মধ্যে আহ্বান করবে না? আজকের কাছে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব! যদি একেবারে বলে— না! আচ্ছা, তাই বলুক— আমার এ সুখ দুঃখের যা হয় একটা শেষ হয়ে যাক! (কাছে গিয়া) নলিনী!—

নলিনী। ফুলি, ফুলি, তুই ওখেনে ব'সে ব'সে কি করচিস, ফুল তুলতে হবে মনে নেই! আয়, শীগগির ক'রে আয়! ও কি করেচিস, কুঁড়িগুলো তুলেচিস

কেন— আহা ওগুলি কাল কেমন ফুটত? চল্ ঐদিকে গোলাপ ফুটেচে যাই। আজ এখনো নবীন এল না কেন?

ফুলি। তিনি এখনি আসবেন।

নীরদ। আমার কথায় কি একবার কর্ণপাতও করলে না? আমি মনে করতুম, প্রাণপণ আগ্রহকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। নলিনীর কি এতটুকুও হৃদয় নেই যে আমার অতখানি আগ্রহকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারলে? নাঃ— হয়ত ফুল তুলতে অন্যমনস্ক ছিল, আমার কথা শুনতেও পায় নি! আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। নলিনী!—

নলিনী। ফুলি, কাল এই বেলফুলের গাছগুলোতে মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলেম, আজ ত তার একটিও দেখচি নে! চল্ দেখি, ঐদিকে যদি ফুল পাই ত তুলে নিয়ে আসি! (অন্তরালে) দেখ্ ফুলি, নীরদ আজ কেন অমন বিষণ্ণ হয়ে আছেন তুই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আয় না! তুই ওঁর কাছে গিয়ে একটু গান-টান গেয়ে শোনালে উনি ভাল থাকেন। তাই তুই যা, আমি ফুল তুলে নিয়ে যাচ্চি।

ফুলি। কাকা, তোমার কি হয়েচে!

নীরদ। কি আর হবে ফুলি!

ফুলি। তবে তুমি অমন ক'রে আছ কেন কাকা?

নীরদ। (কোলে টানিয়া লইয়া) কিছুই হয় নি বাছা!

ফুলি। কাকা, তুমি গান শুনবে?

নীরদ। না রে, এখন গান শুনতে বড় ইচ্ছে করচে না!

ফুলি। তবে তুমি ফুল নেবে?

নীরদ। আমাকে ফুল কে দেবে ফুলি?

ফুলি। কেন, নলিনী ঐখেনে ফুল তুলচে, ঐদিকে ঢের ফুটেচে— ঐখেনে চল না কেন? (নলিনীর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া) কাকাকে কতকগুলি ফুল দাও না ভাই, উনি ফুল চাচ্চেন!

নলিনী। তুই কি চোকে দেখতে পাস নে? দেখ্ দেখি গাছের তলায় কি ক'রে দিলি? অমন সুন্দর বকুলগুলি সব মাড়িয়ে দিয়েচিস! হ্যা হ্যা, ফুলি, আমরা যে সে দিন সেই ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসায় সেই পাখীর ছানাগুলিকে দেখেছিলুম, আজ তাদের চোক ফুটেচে, তারা কেমন পিট্‌পিট্ ক'রে চাচ্চে! তাদের মা খাবার আনতে গেছে, এই বেলা আয়, আমরা তাদের একটি একটি ক'রে ঘাসের ধান খাওয়াই গে!

ফুলি। কোথায় সে, কোথায় সে, চল না। (উভয়ের দ্রুত গমন)

নলিনী। (কিছু দূর গিয়া ফুলির প্রতি) ঐ যা, তোর কাকাকে ফুল দিয়ে আসতে ভুলে গেচি! তুই ছুটে যা, এই ফুল দুটি তাঁকে দিয়ে আয় গে। আমার নাম করিস নে যেন!

ফুলি। (নীরদের কাছে আসিয়া) এই নাও কাকা, ফুল এনেছি।

নীরদ। (চুম্বন করিয়া) আমি ভেবেছিলেম আমাকে কেউ ফুল দেবে না। শেষ কালে তোর কাছ থেকে পেলেম!

নলিনী। (দূর হইতে) ফুলি, তুই আবার গেলি কোথায়? ঝট্ ক'রে আয় না, বেলা ব'য়ে যায়।

ফুলি। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

নীরদ। (স্বগত) এ যেন রূপের ঝড়ের মত, যেখেন দিয়ে বয়ে যায় সেখেনে তোলপাড় ক'রে দেয়। এতটা আমি ভালবাসি নে! আমার প্রাণ শ্রান্ত পাখীটির মত একটি গাছের ছায়া চায়, প্রচ্ছন্ন সুখের কুলায় চায়। আমি ত এত অধীরতা সইতে পারি নে। একটুখানি বিরাম, একটুখানি শান্তি কোথায় পাব? (নলিনীর কাছে গিয়া) নলিনী, তুমি আমার একটি কথার উত্তর দেবে না?

নতশিরা নলিনীর স্তব্ধভাবে আঁচলের ফুল -গণনা

কখন তুমি আমার সঙ্গে একটি কথা কও নি— আজ তোমাকে বেশী কিছু বলতে হবে না, একবার কেবল আমার নামটি ধ'রে ডাক, তোমার মুখে একবার কেবল আমার নামটি শোনবার সাধ হয়েছে। আমার এইটুকু সাধও কি মিটবে না? না হয় একবার বল যে, না! বল যে, মিটবে না! বল যে, তোমাকে আমার ভাল লাগে না, তুমি কেন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াও! আমার এই দুর্ব্বল ক্ষীণ আশাটুকুকে আর কত দিন বাঁচিয়ে রাখব? তোমার একটি কঠিন কথায় তাকে একেবারে বধ ক'রে ফেল, আমার যা হবার হোক।

(নলিনীর আঁচল শিথিল হইয়া ফুলগুলি সব পড়িয়া গেল ও নলিনী মাটিতে বসিয়া ধীরে ধীরে একে একে কুড়াইতে লাগিল।)

নীরদ। তাও বলবে না! (নিশ্বাস ফেলিয়া দূরে গমন)

ফুলি। (ছুটিয়া নলিনীর কাছে আসিয়া) দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মৌচাক দেখতে পেয়েছি!— ও কি ভাই, তুমি মুখ ঢেকে অমন ক'রে ব'সে আছ কেন? ও কি তুমি কাঁদচ কেন ভাই?

নলিনী। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া হাসিয়া উঠিয়া) কই, কাঁদচি কই?

ফুলি। আমি মনে করেছিলুম, তুমি কাঁদচ!

নবীনের প্রবেশ

নলিনী। ঐ যে নবীন এয়েচে, চল্ ওর কাছে যাই। (কাছে আসিয়া) আজ যে তুমি এত দেরি ক'রে এলে?

নবীন। (হাসিয়া) একটুখানি তিরস্কার পাবার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি দেরি ক'রে এলে তোমারও যে দেরি মনে হয় এটা মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লাগে।

নলিনী। বটে! তিরস্কারের সুখটা একবার দেখিয়ে দেব। দে ত ফুলি, ওর গায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দে ত।

নবীন। ও যন্ত্রণাটা ভাই এক রকম সওয়া আছে। ওতে আর বেশী কি হ'ল? ওটা ত আমার দৈনিক পাওনা! যতগুলি কাঁটা এইখেনে ফুটিয়েছ, সবগুলি যত্ন ক'রে প্রাণের ভিতর বিঁধিয়ে রেখেচি— তার একটিও ওপ্ড়ায় নি, আর যায়গা কোথায়?

নলিনী। ও বড্ড কথা কচ্চে ফুলি— দে ত ওকে সেই গানটা শুনিয়ে।

ফুলির গান

পিলু

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি!
হাসি খেলি রে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধারমুখে
দিন রজনী!

নবীন। আমারও ভাই একটা গান আছে, কিন্তু গলা নেই। কি দুঃখ! প্রাণের মধ্যে গান আকুল হয়ে উঠেচে, কেবল গলা নেই ব'লে কেউ একদণ্ড মন দিয়ে শুনবে না! কিন্তু গলাটাই কি সব হ'ল? গানটা কি কিছুই নয়? গানটা শুনতেই হবে।

কালাংড়া

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল!
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!

দাঁড়িয়েছিলেম পথের ধারে,
সহসা দেখিলেম তারে—
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল!

নলিনী। আর ভাল লাগচে না। (স্বগত) মিছিমিছি কথা কাটাকাটি ক'রে আর পারি নে। একটু একলা হ'লে বাঁচি। (ফুলির প্রতি) আয় ফুলি, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি গে।

[প্রস্থান

নীরদ। এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় অমনতর চপলতা কি কিছুমাত্র শোভা পায়! সন্ধ্যার এমন শান্তিময় স্তব্ধতার সঙ্গে ঐ গান বাজনা হাসি তামাসা কি কিছুমাত্র মিশ খায়? একটু হৃদয় থাকলে কি এমন সময়ে এমনতর চপলতা প্রকাশ করতে পারত? আমোদ প্রমোদের কি একটুও বিরাম নেই? দিনের আলো যখন নিবে এসেচে, পাখীগুলি তাদের নীড়ে তাদের একমাত্র সঙ্গিনীদের কাছে ফিরে এসেছে, দূরে কুঁড়েঘরগুলিতে সন্ধের প্রদীপ জ্বলেচে— তখন কি ঐ চপলার এক মুহূর্ত্তের তরেও আর একটি হৃদয়ের জন্তে প্রাণ কাঁদে না? এক মুহূর্ত্তের জন্তও কি ইচ্ছে যায় না— এই কোলাহলশূন্ত জগতের মধ্যে আর একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দুজনের পানে চেয়ে থাকি। গভীর শান্তিপূর্ণ সেই সন্ধ্যা-আকাশে দুটিমাত্র স্তব্ধ হৃদয় স্তব্ধ আনন্দে বিরাজ করি। দুটি সন্ধ্যাতারার মত আলোয় আলোয় কথা হয়! হায় এ কি কল্পনা! এ কি দুরাশা!

নবীনের প্রবেশ

নবীন। এ কি ভাই, তুমি যে একলা এখানে ব'সে আছ? আমাদের সঙ্গে যে যোগ দাও নি?

নীরদ। এমন মধুর সন্ধে বেলায় কেমন ক'রে যে তুমি ঐ মূর্ত্তিমতী চপলতার সঙ্গে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে আমি তাই ব'সে ভাবছিলুম। সন্ধের কি একটা পবিত্রতা নেই? ঐ সময়ে হৃদয়হীন চটুলতা দেখলে কি তার সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছে করে?

নবীন। তোমরা কবি মানুষ, তোমাদের কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। আমার ত খুব ভাল লাগছিল। আর তোমাদের কবিত্বের চোখেই বা ভাল লাগবে না কেন তাও আমি ঠিক বুঝতে পারি নে! সরলা বালিকা, মনে কোন চিন্তা নেই,

প্রাণের স্ফূর্তিতে সন্ধ্যার কোলে খেলিয়ে বেড়াচ্চে এই বা দেখতে খারাপ লাগবে কেন ?

নীরদ। তা ঠিক বলেচ ! (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) কিন্তু যার কোন চিন্তা নেই, সে মন কি মন ? যে হৃদয় আর কোন হৃদয়ের জন্তে ভাবে না, আপনাকে নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট আছে, তাকে কি স্বার্থপর বলব না !

নবীন। তুমি নিজে স্বার্থপর ব'লেই তাকে স্বার্থপর বলচ ! যে হৃদয় তোমার হৃদয়ের জন্তে ভাবে না তার আনন্দ তার হাসি তোমার ভাল লাগে না, এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কি আছে ! আমি ত, ভাই, সে ধাতের লোক নই। সে আমাকে হৃদয় দিক আর নাই দিক আমার তাতে কি আসে যায় ? আমি তার যতটুকু মধুর তা উপভোগ করব না কেন ? তার মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা পেতে আপত্তি কি আছে !

নীরদ। স্বার্থপরতা ? ঠিক কথাই বটে। এত দিনে আমার মনের ভাব ঠিক বুঝতে পারলুম। ঐ সরলা বালা আমোদ ক'রে বেড়াচ্চে তাতে আমার মনে মনে তিরস্কার করবার কি অধিকার আছে। আমি কোথাকার কে ! আমি অনবরত তাকে অপরাধী করি কেন !

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী, আমাকে মার্জ্জনা কর।

নবীন। (তাড়াতাড়ি) আবার ও সব কথা কেন ? বড় বড় হৃদয়ের কথা ব'লে বালিকার সরল মনকে ভারগ্রস্ত করবার দরকার কি ? (হাসিয়া নলিনীর প্রতি) নলিনী, আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই !

নলিনী। বাগানে ত অনেক ফুল ফুটেচে, যত খুশি তুলে নাও না !

নবীন। ফুলগুলিকে আগে তোমার হাসি দিয়ে হাসিয়ে দাও, তোমার স্পর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে দাও ! ফুলের মধ্যে আগে তোমার রূপের ছায়া পড়ুক, তোমার স্মৃতি জড়িয়ে যাক— তার পরে তাকে ঘরে নিয়ে যাব।

নলিনী। (হাসিয়া) বড্ড তোমার মুখ ফুটেচে দেখচি ! দিনে দুপুরে কবিতা বলতে আরম্ভ করেচ !

নবীন। আমি কি সাধে বলচি ! তুমি যে জোর ক'রে আমাকে কবিতা বলাচ্চ। তোমার ঐ দৃষ্টির পরেশ-পাথরে আমার ভাবগুলি একেবারে সোনা-বাঁধানো হয়ে বেরিয়ে আসচে।

নলিনী। তুমি ও কি হেঁয়ালি বলচ আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে।

নীরদ। আমি ত নবীনের মত এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে! আর মিছিমিছি এ রকম উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রে যে কি সুখ আমি কিছুই ত বুঝতে পারি নে! কিন্তু আমার সুখ হয় না ব'লে কি আর কারও সুখ হবে না? আমি কি কেবল একলা ব'সে ব'সে পরের সুখ দেখে তাদের তিরস্কার করতে থাকব, এই আমার কাজ হয়েচে? যে যাতে সুখী হয় হোক না, আমার তাতে কি? আমার যদি তাতে সুখ না হয়, আমি অন্তত্র চ'লে যাই।

নবীন। (নলিনীর প্রতি) দেখতে দেখতে তোমার হাসিটি মিলিয়ে এল কেন ভাই? কি যেন একটা কালো জিনিষ প্রাণের ভিতর লুকিয়ে রেখেচ, সেটা হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেচ, কিন্তু হাসি যে আর থাকে না! আমি ত বলি প্রকাশ করা ভাল! (কোন উত্তর না পাইয়া) তুমি বিরক্ত হয়েচ! না? মনের ভিতর একজন লোক হঠাৎ উঁকি মারতে এলে বড় ভাল লাগে না বটে! কিন্তু একটু বিরক্ত হ'লে তোমাকে বড় সুন্দর দেখায়! সেই জন্যে তোমাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে!

নলিনী। (হাসিয়া) বটে! তোমার যে বড্ড জাঁক হয়েচে দেখচি! তুমি কি মনে কর তুমিও আমাকে বিরক্ত করতে, কষ্ট দিতে পার! সেও অনেক ভাগ্যের কথা! কিন্তু সে ক্ষমতাটুকুও তোমার নেই।

নবীন। (সহাস্যে) আমার ভুল হয়েছিল।

নীরদ। নবীনের সঙ্গেই নলিনীর ঠিক মিলেচে! এ আমার জন্যে হয় নি! আমি এদের কিছুই বুঝতে পারি নে! এদের হাসি এদের কথা আমার প্রাণের সঙ্গে কিছুই মেলে না! তবে কেন আমি এদের মধ্যে একজন বেগানা লোকের মত ব'সে থাকি! আমি পর, আমার এখেনে কোন অধিকার নেই! এদের অন্তঃপুরের মধ্যে আমি কেন? আমার এখান থেকে যাওয়াই ভাল! আমি চ'লে গেলে কি এদের একটুও কষ্ট হবে না? একবারও কি মনে করবে না, আহা, সে কোথায় গেল? না—না—আমি গেলে হয়ত এরা আরাম বোধ করবে! এখানে আর থাকব না। আজই বিদেশে যাব! এত দিনের পরে আমি ঠিক বুঝতে পেরেচি যে আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।

ফুলি। (আসিয়া) (নলিনীর প্রতি) মা তোমাদের ডাকতে পাঠালেন।

নলিনী। তবে যাই।

[প্রস্থান

নবীন। আমিও তবে বিদায় হই।

[প্রস্থান

নীরদ। (ফুলিকে ধরিয়া) আয় ফুলি, একবার আমার কোলে আয়! আমার বুকে আয়!

ফুলি। ও কি কাকা, তোমার চোখে জল কেন?

নীরদ। ও থাক্। জল একটু পড়ুক। (কিছুক্ষণ পরে) অন্ধকার হয়ে এল, এখন তবে বাড়ি যা।

ফুলি। তুমি বাড়ি যাবে না কাকা?

নীরদ। না বাছা!

ফুলি। তুমি তবে কোথায় যাবে?

নীরদ। আমি আর এক জায়গায় চল্লেম। নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা!

[প্রস্থান

নলিনী। (আসিয়া) তোর কাকা তোকে কি বলছিলেন ফুলি?

ফুলি। কিছুই না!

নলিনী। আমার কথা কি কিছু বলছিলেন?

ফুলি। না।

নলিনী। আয় বাড়ি আয়।

ফুলি। কিন্তু কাকা কাঁদছিলেন কেন?

নলিনী। কি, তিনি কাঁদছিলেন?

ফুলি। হাঁ।

নলিনী। কেন কাঁদছিলেন ফুলি?

ফুলি। আমি ত জানি নে!

নলিনী। তোকে কিছুই বলেন নি?

ফুলি। না।

নলিনী। কিছুই বলেন নি?

ফুলি। না

নলিনী। তবে সেই গানটা গা!

বেহাগড়া— কাওয়ালি

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা!
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,

সে যদি চাহে মরি যে তাহে—
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা!
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল—
ধূলায় লুটাইল হৃদয়লতা!

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

নবীন। নীরদ বিদেশে যাবার পর থেকে নলিনীর এ কি হ'ল? সে উল্লাস নেই, সে হাসি নেই। বাগানে তার আর দেখা পাই নে। দিনরাত ঘরের মধ্যেই একলা ব'সে থাকে। নলিনী নীরদকেই বাস্তবিক ভালবাসত! এইটে আর আগে বুঝতে পারি নি! এমনি অন্ধ হয়েছিলেম। নীরদের সমুখে সে যেন নিজের প্রেমের ভারে নিজে ঢাকা পড়ে যেত! তাকে ঠিক দেখা যেত না। নীরদের সমুখে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়ত যে আমাদের কাছে পেলে সে যেন আশ্রয় পেত, সে যেন আমাদের পাশে আপনাকে আড়াল ক'রে তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করতে চেষ্টা করত। নীরদের পূর্ণদৃষ্টির সূর্যালোকে পাছে তার প্রাণের সমস্তটা একেবারে দেখা যায় এই ভয়ে সে নীরদের সমুখে অস্থির হয়ে পড়ত; কি ভুলই করেছি! যাই, তাকে একবার খুঁজে আসি গে! আজ তার সে করুণ মুখখানি দেখলে বড় মায়া করে। তার মুখের সেই সরল হাসিখানি যেন নিরাশ্রয় হয়ে আমার চোখের সমুখে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে! আবার কবে সে হাসবে?

[প্রস্থান

নলিনীর গৃহে প্রবেশ ও জানালার কাছে উপবেশন

নলিনী। (স্বগত) আমাকে একবার ব'লেও গেলেন না? আমি তাঁর কি করেছিলেম? আমাকে যদি তিনি ভালবাসতেন তবে কি একবার ব'লে যেতেন না?

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। বাগানে বেড়াতে যাবে না?

নলিনী। আজকের থাক্ ফুলি, আর এক দিন যাব।

ফুলি। তোর কি হয়েচে দিদি, তুই অমন ক'রে থাকিস কেন!

নলিনী। কিছু হয় নি বোন, আমার এই রকমই স্বভাব।

ফুলি। আগে ত তুই অমন ছিলি নে!

নলিনী। কি জানি আমার কি বদল হয়েছে!

ফুলি। আচ্ছা দিদি, কাকাকে আর দেখতে পাই নে কেন? কাকা কোথায় চ'লে গেছেন?

নলিনী। (ফুলিকে কোলে লইয়া, কাঁদিয়া উঠিয়া) তুই বল্ না তিনি কোথায় গেছেন! যাবার সময় তিনি ত কেবল তোকেই ব'লে গেছেন! আমাদের কাউকে কিছু ব'লে যান নি!

ফুলি। (অবাক্ হইয়া) কই, আমাকে ত কিছু বলেন নি!

নলিনী। তোকে তিনি বড় ভালবাসতেন। না ফুলি? আমাদের সকলের চেয়ে তোকে তিনি বেশী ভালবাসতেন!

ফুলি। তুমি কাঁদচ কেন দিদি? কাকা হয়ত শীগগির ফিরে আসবেন।

নলিনী। শীগগির কি আসবেন? তুই কি ক'রে জানলি?

ফুলি। কেনই বা আসবেন না?

নলিনী। ফুলি, তুই আমার জন্য এক ছড়া মালা গেঁথে নিয়ে আয়গে! আমি একটু একলা ব'সে থাকি।

ফুলি। আচ্ছা।

[প্রস্থান

নবীনের প্রবেশ

নবীন। নলিনী, তুমি কি সমস্ত দিন এই রকম জানালার কাছে ব'সে ব'সেই কাটাবে?

নলিনী। আমার আর কাজ কি আছে? এইখানটিতে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে।

নবীন। আগেকার মত আজ একবার বাগানে বেড়াই গে চল না।

নলিনী। না, বাগানে আর বেড়াব না!

নবীন। নলিনী, কি করলে তোমার মন ভাল থাকে আমাকে বল। আমার যথাসাধ্য আমি করব।

নলিনী। এইখেনে আমি একটুখানি একলা ব'সে থাকতে চাই। তা হ'লেই আমি ভাল থাকব।

নবীন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

এক প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্র। তোর কি হ'ল বল্ দেখি বোন্‌ঝি, আর যে বড় আমাদের ও দিকে যাস নে।

নলিনী। কি বলব মাসী, শরীরটা বড় ভাল নেই।

প্র। আহা, তাই ত লো, তোর মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে! চোখের গোড়ায় কালী পড়ে গেছে! মুখে হাসিটি নেই! তা, এমন ক'রে ব'সে আছিস কেন লো! আমার সঙ্গে আয়, দুজনে একবার পাড়ায় বেড়িয়ে আসি গে।

নলিনী। আজকের থাক্ মাসী!

প্র। কেনে লা! আমার দিদির বাড়ি নতুন বৌ এসেচে, তাকে একবার দেখবি চ।

নলিনী। আর এক দিন দেখব এখন মাসী, আজকের থাক্। আজ আমি বড় ভাল নেই।

প্র। আহা, থাক্ তবে। যে শরীর হয়ে গেছে, বাতাসের ভর সয় কি না সয়! আজ তবে আসি মা, ঘরকন্নার কাজ পড়ে রয়েচে।

[প্রস্থান

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। মা বলেচেন, সারাদিন তুমি ঘরে ব'সে আছ, আজ একটিবার আমাদের বাড়িতে চল।

নলিনী। না বোন, আজকের আমি পারব না!

ফুলি। তবে তুমি বাগানে চল। একলা মালা গাঁথতে আমার ভাল লাগচে না। একবারটি চল না বাগানে!

নলিনী। তোর পায়ে পড়ি ফুলি, আমাকে আর বাগানে যেতে বলিস নে, আমাকে একটু একলা থাকতে দে!

ফুলি। আমাদের সেই মাধবীলতাটি শুকিয়ে এসেচে, তাতে একটু জল দিবি নে?

নলিনী। না।

ফুলি। আমাদের সেই পোষ-মানা পাখীর ছানাটি আজকের একটু একটু উড়ে বেড়াচ্চে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করচে না?

নলিনী। না ফুলি!

ফুলি। তবে আমি যাই, মালা গাঁথি গে, কিন্তু তোকে মালা দেব না!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিদেশ

নীরদ নীরজা

উদ্যান

নীরদ। (স্বগত) এত দিন এলুম, মনে করেছিলুম একখানা চিঠিও পাওয়া যাবে। "কেমন আছ" একবার জিগেস করতেও কি নেই? স্ত্রীলোকের কঠোর হৃদয় কি ভয়ানক দৃশ্য!

নীরজা। (কাছে আসিয়া) এমন ক'রে চুপ ক'রে আছ কেন নীরদ?

নীরদ। আহা, কি সুধাময় স্বর! কে বলে স্ত্রীলোকের প্রাণ কঠিন? মমতাময়ি, এত সুধা তোমাদের প্রাণে কোথায় থাকে? আমি কি চুপ ক'রে আছি! আর থাকব না। বল কি করতে হবে। এস, আমরা দুজনে মিলে গান গাই।

নীরজা। না নীরদ, আমার জন্যে তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমাকে বিমর্ষ দেখলে আমার কষ্ট হয় ব'লে যে তুমি প্রফুল্লতার ভাণ করবে সে আমার পক্ষে দ্বিগুণ কষ্টকর! একবার তোমার দুঃখে আমাকে দুঃখ করতে দাও, মিছে হাসির চেয়ে সে ভাল।

নীরদ। ঠিক বলেছ নীরজা! দিনরাত্রি কি প্রমোদের চপলতা ভাল লাগে? এমন সময় কি আসে না যখন স্তব্ধ হয়ে ব'সে দুটিতে মিলে সন্ধেবেলায় নিরিবিলি দুজনের দুঃখে দুঃখে কোলাকুলি হয়? দুজনের বিষণ্ণ মুখে দুজনে চেয়ে থাকে? দুজনের চোখের জলের মিলন হয়ে হৃদয়ের পবিত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হয়? এই লও নীরজা, আমার এই বিষণ্ণ প্রাণ তোমার হাতে দিলেম, একে তোমার ওই অতি কোমল মমতার মধ্যে ঢেকে রাখ, দাও এর চোখের জল মুছিয়ে দাও। তুমি মমতা ক'রেই ভাল থাক, তুমি স্নেহ দিতেই ভালবাস— দাও, আরও স্নেহ দাও, আরও মমতা কর। আমি চুপ ক'রে তোমার ঐ মধুর করুণা উপভোগ করি।

নীরজা। আমাকে অমন ক'রে তুমি ব'লো না— তোমার কথা শুনে আমার চোখে আরও জল আসে! আমি তোমার কি করতে পারি? আমি কি করলে তোমার একটুও শান্তি হয়? আমার কাছে অমন ক'রে চেয়ো না! আমার কি আছে, কি দেব, কিছু যেন ভেবে পাই নে।

নীরদ। (স্বগত) এই মমতার কিছু অংশও যদি তার থাকত! এত কাল যে আমি ছায়ার মত তার কাছে কাছে ছিলুম, আমাকে ভাল নাই বাসুক, একটুকু মায়াও কি আমার উপর জড়ায় নি, যে একখানি চিঠি লিখে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেমন আছ? আজও সে তার বাগানে তেমনি ক'রে হেসে খেলে বেড়াচ্চে? আমি চ'লে এসেচি ব'লে তার জগতের একটি তিলও শূন্য হয় নি? কেনই বা হবে? নিষ্ঠুর মমতাহীন জড়প্রকৃতির এই রকমই ত নিয়ম! আমি চ'লে এসেচি ব'লে কি তার বাগানে একটি বেল ফুলও কম ফুটবে? একটি পাখীও কম ক'রে গাবে? কিন্তু তাই ব'লে কি রমণীর প্রাণও সেই রকম?

নীরজা। নীরদ, তোমার মনের দুঃখ আমার কাছে প্রকাশ ক'রে কি তোমার একটুও শান্তি হয় না। আমাকে কি তুমি ততটুকুও ভালবাস না? তবে আজ কেন তুমি আমাকে কিছু বলচ না? কেন আপনার দুঃখ নিয়ে আপনি ব'সে আছ?

নীরদ। নীরজা, তুমি কি মনে করচ, আমি নলিনীকে ভালবেসে কষ্ট পাচ্চি? তা মনেও ক'রো না। তাকে আমি ভালবাসব কি ক'রে? তাতে আমাতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

নীরজা। কিন্তু, কেনই বা তাকে না ভালবাসবে? হয়ত সে ভালবাসবার যোগ্য।

নীরদ। না নীরজা, আমি তাকে ভালবাসি নে। আমি তোমাকে বার বার ক'রে বলচি, আমি তাকে ভালবাসি নে। এক কালে ভালবাসি ব'লে ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু সে ভ্রম একেবারে গিয়েছে। কেনই বা আমি তাকে ভাল-

বাসব ? সে কি আমাকে মমতা করতে পারে ? সে কি আমার প্রাণের কথা বুঝতে পারে ? তার কি হৃদয় আছে ? সে কেবল হাসতেই জানে, সে কি পরের জন্তে কখনও কেঁদেচে ?

নীরজা। কিন্তু সত্যি কথা বলি নীরদ, তোমরা পুরুষ মানুষেরা আমাদের ঠিক বুঝতে পার না। তুমি হয়ত জান না তার প্রাণের মধ্যে কি আছে! হয়ত সে তোমাকে ভালবাসে।

নীরদ। তা হবে! হয়ত তার প্রাণের কথা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু এ প্রতারণায় তার আবশ্যক কি ছিল? যখন তার মুখে কেবলমাত্র একটি কথা শোনবার জন্য আমার সমস্ত প্রাণের আশা একেবারে উন্মুখ হয়েছিল, তখন সে কেন মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্কের মত ফুল কুড়োতে লাগল ? আমার কথার কি একটি উত্তরও সে দিতে পারত না ?

নীরজা। কেমন ক'রে দেবে বল ? ক্ষুদ্র বালিকা সে, সে কি ভাষা জানে যে তার প্রাণের সব কথা বলতে পারে ? সে হয়ত ভাবলে, আমার মনের কথা আমি কিছুই ভাল ক'রে বলতে পারব না, সেই জন্তেই তুমি যদি আমার কথা ঠিক না বুঝতে পার, যদি দৈবাৎ আমার একটি কথাও অবিশ্বাস কর, তা হ'লে সে কি যন্ত্রণা! কি লজ্জা!

নীরদ। কিন্তু আমি কি তার ভাবেও কিছু বুঝতে পারতুম না!

নীরজা। তোমরা পুরুষরা যখন একবার নিজের হৃদয়ের কথা ভাব, তখন পরের হৃদয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখতেও পার না। নিজের সুখ দুঃখের সঙ্গে যতটুকু যোগ সেইটুকুই দেখতে পাও, তার সুখ দুঃখ চোখে পড়েও না। সে যে কি ভাবে কথা কয় না, সে যে কি দুঃখে চ'লে যায়, তা তোমরা দেখ না— তোমরা কেবল ভাব আমার সঙ্গে কথা কইলে না, আমার কাছ থেকে চ'লে গেল।

নীরদ। তা হবে! আমরা স্বার্থপর, সেই জন্তেই আমরা অন্ধ। কিন্তু ও কথা আর কেন ? ও-সব কথা আমি মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর ত আমি তাকে ভালবাসি নে; ভালবাসতে পারিও না! তবে ও কথা থাক্। আর একটা কথা বলা যাক। দেখ নীরজা, যদিও আমাদের বিবাহের দিন কাছে এসেচে, তবু মনে হচ্চে যেন এখনো কত দিন বাকী আছে! সময় যেন আর কাটচে না!

নীরজা। (নীরদের হাত ধরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া) নীরদ, আমার চোখে জল আসচে, কিছু মনে ক'রো না। বিবাহের দিন ত কাছে আসচে, এই সময় একবার মনে ক'রে দেখ আমরা কি করচি— কোথায় যাচ্চি। দেখো ভাই, আমাদের এ

বাসরঘর শ্মশানের উপর গড়া নয়ত! তার চেয়ে এস, এইখান থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক। তুমি এক দিকে যাও, আমি এক দিকে যাই। আমাদের সমুখে সংশয়ের সমুদ্র, কি হ'তে পারে কে জানে! আমরা দুজনে মিলে এই সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত এসেচি, আর এক পা এগিয়ে কাজ নেই। এইখানেই এস আমরা ফিরে যাই, যে যার দেশে চ'লে যাই। দুদিনের জন্যে দেখা হয়েচে, তোমাকে আমি ভালবেসেছি— কিন্তু তাই ব'লে এই আঁধার সমুদ্রে আমার ভারে তোমাকে ডোবাই কেন?

নীরদ। এ কি অশুভ কথা নীরজা? এ কি অমঙ্গল! কেঁদ না নীরজা! তোমার ও অশ্রুজল আজকের শোভা পায় না নীরজা!

নীরজা। কে জানে ভাই! আমার মনে আজ কেন এমন আশঙ্কা হচ্চে? আমার প্রাণের ভিতর থেকে যেন কেঁদে উঠচে! আমাকে মাপ কর। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্যে কিছুই ভাবচি নে। আমার মনে হচ্চে এ বিবাহে তুমি সুখী হ'তে পারবে না।

নীরদ। নীরজা, তবে তুমি আজ আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি ছাড়া আর কোথাও আমার আশ্রয় নেই— কেউ আমাকে মমতা করে না, কেউ আমাকে তার হৃদয়ের মধ্যে একটুখানি স্থান দেয় না— কেউ আমার মনের ব্যথা শোনে না, আমার প্রাণের কথা বোঝে না, তুমিও আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে? তা হ'লে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

নীরজা। না না— আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি? যা হবার তা হবে, আমি তোমার সাথের সাথী রইলেম— ডুবি ত দুজনে মিলে ডুবব। যদি এমন দিন আসে তুমি আমাকে ভালবাসতে না পার, তোমার সঙ্গে আমার যদি বিচ্ছেদ হয় ত—

নীরদ। ও কি কথা নীরজা? ও কথা মনেও আনতে নেই! দুঃখ এসে যাদের মিলন ক'রে দেয়, চোখের জলের মুক্ত'র মালা যারা বদল করেচে, তাদের সে মিলন পবিত্র— জন্মে জন্মে তাদের আর বিচ্ছেদ হয় না। হাসি খেলার চপলতার মধ্যে আমাদের মিলন হয় নি, আমাদের ভয় কিসের?

নীরজা। নীরদ, দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ ক'রে দেখি, ভাল ক'রে ধ'রে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়!

নীরদ। এই নাও আমার হাত। আজ থেকে তবে আর আমরা বিচ্ছিন্ন হব না? আজ থেকে তবে সুদীর্ঘ জীবনের পথে আমরা দুজনে মিলে যাত্রা করলেম?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আজ থেকে তবে তুমি আমার বিষাদের সঙ্গিনী হ'লে, অশ্রুজলের সাথী হ'লে?

নীরজা। হাঁ প্রিয়তম!

নীরদ। আমার বিষাদের গোধূলির মধ্যে তুমি সন্ধের তারাটির মত ফুটে থাকবে। তোমাকে আমি কখন হারাব না— চোখে চোখে রেখে দেব!

চতুর্থ দৃশ্য

দেশ

নীরদ নীরজা

নীরদ। এই ত আবার সেই দেশে ফিরে এলুম। মনে করি নি আর কখনো ফিরব। তোমাকে যদি না পেতুম তবে আর দেশে ফিরতুম না।

নীরজা। এমন সুন্দর দেশ আমি কোথাও দেখি নি। এ যেন আমার সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। এত পাখী, এত শোভা আর কোথায় আছে।

নীরদ। কিন্তু নীরজা, এদেশে কেবল শোভাই আছে, এদেশে হৃদয় নেই।

নীরজা। তা হতেই পারে না। এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে হৃদয় নেই এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না!

নীরদ। সৌন্দর্য্যকে দেখবামাত্রই লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে ফেলে এই জন্যেই ত পৃথিবীতে এত দুঃখ-যন্ত্রণা! সে কথা যাক— নলিনীদের বাড়ীতে আজ বসন্ত-উৎসব— আমাদের নিমন্ত্রণ হয়েচে, একটু শীগগির শীগগির যেতে হবে।

নীরজা। আমার একটি কথা রাখবে? আমি বলি ভাই, সেখানে আমাদের না যাওয়াই ভাল।

নীরদ। কেন?

নীরজা। কেন, তা জানি নে, কিন্তু কে জানে, আমার মনে হচ্চে সেখানে আজ না গেলেই ভাল!

নীরদ। নীরজা, তুমি কি আমার ভালবাসার প্রতি সন্দেহ কর?

নীরজা। প্রিয়তম, এ প্রশ্ন যদি তোমার মনে এসে থাকে— তবে থাক্— তবে আর আমি অধিক কিছু বলব না— তুমি চল!

নীরদ। আমি ত যাওয়াই ভাল বিবেচনা করি! আজ আমার কি গর্ব্বের দিন! তোমাকে সঙ্গে ক'রে যখন নিয়ে যাব, নলিনী দেখবে আমাকে ভালবাসবারও এক জন লোক আছে।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

নলিনীর উদ্যানে বসন্ত-উৎসব

নীরদ নীরজা

নীরদ। আমরা বড় সকাল সকাল এসেছি। এখনো এক জনো লোক আসে নি। (স্বগত) সেই ত সব তেমনিই রয়েচে! সেই সব মনে পড়চে! এই বকুলের তলায় ফুলগুলির উপর সে খেলা ক'রে বেড়াত! সূর্য্যের আলো তার সঙ্গে সঙ্গে যেন নৃত্য করত! তার হাসিতে গানেতে, তার সেই সরল প্রাণের আনন্দ-হিল্লোলে গাছের কুঁড়িগুলি যেন ফুটে উঠত। আমি কি ঘোর স্বার্থপর! সে হাসি, সে গান আমার কেন ভাল লাগত না! সেই জীবন্ত সৌন্দর্য্যরাশি আমি কেন উপভোগ করতে পারতুম না। এক দিন মনে আছে সকাল বেলায় ঐ কামিনী গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সুকুমার হাতটি বাড়িয়ে সে অন্যমনস্কে কামিনী ফুল তুলছিল, আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চমকে উঠে তার আঁচল থেকে ফুলগুলি প'ড়ে গেল, তার সেই চকিত নেত্র তার সেই লজ্জাবনত মুখখানি আমি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি! আহা, তাকে আর একবার তেমনি ক'রে দেখতে ইচ্ছে করচে! এই পরিচিত গাছপালাগুলির মধ্যে সূর্য্যালোকে সে তেমনি ক'রে বেড়াক, আমি এইখেনে চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তাই দেখি! আমি তাকে আর ভালবাসি নে বটে, কিন্তু তাই ব'লে তার যতটুকু সুন্দর তা আমার ভাল না লাগবে কেন? আহা, সে পুরণো দিনগুলি কোথায় গেল?

নীরজা। এ বাগানটি কি সুন্দর!

নীরদ। তুমি কেবল এর সৌন্দর্য্য দেখছ— আমি আরো অনেক দেখতে পাচ্চি। এই বাগানের প্রত্যেক গাছের ছায়ায় প্রত্যেক লতাকুঞ্জে আমার জীবনের এক একটি দিন, এক একটি মুহূর্ত্ত ব'সে রয়েচে! বাগানের চার দিকে তারা সব ঘিরে রয়েচে! তারা কি আমাকে দেখে আজ চিনতে পারচে? অপরিচিত লোকের মত আমাকে তারা কি আজ কৌতূহলদৃষ্টিতে চেয়ে দেখচে! এমন এক কাল গিয়েচে, যখন প্রতিদিন আমি এই বাগানে আসতুম, গাছপালাগুলি প্রতিদিন আমার জন্তে যেন অপেক্ষা ক'রে থাকত, আমি এলে আমাকে যেন এস এস ব'লে ডাকত। আজ কি তারা আর আমাকে সে রকম ক'রে ডাকচে? তারা হয়ত বলচে, তুমি কে এখেনে এলে?

ও কি নীরজা, তোমার মুখখানি অমন মলিন হয়ে এল কেন?

নীরজা। প্রিয়তম, তোমার সেই পুরণো দিনগুলির মধ্যে আমি ত একেবারেই ছিলুম না! এমন এক দিন ছিল যখন তুমি আমাকে একেবারেই জানতে না, একেবারেই আমি তোমার পর ছিলুম— তখন যদি কেউ গল্পচ্ছলে আমার কথা তোমার কাছে বলত তুমি হয়ত একটিবার মন দিয়ে শুনতে না, যদি কেউ বলত আমি ম'রে গেছি, তোমার চোখে একটি ফোঁটা জল পড়ত না! এককালে-যে আমি তোমার কেউই ছিলুম না এ মনে করলে কেমন প্রাণে ব্যথা বাজে! অনন্তকাল হ'তে আমাদের মিলন হয় নি কেন?

নীরদ। কেন হয় নি নীরজা? এই মধুর গাছপালাগুলি তোমার স্মৃতির সঙ্গে কেন জড়িয়ে যায় নি? আর এক জনের কথা কেন মনে পড়ে? আহা, যদি সেই জীবনের প্রভাতকালে তোমার ঐ প্রশান্ত মুখখানি দেখতে পেতেম! তোমার এই উদার মমতা, গভীর প্রেম, অতলস্পর্শ হৃদয়—

নীরজা। থাক্ থাক্ ওসব কথা থাক্— ঐ বুঝি সব গ্রামের লোকেরা আসচে! ঐ শোন বাঁশি বেজে উঠেচে! তবে বুঝি উৎসব আরম্ভ হ'ল! এখন আর আমাদের এ মলিন মুখ শোভা পায় না! এস আমরাও এ উৎসবে যোগ দিই।

নীরদ। হাঁ চল। একটা গান গাই।

আমার বড় ইচ্ছে এখনি একবার নলিনী এসে তোমাকে দেখে! তোমার সঙ্গে তার কতখানি প্রভেদ! সে গাছের ফুল, আর তুমি গাছের ছায়া! সে দু দণ্ডের শোভা, আর তুমি চিরকালের আশ্রয়।

নীরজা। দেখ দেখ, ছায়ার মত শীর্ণ মলিন ও রমণী কে?

নীরদ। (চমকিয়া) তাই ত, ও কে?

দূরে নলিনীর প্রবেশ

নীরদ। এ কি নলিনী, না নলিনীর স্বপ্ন?

নীরজা। (নলিনীর কাছে গিয়া) তুমি কাদের বাছা গা? আজ এ উৎসবের দিনে তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন?

নলিনী। আমি নলিনী।

নীরজা। (সচকিতে) তোমার নাম নলিনী?

নলিনী। হাঁ।

নীরজা। (স্বগত) আহা, এর মুখখানি কি হয়ে গেছে! নলিনী, আমি তোর মনের দুঃখ বুঝেছি! তাঁকে একবার এর কাছে ডেকে নিয়ে আসি!

ফুলির প্রবেশ

ফুলি। (দ্রুতবেগে আসিয়া) কাকা, কাকা!

নীরদ। (বুকে টানিয়া লইয়া) মা আমার, বাছা আমার!

ফুলি। এত দিন কোথায় ছিলে কাকা?

নীরদ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিস নে ফুলি! আবার আমি তোদের কাছে এসেছি, আর আমি তোদের ছেড়ে কোথাও যাব না!

ফুলি। কাকা, একবার দিদির কাছে চল!

নীরদ। কেন ফুলি?

ফুলি। একবার দেখ'সে দিদি কি হয়ে গেছে!

নবীনের প্রবেশ

নবীন। এই যে নীরদ, এসেছ? আমরা সব স্বার্থপর কি অন্ধ হয়েই ছিলেম নীরদ! একবার নলিনীর কাছে চল।

নীরদ। কেন নবীন!

নবীন। একবার তার সঙ্গে একটি কথা কও'সে! তোমার একটি কথা শোনবার জন্য সে আজ কত দিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রে আছে! কত দিন কত মাস ধ'রে জানলার কাছে ব'সে সে পথের পানে চেয়ে আছে, তোমার দেখা পায় নি! তার সে খেলাধূলা কিছুই নেই, একেবারে ছায়ার মত হয়ে গেছে! কত দিন পরে আজ আবার সে এই বাগানে এয়েছে, কিন্তু তার সেই হাসিটি কোথায় রেখে এল?

এ বাগানের মধ্যে তার অমন করুণ ম্লান মুখ কি চোখে দেখা যায়! এই বাগানেই তোমার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এই বাগানেই বুঝি শেষ দেখা হবে!

(তাড়াতাড়ি নলিনীর কাছে আসিয়া)

নীরদ। নলিনী!

(নলিনী অতি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল)

নীরদ। নলিনী!

নলিনী। (ধীরে) কি নীরদ!

নীরদ। (নলিনীর হাত ধরিয়া) আর কিছু দিন আগে কেন আমার সঙ্গে কথা কইলে না নলিনী! আর কিছু দিন আগে কেন ঐ সুধামাখা স্বরে আমার নাম ধ'রে ডাক নি! আজ— আজ এই অসময়ে কেন ডাকলে? নলিনী নলিনী—

(নলিনীর মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

নীরজা। এ কি হ'ল, এ কি হ'ল!

ফুলি। (তাড়াতাড়ি) দিদি— দিদি!— কাকা, দিদির কি হ'ল?

(নীরজা : নলিনীর মাথা কোলে রাখিয়া বাতাস-করণ
নলিনীর মূর্চ্ছাভঙ্গ)

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন— আর বেশী দিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব।

নলিনী। (নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি কে গা, তুমি কাঁদচ কেন?

নীরজা। আমি তোর দিদি হই বোন!

ষষ্ঠ দৃশ্য

মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্বে নীরদ

নবীন

নীরজা। একবার নলিনীকে ডেকে দাও। বুঝি সময় চ'লে গেল।

[নবীনের প্রস্থান

আমি চল্লেম ভাই— আমার সঙ্গে কেন তোমার দেখা হ'ল ? আমি হতভাগিনী কেন তোমাদের মাঝখানে এলেম ? প্রিয়তম, আমি যেন চিরকাল তোমার দুঃখের স্মৃতির মত জেগে না থাকি ! আমাকে ভুলে যেয়ো।

নলিনীকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

নলিনী, বোন আমার, তোদের আজ মিলন হোক, আমি দেখে যাই। (পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ) (নলিনীকে চুম্বন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া) তবে আমি চল্লেম বোন !

নলিনী। (নীরজাকে আলিঙ্গন করিয়া) দিদি তুই আমার আগে চ'লে গেলি ? আমিও আর বেশী দিন থাকব না, আমিও শীগ্‌গির তোর কাছে যাচ্চি !

শৈশবসঙ্গীত

শৈশব সঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত

—

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার— বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।

গ্রন্থকার

উপহার

এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল, তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই, মনে হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ লেখাগুলি তোমার চোখে পড়িবেই।

শৈশবসঙ্গীত

ফুলবালা

গাথা

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
　　সুধার ঝরণা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
　　নীরবে লইছে সুরভিডালি।
যমুনা বহিছে নাচিয়া নাচিয়া
　　গাহিয়া গাহিয়া অফুট গান—
থাকিয়া থাকিয়া বিজনে পাপিয়া
　　কানন ছাপিয়া তুলিছে তান।
পাতায় পাতায় লুকায়ে কুসুম,
　　কুসুমে কুসুমে শিশির দুলে—
শিশিরে শিশিরে জোছনা পড়েছে
　　মুকুতা-গুলিন সাজায়ে ফুলে।
তটের চরণে তটিনী ছুটিছে,
　　ভ্রমর লুটিছে ফুলের বাস—
সেঁউতি ফুটিছে, বকুল ফুটিছে
　　ছড়ায়ে ছড়ায়ে সুরভিশ্বাস।
কুহরি উঠিছে কাননে কোকিল,
　　শিহরি উঠিছে দিকের বালা—
তরল লহরী গাঁথিছে আঁচলে
　　ভাঙ্গা ভাঙ্গা যত চাঁদের মালা।
ঝোপে ঝোপে ঝোপে লুকায়ে আঁধার,
　　হেথা হোথা চাঁদ মারিছে উঁকি—

সুধীরে আঁধার-ঘোমটা হইতে
কুসুমের খোলো হাসে মুচুকি।
এস কল্পনে! এ মধুর রেতে
দুজনে বীণায় পূরিব তান।
সকল ভুলিয়া হৃদয় খুলিয়া
আকাশে তুলিয়া করিব গান।
হাসি কহে বালা, "ফুলের জগতে
যাইবে আজিকে কবি?
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা,
কত কি অদ্ভুত ছবি!
চারি দিকে যেথা ফুলে ফুলে আলা
উড়িছে মধুপকুল।
ফুলদলে-দলে ভ্রমি ফুলবালা
ফুঁ দিয়া ফুটায় ফুল।
দেখিবে কেমনে শিশিরসলিলে
মুখ মাজি ফুলবালা
কুসুমরেণুর সিঁদুর পরিয়া
ফুলে ফুলে করে খেলা।
দেহখানি ঢাকি ফুলের বসনে
প্রজাপতি-'পরে চড়ি
কমলকাননে কুসুমকামিনী
ধীরে ধীরে যায় উড়ি।
কমলে বসিয়া মুচুকি হাসিয়া
দুলিছে লহরীভরে,
হাসিমুখখানি দেখিছে নীরবে
সরসী-আরসি-'পরে।
ফুলকোল হ'তে পাপড়ি খসায়ে
সলিলে ভাসায়ে দিয়া
চড়ি সে পাতায় ভেসে ভেসে যায়
ভ্রমরে ডাকিয়া নিয়া।

কোলে ক'রে লয়ে ভ্রমরে তখন
গাহিবারে কহে গান।
গান গাওয়া হলে হরষে মোহিনী
ফুলমধু করে দান।
দুই চারি বালা হাত ধরি ধরি
কামিনী-পাতায় বসি
চুপি চুপি চুপি ফুলে দেয় দোল,
পাপড়ি পড়য়ে খসি।
দুই ফুলবালা মিলি বা কোথায়
গলা-ধরাধরি করি
ঘাসে ঘাসে ঘাসে ছুটিয়া বেড়ায়
প্রজাপতি ধরি ধরি।
কুসুমের 'পরে দেখিয়া ভ্রমরে
আবরি পাতার দ্বার
ফুলফাঁদে ফেলি পাখায় মাথায়
কুসুমরেণুর ভার।
ফাঁফরে পড়িয়া ভ্রমর উড়িয়া
বাহির হইতে চায়,
কুসুমরমণী হাসিয়া অমনি
ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।
ডাকিয়া আনিয়া সবারে তখনি
প্রমোদে হইয়া ভোর
কহে হাসি হাসি করতালি দিয়া
'কেমন পরাগচোর!' "
এত বলি ধীরে কলপনা-রাণী
বীণায় আভানি তান
বাজাইল বীণা আকাশ ভরিয়া
অবশ করিয়া প্রাণ!
গভীর নিশীথে সুদূর আকাশে
মিশিল বীণার রব,

ঘুমঘোরে আঁখি মুদিয়া রহিল
দিকের বালিকা সব।
ঘুমায়ে পড়িল আকাশ পাতাল,
ঘুমায়ে পড়িল স্বরগবালা,
দিগন্তের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
জোছনা-মাখানো জলদমালা।
একি একি ওগো কলপনা সখি!
কোথায় আনিলে মোরে!
ফুলের পৃথিবী— ফুলের জগৎ—
স্বপন কি ঘুমঘোরে?
হাসি কলপনা কহিল শোভনা,
"মোর সাথে এস কবি!
দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা
কত কি অদ্ভুত ছবি!
ওই দেখ ওই ফুলবালাগুলি
ফুলের সুরভি মাখিয়া গায়
শাদা শাদা ছোট পাখাগুলি তুলি
এ ফুলে ও ফুলে উড়িয়া যায়!
এ ফুলে লুকায়, ও ফুলে লুকায়—
এ ফুলে ও ফুলে মারিছে উঁকি,
গোলাপের কোলে উঠিয়া দাঁড়ায়—
ফুল টলমল পড়িছে ঝুঁকি।
ওই হোথা ওই ফুলশিশু-সাথে
বসি ফুলবালা অশোক ফুলে
দুজনে বিজনে প্রেমের আলাপ
কহে চুপিচুপি হৃদয় খুলে।"
কহিল হাসিয়া কলপনাবালা
দেখায়ে কত কি ছবি,
"ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
শুনিবে এখন কবি?"

এতেক শুনিয়া আমরা দুজনে
বসিনু চাঁপার তলে,
সমুখে মোদের কমলকানন
নাচে সরসীর জলে।
এ কি কলপনা, এ কি লো তরুণী,
দুরন্ত কুসুমশিশু
ফুলের মাঝারে লুকায়ে লুকায়ে
হানিছে ফুলের ইষু।
চারি দিক হতে ছুটিয়া আসিয়া
হেরিয়া নূতন প্রাণী
চারি ধার ঘিরি রহিল দাঁড়ায়ে
যতেক কুসুমরাণী!
গোলাপ মালতী, শিউলি সেঁউতি,
পারিজাত নরগেশ,
সব ফুলবাস মিলি এক ঠাঁই
ভরিল কাননদেশ।
চুপি চুপি আসি কোন ফুলশিশু
ঘা মারে বীণার 'পরে,
ঝন্ করি যেই বাজি উঠে তায়
চমকি পলায় ডরে।
অমনি হাসিয়া কলপনাসখী
বীণাটি লইয়া করে
ধীরি ধীরি ধীরি মৃদুল মৃদুল
বাজায় মধুর স্বরে।
অবাক্ হইয়া ফুলবালাগণ
মোহিত হইয়া তানে
নীরব হইয়া চাহিয়া রহিল
শোভনার মুখপানে।
ধীরি ধীরি সবে বসিয়া পড়িল
হাতখানি দিয়া গালে,

ফুলে বসি বসি ফুলশিশুগণ
দুলিতেছে তালে তালে।
হেন কালে এক আসিয়া ভ্রমর
কহিল তাদের কানে,
"এখনো রয়েছে বাকী কত কাজ,
ব'সে আছ এইখানে ?
রঙ দিতে হবে কুসুমের দলে,
ফুটাতে হইবে কুঁড়ি—
মধুহীন কত গোলাপকলিকা
রয়েছে কানন জুড়ি !"
অমনি যেন রে চেতন পাইয়া
যতেক কুসুমবালা,
পাখাটি নাড়িয়া উড়িয়া উড়িয়া
পশিল কুসুমশালা।
মুখ ভারী করি ফুলশিশুদল
তুলিকা লইয়া হাতে
মাখাইয়া দিল কত কি বরণ
কুসুমের পাতে পাতে।
চারি দিকে দিকে ফুলশিশুদল
ফুলের বালিকা কত
নীরব হইয়া রয়েছে বসিয়া,
সবাই কাজেতে রত।
চারি দিক এবে হইল বিজন,
কানন নীরব ছবি—
ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী
কহে কলপনাদেবী।

আজি পুরণিমানিশি,
তারকাকাননে বসি

অলসনয়নে শশী
　　মৃদুহাসি হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
　　কি যেন কি ভাবিছে!
কাননে নিঝর ঝরে
মৃদু কলকল স্বরে,
অলি ছুটাছুটি করে
　　গুন্ গুন্ গাহিয়া!
সমীর অধীরপ্রাণ
গাহিয়া উঠিছে গান,
তটিনী ধরেছে তান,
　　ডাকি উঠে পাপিয়া।
সুখের স্বপন-মত
পশিছে সে গান যত
ঘুমঘোরে জ্ঞানহত
　　দিক্‌বধূ-শ্রবণে—
সমীর সভয়হিয়া
মৃদু মৃদু পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
　　লতাবধূ-ভবনে!
কুসুম-উৎসবে আজি
ফুলবালা ফুলে সাজি,
কত না মধুপরাজি
　　এক ঠাঁই কাননে!
ফুলের বিছানা পাতি
হরষে প্রমোদে মাতি
কাটাইছে সুখরাতি
　　নৃত্যগীতবাদনে!

ফুলবাস পরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া
নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী।
চুলগুলি এলিয়ে
উড়িতেছে খেলিয়ে,
ফুলরেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী।
ফুলবাঁশী ধরিয়ে
মৃদু তান ভরিয়ে
বাজাইছে ফুলশিশু বসি ফুল-আসনে।
ধীরে ধীরে হাসিয়া
নাচি নাচি আসিয়া
তালে তালে করতালি দেয় কেহ সঘনে
কোন ফুলরমণী
চুপি চুপি অমনি
ফুলবালকের কানে কথা যায় বলিয়ে।
কোথাও বা বিজনে
বসি আছে দুজনে,
পৃথিবীর আর সব গেছে যেন ভুলিয়ে!
কোন ফুলবালিকা
গাঁথি ফুলমালিকা
ফুলবালকের কথা একমনে শুনিছে,
বিব্রত শরমে
হরষিত-মরমে
আনত আননে বালা ফুলদল গুণিছে!

দেখেছ হোথায় অশোকবালক
মালতীর পাশে গিয়া
কহিছে কত কি মরমকাহিনী,
খুলিয়া দিয়াছে হিয়া।

ভ্রূকুটি করিয়া নিদয়া মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি,
মৃদু-উপহাসে সরল প্রেমের
কোমলহৃদয় দলি।
অধীর অশোক যদি বা কখনো
মালতীর কাছে আসে,
ছুটিয়া অমনি পলায় মালতী
বসে বকুলের পাশে।
থাকিয়া থাকিয়া সরোষ ভ্রূকুটি
অশোকের পানে হানে—
ভ্রূকুটি সেগুলি বাণের মতন
বিঁধিল অশোকপ্রাণে।
হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা,
মলিন অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে বহিয়া ব্যথা।
দেখ দেখি চেয়ে মালতীহৃদয়ে
কাহারে সে ভালবাসে!
বল দেখি মোরে হৃদয় তাহার
রয়েছে কাহার পাশে?
ওই দেখ তার হৃদয়ের পটে
অশোকেরই নাম লিখা!
অশোকেরি তরে জ্বলিছে তাহার
প্রণয়-অনলশিখা!
এই যে নিদয় চাতুরী সতত
দলিছে অশোকপ্রাণ—
অশোকের চেয়ে মালতীহৃদয়ে
বিঁধিছে তাহার বাণ।
মনে মনে করে কত বার বালা
অশোকের কাছে গিয়া

কহিবে তাহারে মরমকাহিনী
হৃদয় খুলিয়া দিয়া।
ক্ষমা চাবে গিয়া পায়ে ধরে তার,
খাইয়া লাজের মাথা
পরাণ ভরিয়া লইবে কাঁদিয়া,
কহিবে মনের ব্যথা।
তবুও কি যেন আটকে চরণ,
সরমে সরে না বাণী,
বলি বলি করি বলিতে পারে না
মনোকথা ফুলরাণী।
মন চাহে এক ভিতরে ভিতরে,
প্রকাশ পায় যে আর—
সামালিতে গিয়া নারে সামালিতে
এমন জ্বালা সে তার!
মলিন অশোক ম্রিয়মাণ মুখে
একেলা রহিল সেথা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
হৃদয়ে হৃদয়ব্যথা।
দেখে নি কিছুই, শোনে নি কিছুই
কে গায় কিসের গান,
রহিয়াছে বসি বহি আপনার
হৃদয়ে-বিঁধানো বাণ।
কিছুই নাহি রে পৃথিবীতে যেন,
সব সে গিয়েছে ভুলি,
নাহি রে আপনি— নাহি রে হৃদয়-
রয়েছে ভাবনাগুলি।
ফুলবালা এক দেখিয়া অশোকে
আদরে কহিল তারে,
"কেন গো অশোক, মলিন হইয়া
ভাবিছ বসিয়া কারে?"

এত বলি তায় ধরি হাতখানি
আনিল সভায় 'পরে—
"গাও মা অশোক— গাও" বলি তারে
কত সাধাসাধি করে।
নাচিতে লাগিল ফুলবালা-দল—
ভ্রমর ধরিল তান—
মৃদু মৃদু মৃদু বিষাদের স্বরে
অশোক গাহিল গান।

গান

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে,
মধুপ হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্ নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্ রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে, "হোথায় বেলা,
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলি নি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জলিব!"

বিষাদের গান কেন গো আজিকে?
আজিকে প্রমোদরাতি!
হরষের গান গাও গো অশোক
হরষে প্রমোদে মাতি!

সবাই কহিল, "গাও গো অশোক,
গাও গো প্রমোদগান,
নাচিয়া উঠুক কুসুমকানন
নাচিয়া উঠুক প্রাণ।"
কহিল অশোক, "হৃদয়ের গান
গাহিতে বোলো না আর—
কেমনে গাহিব? হৃদয়বীণায়
বাজিছে বিষাদ-তার।"
এতেক বলিয়া অশোক বালক
বসিল ভূমির 'পরে—
কে কোথায় সব গেল সে ভুলিয়া
আপন ভাবনা-ভরে!
কিছু দিন আগে কি ছিল অশোক!
তখন আরেক ধারা,
নাচিয়া ছুটিয়া এখানে সেখানে
বেড়াত অধীর-পারা।
নবীন যুবক, শোহনগঠন,
সবাই বাসিত ভালো—
যেখানে যাইত অশোক যুবক
সেখান করিত আলো!
কিছু দিন হতে এ কেমন ভাব—
কোথাও না যায় আর।
একলাটি থাকে বিরলে বসিয়া
হৃদয়ে পাষাণভার!
অরুণকিরণ হইতে এখন
বরণ বাহির করি
রাঙায় না আর ললিত বসন
মোহিনী তুলিটি ধরি।
পূরণিমা-রেতে জোছনা হইতে
অমিয় করিয়া চুরি

মধু নিরমিয়া নাহি রাখে আর
　　কুসুমপাতায় পূরি !

ক্রমশ নিভিল চাঁদের জোছনা,
　　নিভিল জোনাক-পাঁতি—
পূরবের দ্বারে উষা উঁকি মারে,
　　আলোকে মিশাল রাতি !
প্রভাত-পাখীরা উঠিল গাহিয়া,
　　ফুটিল প্রভাতকুসুমকলি—
প্রভাতশিশিরে নাহিবে বলিয়া
　　চলে ফুলবালা পথ উজলি ।
তার পরদিন রটিল প্রবাদ
　　অশোক নাইক ঘরে !
কোথায় অবোধ কুসুমবালক
　　গিয়েছে বিষাদভরে !
কুসুমে কুসুমে পাতায় পাতায়
　　খুঁজিয়া বেড়ায় সকলে মিলি—
কি হবে— কোথাও নাহিক অশোক !
　　কোথায় বালক গেল রে চলি !

কহে কলপনা, "খুঁজি চল গিয়া
　　অশোক গিয়াছে কোথা—
সুমুখে শোভিছে কুসুমকানন
　　দেখ দেখি, কবি, হোথা !
ঘাড় উঁচু করি হোথা গরবিনী
　　ফুটেছে ম্যাগ্‌নোলিয়া—
কাননের যেন চোখের সামনে
　　রূপরাশি খুলি দিয়া !
সাধাসাধি করে কত শত ফুল
　　চারি দিকে হেথা হোথা—

মুচকিয়া হাসে গরবের হাসি
ফিরিয়া না কয় কথা!
হ্যাদে দেখ, কবি, সরসীভিতরে
কমল কেমন ফুটেছে!
এ পাশে ও পাশে পড়িছে হেলিয়া—
প্রভাতসমীর উঠেছে!
ঘোমটা-ভিতরে লোহিত অধরে
বিমল কোমল হাসি
সরসী-আলয় মধুর করেছে
সৌরভ রাশি রাশি!
নিরমল জলে নিরমল রূপে
পৃথিবী করিছে আলো—
পৃথিবীর প্রেমে তবু নাহি মন,
রবিরেই বাসে ভালো!
কাননবিপিনে কত ফুল ফুটে
কিছুই বালা না জানে,
হৃদয়ের কথা কহে সুবদনী,
সখীদের কানে কানে।
হোথায় দেখেছ লজ্জাবতী লতা
লুটায়ে ধরণী-'পরে,
ঘাড় হেঁট করি কেমন রয়েছে
মরমসরম-ভরে।
দূর হতে তার দেখিয়া আকার
ভ্রমর বধিবা আসে
সরমে সভয়ে মলিন হইয়া
স'রে যায় এক পাশে!
গুন গুন করি বধিবা ভ্রমর
শুধায় প্রেমের কথা—
কাঁপে থর থর, না দেয় উত্তর,
হেঁট করি থাকে মাথা!

ওই দেখ হোথা রজনীগন্ধা
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা !"

চমকিয়া কহে কল্পনাবালা,—
"দেখিয়া কাননছবি
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি !
ওই যে মালতী বিরলে বসিয়া
সুবাস দিয়াছে এলি,
মাথার উপরে আটকে তপন
প্রজাপতি পাখা মেলি।
এস দেখি, কবি, ওইখানটিতে
দাঁড়াই গাছের তলে,
শুনি চুপি চুপি মালতীবালারে
ভ্রমর কি কথা বলে।"
কহিছে ভ্রমর, "কুসুমকুমারি—
বকুল পাঠালে মোরে,
তাই ত্বরা ক'রে এসেছি হেথায়
বারতা শুনাতে তোরে !
অশোকবালক কি যে হয়ে গেছে
সে কথা বলিব কারে।
তোর মত হেন মোহিনীবালারে
ভুলিতে কি কভু পারে ?
তবু তারে আহা উপেখিয়া তুই
রবি কি হেথায় মোন ?
পরাণ সঁপিয়া অশোক তবু কি
পাবে নাকো তোর মন ?

মনের হুতাশে আশারে পুড়ায়ে
উদাস হইয়া গেছে,
কাননে কাননে খুঁজিয়া বেড়াই
কে জানে কোথায় আছে।"
চমকি উঠিল মালতীবালিকা
ঘুম হ'তে যেন জাগি,
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
"চলিয়া গিয়াছে অশোককুমার?"
কহিল ক্ষণেক-পর,
"চলিয়া গিয়াছে অশোক আমার
ছাড়িয়া আপন ঘর?
তবে আর আমি বিষাদকাননে
থাকিব কিসের আশে?
যাইব অশোক গিয়েছে যেখানে,
যাইব তাহার পাশে।
বনে বনে ফিরি বেড়াব খুঁজিয়া
শুধাব লতার কাছে,
খুঁজিব কুসুমে খুঁজিব পাতায়
অশোক কোথায় আছে!
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অশোকে আমার
যায় যদি যাবে প্রাণ—
আমা হ'তে তবু হবে না কখনো
প্রণয়ের অপমান!"

ছাড়ি নিজবন চলিল মালতী
চলিল আপন মনে,
অশোকবালকে খুঁজিবার তরে
ফিরে কত বনে বনে।

"অশোক" "অশোক" ডাকিয়া ডাকিয়া
লতায় পাতায় ফিরে,
ভ্রমরে শুধায়, ফুলেরে শুধায়,—
"অশোক এখানে কি রে ?"
হোথায় নাচিছে অমল সরসী
চল দেখি হোথা কবি—
নিরমল জলে নাচিছে কমল
মুখ দেখিতেছে রবি !
রাজহাঁস দেখ সাঁতারিছে জলে
শাদা শাদা পাখা তুলি,
পিঠের উপরে পাখার উপরে
বসি ফুলবালাগুলি !
এখানেও নাই, চল যাই তবে—
ওই নিঝরের ধারে
মাধবী ফুটেছে, শুধাই উহারে
বলিতে যদি সে পারে।
বেগে উথলিয়া পড়িছে নিঝর—
ফেনগুলি ধরি ধরি
ফুলশিশুগণ করিতেছে খেলা
রাশ রাশ করি করি !
আপনার ছায়া ধরিবারে গিয়া
না পেয়ে হাসিয়া উঠে—
হাসিয়া হাসিয়া হেথায় হোথায়
নাচিয়া খেলিয়া ছুটে !
ওগো ফুলশিশু ! খেলিছ হোথায়
শুধাই তোমার কাছে,
অশোকবালকে দেখেছ কোথাও,
অশোক হেথা কি আছে ?
এখানেও নাই, এস তবে, কবি,
কুসুমে খুঁজিয়া দেখি—

ওই যে ওখানে গোলাপ
হোথায় রয়েছে— এ কি ?
এ কে গো ঘুমায়— হেথায়— হেথায়-
মুদিয়া দুইটি আঁখি,
গোলাপের কোলে মাথাটি সঁপিয়া
পাতায় দেহটি রাখি !
এই আমাদের অশোকবালক
ঘুমায়ে রয়েছে হেথা !
দুখিনী ব্যাকুলা মালতীবালিকা
খুঁজিয়া বেড়ায় কোথা ?
চল চল, কবি, চল দুই জনে
মালতীরে ডেকে আনি,
হরষে এখনি উঠিবে নাচিয়া
কাতরা কুসুমরাণী !

কোথাও তাহারে পেনু না খুঁজিয়া
এখন কি করি তবে !
অশোকবালক না যায় কোথাও,
বুঝায়ে রাখিতে হবে !
গোলাপশয়নে ঘুমায় অশোক
দুখতাপ সব ভুলি,
চল দেখি সেথা কহিব আমরা
সব কথা তারে খুলি !
দেখ দেখ, কবি, অশোকশিয়রে
ওই না মালতী হোথা ?
গোলাপ হইতে লয়েছে তুলিয়া
কোলে অশোকের মাথা।
কত যে বেড়ায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কাননে কাননে পশি !

কখন্ হেথায় এসেছে বালিকা ?
রয়েছে হোথায় বসি !
ঘুমায়ে রয়েছে অশোকবালক
শ্রমেতে কাতর হয়ে,
মুখের পানেতে চাহিয়া মালতী
কোলেতে মাথাটি লয়ে !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকবালক
সুখের স্বপন হেরে,
গাছের পাতাটি লইয়া মালতী
বীজন করিছে তারে।
নত করি মুখ দেখিছে বালিকা
দুখানি নয়ন ভরি,
নয়ন হইতে শিশিরের মত
সলিল পড়িছে ঝরি !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকের যেন
অধর উঠিল কাঁপি !
"মালতী" "মালতী" বলিয়া বালার
হাতটি ধরিল চাপি !
হরষে ভাসিয়া কহিল মালতী
হেঁট করি আহা মাথা,
"অশোক— অশোক— মালতী তোমার
এই যে রয়েছে হেথা !"
ঘুমের ঘোরেতে পশিল শ্রবণে
"এই-যে, রয়েছে হেথা !"
নয়নের জলে ভিজায়ে পলক
অশোক তুলিল মাথা !
একি রে স্বপন ? এখনো একি রে
স্বপন দেখিছে নাকি ?
আবার চাহিল অশোকবালক,
আবার মাজিল আঁখি !

অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া,
বচন নাহিক সরে—
থাকিয়া থাকিয়া পাগলের মত
কহিল অধীর স্বরে,
"মালতী— মালতী— আমার মালতী!"
মালতী কহিল কাঁদি
"তোমারি মালতী! তোমারি মালতী!"
অশোকে হৃদয়ে বাঁধি!—
"ক্ষমা কর মোরে অশোক আমার,
কত না দিয়েছি জ্বালা!
ভালবাসি ব'লে ক্ষমা কর মোরে
আমি যে অবোধ বালা!
তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কখন
আর না যাইব চলি,
দিবস রজনী তুষিব হেথায়
বিষাদ ভাবনা ভুলি!
ও হৃদয় ছাড়ি মালতীর আর
কোথায় আরাম আছে?
তোমারে ছাড়িয়া দুখিনী মালতী
যাবে আর কার কাছে?"
অশোকের হাতে দিয়া দুটি হাত
কত যে কাঁদিল বালা!
কাঁদিছে দুজনে বসিয়া বিজনে
ভুলিয়া সকল জ্বালা!
উঠিল দুজনে পাশাপাশি হয়ে
হাত ধরাধরি করি—
সাজিল তখন পৃথিবী জগৎ
হাসিতে আনন ভরি!
গাহিয়া উঠিল হরষে ভ্রমর,
নিঝর বহিল হাসি—

দুলিয়া দুলিয়া নাচিল কুসুম
ঢালিয়া সুরভিরাশি !
ফিরিল আবার অশোকের ভাব
প্রমোদে পূরিল প্রাণ—
এখানে সেখানে বেড়ায় খেলিয়া
হরষে গাহিয়া গান।
অশোক মালতী মিলিয়া দুজনে
জোনাকের আলো জ্বালি
একই কুসুমে মাথায় বরণ,
মধু দেয় ঢালি ঢালি !

বরষের পরে এল হরষের যামিনী
আবার মিলিল যত কুসুমের কামিনী !
জোছনা পড়িছে ঝরি সুমুখের সরসে—
টলমল ফুলদলে
ধরি ধরি গলে দলে
নাচে ফুলবালা-দলে,
মালা দুলে উরসে—
তখন সুখের তানে মরমের হরষে
অশোক মনের সাধে গীতধারা বরষে।

গান

দেখে যা— দেখে যা— দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
হেথা জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি, আয় লো, হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,

তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
সুখে গাঁথিব মালা, গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
এ কাননে বসি গাহিব গান,
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে—
প্রাণে রহিবে মিশি দিবস নিশি
আধো আধো ঘুমঘোর!

অতীত ও ভবিষ্যৎ

কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটীরখানি—
সমুখে নদীটি যায় চলি,
মাথার উপরে তার বট অশথের ছায়া,
সামনে বকুল গাছগুলি।
সারাদিন হু হু করি বহিছে নদীর বায়ু,
ঝর ঝর দুলে গাছপালা,
ভাঙাচোরা বেড়াগুলি, উঠেছে লতিকা তায়
ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
ও দিকে পড়িয়া মাঠ, দূরে দু-চারিটি গাভী
চিবায় নবীন তৃণদল—
কেহবা গাছের ছায়ে কেহবা খালের ধারে
পান করে সুশীতল জল।
জান ত কল্পনাবালা, কত সুখে ছেলেবেলা
সেইখানে করেছি যাপন—

সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে,
হুহু ক'রে ওঠে যেন মন।
নিশীথে নদীর 'পরে ঘুমিয়েছে ছায়া-চাঁদ,
সাড়াশব্দ নাই চারি পাশে,
একটি দুরন্ত ঢেউ জাগে নি নদীর কোলে,
পাতাটিও নড়ে নি বাতাসে,
তখন যেমন ধীরে দূর হ'তে দূর প্রান্তে
নাবিকের বাঁশরীর গান—
ধরি ধরি করি সুর ধরিতে না পারে মন,
উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ!
কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়াছি যেন ভুলে,
বিস্মৃতি স্বপনবেশে পরাণের কাছে এসে
আধস্মৃতি জাগাইয়া তুলে।
তেমনি হে কলপনা, তুমি ও বীণায় যবে
বাজাও সেদিনকার গান,
আঁধার মরমমাঝে জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি,
কেঁদে ওঠে আকুল পরাণ!
হা দেবি, তেমনি যদি থাকিতাম চিরকাল!
না ফুরাত সেই ছেলেবেলা,
হৃদয় তেমনি ভাবে করিত গো থল থল,
মরমেতে তরঙ্গের খেলা!
ঘুমভাঙা আঁখি মেলি যখন প্রফুল্ল ঊষা
ফেলে ধীরে সুরভিনিশ্বাস,
ঢেউগুলি জেগে ওঠে পুলিনের কানে কানে
কহে তার মরমের আশ।
তেমনি উঠিত হৃদে প্রশান্ত সুখের ঊর্মি
অতি-মৃদু অতি-সুশীতল—
বহিত সুখের শ্বাস, নাহিয়া শিশিরজলে
ফেলে যথা কুসুমসকল।

অথবা যেমন যবে প্রশান্ত সায়াহ্নকালে
ডুবে সূর্য্য সমুদ্রের কোলে,
বিষণ্ণ কিরণ তার শ্রান্ত বালকের মত
প'ড়ে থাকে সুনীল সলিলে।
নিস্তব্ধ সকল দিক, একটি ডাকে না পাখী,
একটুও বহে না বাতাস,
তেমনি কেমন এক গম্ভীর বিষণ্ণ সুখ
হৃদয়ে তুলিত দীর্ঘশ্বাস।
এইরূপ কত কি যে হৃদয়ের ঢেউ-খেলা
দেখিতাম বসিয়া বসিয়া,
মরমের ঘুমঘোরে কত দেখিতাম স্বপ্ন
যেত দিন হাসিয়া-খুসিয়া।
বনের পাখীর মত অনন্ত আকাশতলে
গাহিতাম অরণ্যের গান—
আর কেহ শুনিত না, প্রতিধ্বনি জাগিত না,
শূন্যে মিলাইয়া যেত তান।
প্রভাত এখনো আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
আমার এমন দুরদশা—
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজালা,
ভবিষ্যতে এ কি রে কুয়াশা!
যেন এই জীবনের আঁধারসমুদ্র-মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরী,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীলতট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!
সেদিকে ফিরায়ে আঁখি এখনো দেখিতে পাই
ছায়া-ছায়া কাননের রেখা,
নানা বরণের মেঘ মিশেছে বনের শিরে
এখনো বুঝি রে যায় দেখা!
যেতেছি যেখানে ভাসি সেদিকে চাহিয়া দেখি
কিছুই ত না পাই উদ্দেশ—

আঁধার সলিলরাশি সুদূর দিগন্তে মিশে,
কোথাও না দেখি তার শেষ!
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্ন তরি একাকী যাইবে ভাসি
যত দিনে ডুবিয়া না যায়,
সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুতশিখায়!

দিকবালা

দূর আকাশের পথ উঠিছে জলদরথ,
নিম্নে চাহি দেখে কবি ধরণী নিদ্রিত।
অস্ফুট চিত্রের মত নদ নদী পরবত,
পৃথিবীর পটে যেন রয়েছে চিত্রিত!
সমস্ত পৃথিবী ধরি একটি মুঠায়
অনন্ত সুনীল সিন্ধু সুধীরে লুটায়।
হাত ধরাধরি করি দিক্‌বালাগণ
দাঁড়ায়ে সাগরতীরে ছবির মতন।
কেহ বা জলদময় মাথায়ে জোছনা
নীল দিগন্তের কোলে পাতিছে বিছানা।
মেঘের শয্যায় কেহ ছড়ায়ে কুন্তল
নীরবে ঘুমাইতেছে নিদ্রায় বিহ্বল।
সাগরতরঙ্গ তার চরণে মিলায়,
লইয়া শিথিল কেশ পবন খেলায়।
কোন কোন দিক্‌বালা বসি কুতূহলে
আকাশের চিত্র আঁকে সাগরের জলে।
আঁকিল জলদমালা চন্দ্রগ্রহ তারা,
রঞ্জিল সাগর দিয়া জোছনার ধারা।

পাপিয়ার ধ্বনি শুনি কেহ হাসিমুখে
প্রতিধ্বনিরমণীরে জাগায় কৌতুকে!
শুকতারা প্রভাতের ললাটে ফুটিল,
পূরবের দিক্‌দেবী জাগিয়া উঠিল।
লোহিত কমলকরে পূরবের দ্বার
খুলিয়া, সিন্দুর দিল সীমন্তে উষার।
মাজি দিয়া উদয়ের কনকসোপান,
তপনের সারথিরে করিল আহ্বান।
সাগর-ঊর্মির শিরে সোনার চরণ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেচে গেল দিক্‌বালাগণ।
পূরবদিগন্ত-কোলে জলদ গুছায়ে
ধরণীর মুখ হতে আঁধার মুছায়ে,
বিমল শিশিরজলে ধুইয়া চরণ,
নিবিড় কুন্তলে মাখি কনককিরণ,
সোনার মেঘের মত আকাশের তলে,
কনককমলসম মানসের জলে
ভাসিতে লাগিল যত দিক্‌-বালাগণে—
উলসিত তনুখানি প্রভাতপবনে।
ওই হিমগিরি-'পরে কোন দিক্‌বালা
রঞ্জিছে কনককরে নীহারিকামালা!
নিভৃতে সরসীজলে করিতেছে স্নান,
ভাসিছে কমলবনে কমলবয়ান।
তীরে উঠি মালা গাঁথি শিশিরের জলে
পরিছে তুষারশুভ্র সুকুমার গলে।
ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা-প্রান্তরে,
মধ্যে দিক্‌দেবী শুভ্র বালুকার 'পরে।
অঙ্গ হতে ছুটিতেছে জলন্ত কিরণ,
চাহিতে মুখের পানে ঝলসে নয়ন।
আঁকিছে বালুকাপুঞ্জে শত শত রবি,
আঁকিছে দিগন্তপটে মরীচিকা-ছবি।

অন্য দিকে কাশ্মীরের উপত্যকা-তলে
পরি শত বরণের ফুলমালা গলে,
শত বিহঙ্গের গান শুনিতে শুনিতে,
সরসীলহরীমালা গুনিতে গুনিতে,
এলায়ে কোমল তনু কমলকাননে
আলসে দিকের বালা মগন স্বপনে।
ওই হোথা দিক্‌দেবী বসিয়া হরষে
ঘুরায় ঋতুর চক্র মৃদুল পরশে।
ফুরায়ে গিয়েছে এবে শীতসমীরণ,
বসন্ত পৃথিবীতলে অর্পিবে চরণ।
পাখীরে গাহিতে কহি অরণ্যের গান
মলয়ের সমীরণে করিয়া আহ্বান
বনদেবীদের কাছে কাননে কাননে
কহিল ফুটাতে ফুল দিক্‌দেবীগণে—
বহিল মলয়বায়ু কাননে ফিরিয়া,
পাখীরা গাহিল গান কানন ভরিয়া।
ফুলবালা-সাথে আসি বনদেবীগণ
ধীরে দিক্‌দেবীদের বন্দিল চরণ।

প্রতিশোধ

গাথা

গভীর রজনী নীরব ধরণী,
মুমূর্ষু পিতার কাছে
বিজন আলয়ে আঁধার হৃদয়ে
বালক দাঁড়ায়ে আছে।

বীরের হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো,
শোণিত বহিয়ে যায়,
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে
রোষের অনল ভায়!
পড়েছে দীপের অফুট আলোক
আঁধার মুখের 'পরে,
সে মুখের পানে চাহিয়া বালক
দাঁড়ায়ে ভাবনা-ভরে।
দেখিছে পিতার অসাড় অধরে
যেন অভিশাপশিখা,
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে
রোষের অনলশিখা—
ঘুম হতে যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর,
মুমূর্ষু কহিলা বালকে চাহিয়া,
সুধীর গভীর স্বর—
"শোনো বৎস, শোনো, অধিক কি কব,
আসিছে মরণবেলা—
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবে অবহেলা।"
এতেক বলিয়া টানি উপাড়িলা
ছুরিকা হৃদয় হতে,
ঝলকে ঝলকে উছসি অমনি
শোণিত বহিল স্রোতে।
কহিল, "এই নে, এই নে ছুরিকা—
তাহার উরস-'পরে
যত দিন ইহা ঠাঁই নাহি পায়
থাকে যেন তোর করে!
হা হা রুদ্রদেব, কি পাপ করেছি—
এ তাপ সহিতে হল,

ঘুমাতে ঘুমাতে বিছানায় পড়ি
জীবন ফুরায়ে এল।"
নয়নে জলিল দ্বিগুণ আগুন,
কথা হয়ে গেল রোধ,
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে—
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"
পিতার চরণ পরশ করিয়া
ছুঁইয়া কৃপাণখানি
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল শপথবাণী—
"ছুঁইনু কৃপাণ, শপথ করিনু
শুন ক্ষত্রকুলপ্রভু,
এর প্রতিশোধ তুলিব তুলিব,
অন্যথা নহিবে কভু!
সেই বুক ছাড়া এ ছুরিকা আর
কোথা না বিরাম পাবে,
তার রক্ত ছাড়া এই ছুরিকার
তৃষা কভু নাহি যাবে।"
রাখিলা শোণিত-মাখা সে ছুরিকা
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ,
মুদিয়া পড়িল আঁখি।

ভ্রমিছে কুমার কত দেশে দেশে,
ঘুচাতে শপথভার।
দেশে দেশে ভ্রমি তবুও ত আজি
পেলে না সন্ধান তার।
এখনো সে বুকে ছুরিকা লুকানো,
প্রতিজ্ঞা জলিছে প্রাণে—

এখনো পিতার শেষ কথাগুলি
বাজিছে যেন সে কানে।
"কোথা যাও যুবা! যেও না, যেও না—
গহন কানন ঘোর,
সাঁঝের আঁধার ঢাকিছে ধরণী,
এস গো কুটীরে মোর!"
"ক্ষম গো আমায়, কুটীরস্বামী!
বিরাম আলয় চাহি না আমি,
যে কাজের তরে ছেড়েছি আলয়
সে কাজ পালিব আগে।"
"শুন গো পথিক, যেও নাকো আর,
অতিথির তরে মুক্ত এ দুয়ার!
দেখেছ চাহিয়া ছেয়েছে জলদ
পশ্চিম গগনভাগে।"
কত না ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে
মাথার উপর দিয়া,
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও
যুবক নির্ভীকহিয়া।
চলেছে— গহন গিরি নদী মরু
কোন বাধা নাহি মানি।
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে শপথবাণী!
"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ,
শুন গো কুটীরস্বামী—
খুলে দাও দ্বার আজিকার মত
এসেছি অতিথি আমি।"
অতি ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার,
পথিক দেখিল চেয়ে—
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।

এলোথেলো চুলে বনফুলমালা,
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে মমতা, অধরে মাখানো
কোমল সরল হাস।
বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
কুশের আসন-'পরি—
সম্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কাননকুটীরে
পথিক করিছে বাস ?
কি কর, যুবক, ছাড় এ কুটীর—
সময় যেতেছে চলি,
যে কাজের তরে ছেড়েছ আলয়,
সে কাজ যেও না ভুলি !
দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস,
যুবার হৃদয়ে পড়িছে জড়ায়ে
ক্রমেই প্রণয়পাশ !
শোণিতে লিখিত শপথ-আখর
মন হতে গেল মুছি।
ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
কেন রে গেল না ঘুচি !

মালতীবালার সাথে কুমারের
আজিকে বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষরবে !

মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত
গাহিছে নাচিছে হরষে সকলে
যুবক রমণী শত।
কেহ বা গাঁথিছে ফুলের মালিকা,
গাহিছে বনের গান,
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
হরষে করিছে দান।
ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতী
এলায়ে চিকুরপাশ—
সুখের আভায় উজলে নয়ন,
অধরে সুখের হাস।
আইল কুমার বিবাহসভায়
মালতীরে লয়ে সাথে,
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।
ওকিও— ওকিও— সহসা প্রতাপ
বসনে নয়ন চাপি,
মুরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর থর কাঁপি।
মালতীবালিকা পড়িল সহসা
মুরছি কাতররবে!
বিবাহসভায় ছিল যারা যারা
ভয়ে পলাইল সবে।
সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত জ্বলে দুনয়ন,
শোণিতে মাখানো কায়া—
কি কথা বলিতে চাহিল কুমার,
ভয়ে হ'ল কথারোধ,

জলদগভীর স্বরে কে কহিল,
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!
হা রে কুলাঙ্গার, অক্ষত্রসন্তান,
এই কি রে তোর কাজ?
শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
বিবাহ করিলি আজ!
ক্ষত্রধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞাপালন,
ওরে কুলাঙ্গার, তবে
এ চরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিবি কবে!
নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এ মোর ক্রোধ।"
নীরব সে গৃহ ধ্বনিল আবার—
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"
বুকের বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি,
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি।
অধীর হৃদয় পাগলের মত,
থর থর কাঁপে পাণি—
কত বার ছুরি ধরিল সে বুকে
কত বার নিল টানি।
মাথার ভিতরে ঘুরিতে লাগিল,
আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!"
ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ,
মালতী উঠিল জাগি,
চারি দিক চেয়ে বুঝিতে নারিল
এসব কিসের লাগি।

কুমার তখন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে,
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে—
"একদা গভীর বরষানিশীথে
নাই জাগি জন প্রাণী,
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী।
চাহি চারি দিকে দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হতে—
শোণিত বহিছে, শয়ন তাঁহার
ভাসিছে শোণিতস্রোতে।
কহিলেন পিতা— 'অধিক কি কব
আসিছে মরণবেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবি অবহেলা।'
হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে,
সে অবধি এই বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে।
করিনু শপথ ছুঁইয়া কৃপাণ
'শুন ক্ষত্রকুলপ্রভু,
এর প্রতিশোধ তুলিব— তুলিব—
না হবে অন্যথা কভু।'
নাম কি তাহার জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম—"
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া,
"প্রতাপ তাহার নাম!
এখনি এখনি ওই ছুরি তব
বসাইয়া দেও বুকে,

যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে কেমনে
কব তাহা এক মুখে ?
নিভাও সে জ্বালা, নিভাও সে জ্বালা
দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোন জল !"
কাঁদিয়া উঠিল মালতী কহিল
পিতার চরণ ধ'রে,
"ও কথা ব'লো না— ব'লো না গো পিতা,
যেও না ছাড়িয়ে মোরে !
কুমার— কুমার— শুন মোর কথা
এক ভিক্ষা শুধু মাগি—
রাখ মোর কথা, ক্ষম গো পিতারে,
দুখিনী আমার লাগি !—
শোণিত নহিলে ও ছুরির তব
পিপাসা না মিটে যদি,
তবে এই বুকে দেহ গো বিঁধিয়া
এই পেতে দিনু হৃদি !"
আকাশের পানে চাহিয়া কুমার
কহিল কাতর স্বরে,
"ক্ষমা কর পিতা, পারিব না আমি,
কহিতেছি সকাতরে !
অতি নিদারুণ অনুতাপশিখা
দহিছে যে হৃদিতল,
সে হৃদয়মাঝে ছুরিকা বসায়ে
বল গো কি হবে ফল ?
অনুতাপী জনে ক্ষমা কর পিতা !
রাখ এই অনুরোধ !"
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার,
"প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ !"—

হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা ধরিল কুমার,
পাগলের মত যেন।
প্রতাপের সেই অবারিত বুকে
ছুরি বিঁধাইল বলে।
মালতী বালিকা মূর্ছিয়া পড়িল
কুমারের পদতলে।
উন্মত্ত হৃদয়ে, জ্বলন্ত নয়নে,
বদ্ধ করি হস্তমুঠি—
কুটীর হইতে পাগল কুমার
বাহিরেতে গেল ছুটি।
এখনো কুমার সেই বনমাঝে
পাগল হইয়া ভ্রমে—
মালতীবালার চিরমূর্চ্ছা আর
ঘুচিল না এ জনমে!

ছিন্ন লতিকা

সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখি, অতিশয় যতনে—
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল[১]
ফুটিয়াছে শত শত হাসি-হাসি-আননে।
প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল,
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা।
সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে[২]
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।

প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তায়,[৩]
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এত দিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলঢল মুখ,[৪]
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।[৫]
ছিন্ন-অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে—
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

ভারতীবন্দনা

আজিকে তোমার মানসসরসে
কি শোভা হয়েছে মা!
অরুণবরণ চরণপরশে
কমলকানন হরষে কেমন
ফুটিয়ে রয়েছে মা!
নীরবে চরণে উথলে সরসী,
নীরবে কমল করে টলমল,
নীরবে বহিছে বায়।
মিলি কত রাগ মিলিয়ে রাগিণী
আকাশ হইতে করে গীতধ্বনি,
শুনিয়ে সে গীত আকাশ-পাতাল
হয়েছে অবশপ্রায়।
শুনিয়ে সে গীত হয়েছে মোহিত
শিলাময় হিমগিরি—
পাখীরা গিয়েছে গাহিতে ভুলিয়া,

পাঠান্তর: ১ নানাবরণের ফুল ২ ছিল সে মনের সুখে
৩ রেখেছিল স্নিগ্ধ করি ৪ ছিল হাসি-হাসি মুখ
৫ শুকায়ে লুটায় ভূমে আহা সেই লতিকা.

সরসীর বুক উঠিছে ফুলিয়া,
ক্রমশঃ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে
তানলয় ধীরি ধীরি।
তুমি গো জননি, রয়েছ দাঁড়ায়ে
সে গীতধারার মাঝে,
বিমল জোছনা-ধারার মাঝারে
চাঁদটি যেমন সাজে।
দশ দিশে দিশে ফুটিয়া পড়েছে
বিমল দেহের জ্যোতি,
মালতীফুলের পরিমল-সম
শীতল মৃদুল অতি।
আলুলিত চুলে কুসুমের মালা,
সুকুমার করে মৃণালের বালা,
লীলাশতদল ধরি,
ফুলছাঁচে ঢালা কোমল শরীরে
ফুলের ভূষণ পরি।
দশ দিশি দিশি উঠে গীতধ্বনি,
দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি।
দশ দিশি ছুটে ফুলপরিমল
মধুর মৃদুল শীতল অতি।
নবদিবাকর ম্লানসুধাকর
চাহিয়া মুখের পানে,
জলদ-আসনে দেববালাগণ
মোহিত বীণার তানে।
আজিকে তোমার মানসসরসে
কি শোভা হয়েছে মা!
রূপের ছটায় আকাশ পাতাল
পূরিয়া রয়েছে মা!
যেদিকে তোমার পড়েছে জননি
সুহাস কমলনয়ন দুটি,

উঠেছে উজলি সেদিক অমনি,
সেদিকে পাপিয়া উঠিছে গাহিয়া,
সেদিকে কুসুম উঠিছে ফুটি !
এস মা আজিকে ভারতে তোমার,
পূজিব তোমার চরণ দুটি !
বহুদিন পরে ভারত-অধরে
সুখময় হাসি উঠুক ফুটি !
আজি কবিদের মানসে মানসে
পড়ুক তোমার হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক ফুটিয়া
ভকতিকমলরাশি !
নমিয়া ভারতীজননী-চরণে
সঁপিয়া ভকতিকুসুমমালা,
দশ দিশি দিশি প্রতিধ্বনি তুলি
হুলুধ্বনি দিক দিকের বালা !
চরণকমলে অমল কমল
আঁচল ভরিয়া ঢালিয়া দিক !
শত শত হৃদে তব বীণাধ্বনি
জাগায়ে তুলুক শত প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিয়ে কবির হৃদয়ে
ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম
গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক !

লীলা

গাথা

"সাধিনু— কাঁদিনু— কত না করিনু—
ধন মান যশ সকলি ধরিনু
চরণের তলে তার—

এত করি তবু পেলেম না মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার !
না যদি পেলেম নাইবা পাইনু—
চাই না— চাই না তারে !
কি ছার সে বালা ! তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষহৃদি,
তা হ'লে পাষাণো ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে !
এ কুমতি কেন হয়েছিল বিধি,
তারে সঁপিবারে গিয়েছিনু হৃদি !
এ নয়নজল ফেলিতে হইল
তাহার চরণতলে ?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু, মজিয়া
তাহার কুহকবলে ?
এত আঁখিজল হইল বিফল,
বালিকাহৃদয় করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা,
তার গলে দিবে পরিণয়মালা !
এ কি লাজ নিদারুণ !
হেন অপমান নারিব সহিতে,
ঈর্ষ্যার অনল নারিব বহিতে,
ঈর্ষ্যা ? কারে ঈর্ষ্যা ? হীন রণধীরে ?
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হ'ল কি রে ?
ঈর্ষ্যাযোগ্য সে কি মোর ?
তবে শুন আজি শ্মশানকালিকা !
শুন এ প্রতিজ্ঞা ঘোর !
আজ হ'তে মোর রণধীর অরি—
শতনুকপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান,

এ বিবাহ কভু দিব না ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ !
তবে নমি তোমা শ্মশানকালিকা !
শোণিতলুলিতা কপালমালিকা !
কর এই বর দান—
তাহারি শোণিতে মিটায় পিপাসা
যেন মোর এ কৃপাণ !"
কহিতে কহিতে বিজন নিশীথে
শুনিল বিজয় সুদূর হইতে
শত শত অট্টহাসি—
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশানশান্তিরে নাশি !
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া
কি জানি কিসের লাগি !
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে
চমকি উঠিল জাগি !
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া—
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া,
আবার যাইল মিশি !
সহসা থামিল অট্টহাসিধ্বনি,
শিবার রোদন থামিল অমনি,
আবার ভীষণ সুগভীরতর
নীরব হইল নিশি !
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর।
মুখ নিদারুণ আঁখি রোষারুণ—
হৃদয়ে জ্বলিছে রোষের আগুন,
করে অসি খরধার !

গিরি-অধিপতি রণধীরগৃহে
লীলা আসিতেছে আজি—
গিরিবাসীগণ হরষে মেতেছে,
বাজানা উঠেছে বাজি।
অস্তে গেল রবি পশ্চিমশিখরে,
আইল গোধূলিকাল—
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
সঘন আঁধারজাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতিভবনপানে—
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষগানে।
জ্বলিছে আলোক, বাজিছে বাজনা,
ধ্বনিতেছে দশ দিশি—
ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবিড়
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়—
বনমাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ,
বড় সে সুগম নয়।
অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষগীত—
সে হরষধ্বনি জনকোলাহল
ধ্বনিতেছে চারি ভিত।
থামিল শিবিকা, পথের মাঝারে
থামে অনুচরদল—
সহসা সভয়ে "দস্যু দস্যু" বলি
উঠিল রে কোলাহল।
শত বীরহৃদি উঠিল নাচিয়া,
বাহিরিল শত অসি—

শত শত শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি।
আঁধার ক্রমশঃ নিবিড় হইল,
বাধিল বিষম রণ—
লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
পলাইল দস্যুগণ।

কারাগারমাঝে বসিয়া রমণী
বরষিছে আঁখিজল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
সমরের কোলাহল।
"হে মা ভগবতী, শুন এ মিনতি—
বিপদে ডাকিব কারে!
পতি ব'লে যাঁরে করেছি বরণ
বাঁচাও বাঁচাও তাঁরে!
মোর তরে কেন এ শোণিতপাত!
আমি, মা, অবোধ বালা,
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন—
ঘুচিত সকল জ্বালা!"
কহিতে কহিতে উঠিল আকাশে
দ্বিগুণ সমরধ্বনি—
জয়জয়রব, আহতের স্বর,
কৃপাণের ঝনঝনি!
সাঁজের জলদে ডুবে গেল রবি,
আকাশে উঠিল তারা—
একেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
কাঁদিয়া হতেছে সারা!

সহসা খুলিল কারাগারদ্বার,
বালিকা সভয় অতি—
কঠোর কটাক্ষ হানিতে হানিতে
বিজয় পশিল তথি।
অসি হতে ঝরে শোণিতের ফোঁটা,
শোণিতে মাখানো বাস,
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
ফুটে নিদারুণ হাস!
অবাক্ বালিকা— বিজয় তখন
কহিল গভীর রবে,
"সমরবারতা শুনেছ কুমারী ?
সে কথা শুনিবে তবে ?"
"বুঝেছি— বুঝেছি, জেনেছি— জেনেছি!
বলিতে হবে না আর—
না— না, বল বল— শুনিব সকলি
যাহা আছে শুনিবার।
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়,
বল কি বলিতে আছে!
যত ভয়ানক হোক না সে কথা
লুকায়ো না মোর কাছে!"
"শুন তবে বলি" কহিল বিজয়
তুলি অসি খরধার,
"এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
হরেছি ধরার ভার!"
"পামর, নিদয়, পাষাণ, পিশাচ!"—
মূরছি পড়িল লীলা!
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়
কারা হ'তে বাহিরিলা।

সময়ের ধ্বনি থামিল ক্রমশঃ,
নিশা হ'ল সুগভীর।
বিজয়ের সেনা পলাইল রণে—
জয়ী হ'ল রণধীর।
কারাগারমাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে,
"লীলা!— রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের পরে!"
ভূমিতল হ'তে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি,
হরষ-আলোকে জলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি।
"এস, নাথ, এস অভাগীর পাশে
বস একবার হেথা!
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক', নাথ, সেই আদরের নামে
ডাক' মোরে স্নেহভরে—
এ অবশ মাথা তুলে লও, সখা,
তোমার বুকের পরে!"
লীলার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো,
বহিছে শোণিতধারা—
রহে রণধীর পলকবিহীন
যেন পাগলের পারা।
রণধীর বুকে মুখ লুকাইয়া
গলে বাঁধি বাহুপাশ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা,
"পূরিল না কোন আশ!
মরিবার সাধ ছিল না আমার,
কত ছিল সুখ-আশা!

পারিনু না, সখা, করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা!
হা রে হা পামর, কি করিলি তুই?
নিদারুণ প্রতারণা!
এত দিনকার সুখসাধ মোর
পূরিল না, পূরিল না!"
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি
রণধীর-মুখে রহিল চাহিয়া
মেলি অনিমেষ আঁখি!
রণধীর যবে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা,
বীরের নয়নে জ্বলিয়া উঠিল
রোষের অনলকণা।
"পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার,
বাঁচিবার সাধ নাই।
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে,
বাঁচিয়া রহিব তাই।"
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি,
শোকে রোষানলে জ্বলি রণধীর
রণভূমে এল ছুটি।
দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমরভূমে।
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণঘুমে!

ফুলের ধ্যান

মুদিয়া আঁখির পাতা
কিশলয়ে ঢাকি মাথা
উষার ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি,
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী!
দেখিতেছি শুধু উষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ
জাগিছে হৃদয়-'পরি!
তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।

আকাশে যখন শতেক তারা
রবির কিরণে হইবে হারা,
ধরায় ঝরিয়া শিশিরধারা
ফুটিবে তারার মত,
ফুটিবে কুসুম শত,
ফুটিবে দিবার আঁখি,
ফুটিবে পাখীর গান,
তখন আমারে চুমিবে তপন,
তখন আমার ভাঙ্গিবে স্বপন,
তখন ভাঙ্গিবে ধ্যান।

তখন সুধীরে খুলিব নয়ান,
তখন সুধীরে তুলিব বয়ান,
পূরব আকাশে চাহিয়া চাহিয়া
কথা কব ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

উষারূপসীর কপোলের চেয়ে
কপোল হইবে রাঙা।
তখন আসিবে বায়,
ফিরিতে হবে না তায়,
হৃদয় ঢালিয়া দিব বিলাইয়া
যত পরিমল চায়।
ভ্রমর আসিবে দ্বারে,
কাঁদিতে হবে না তারে,
পাশে বসাইয়া আশা পূরাইয়া
মধু দিব ভারে ভারে।
আজিকে ধেয়ানে রয়েছি মগন
রবির প্রতিমা স্মরি—
এমনি করিয়া ধেয়ান ধরিয়া
কাটাইব বিভাবরী।

অপ্সরাপ্রেম

গাথা

নায়িকার উক্তি

রজনীর পরে আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ ছিল হ'ল পূরনিমা,
প্রতি নিশি নিশি বাড়িল চাঁদিমা,
প্রতি নিশি নিশি ক্ষীণ হয়ে এল
ফুরালো জোছনাভাতি।
উদিছে তপন উদয়শিখরে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সারা দিন ধ'রে
ধীর পদক্ষেপে অবসন্ন দেহে

যেতেছে চলিয়া বিশ্রামের গেহে
মলিন বিষণ্ণ অতি।
উদিছে তারকা আকাশের তলে,
আসিছে নিশীথ প্রতি পলে পলে,
পল পল করি যায় বিভাবরী,
নিভিছে তারকা এক এক করি,
হাসিতেছে উষা সতী।
এস গো, সখা, এস গো—
কত দিন ধ'রে বাতায়নপাশে
একেলা বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
এস গো, সখা, এস গো!—
সুমুখে তটিনী যেতেছে বহিয়া,
নিশ্বসিছে বায়ু রহিয়া রহিয়া,
লহরীর পর উঠিছে লহরী,
গণিতেছি বসি এক এক করি—
নাই রাতি নাই দিন।
ওই তৃণগুলি হরিত প্রান্তরে
নোয়াইছে মাথা মৃদুবায়ুভরে,
সারা দিন যায়— সারা রাত যায়—
শূন্য আঁখি মেলি চেয়ে আছি হায়—
নয়ন পলকহীন।
বরষে বাদল, গরজে অশনি,
পলকে পলকে চমকে দামিনী,
পাগলের মত হেথায় হোথায়
আঁধার আকাশে বহিতেছে বায়
অবিশ্রাম সারারাতি।
বহিতেছে বায়ু পাদপের 'পরে,
বহিছে আঁধার-প্রাসাদ-শিখরে,

ভগ্ন দেবালয়ে বহে হুহু করি,
জাগিয়া উঠিছে তটিনীলহরী
তটিনী উঠিছে মাতি।
কোথায় গো, সখা, কোথা গো!
একাকী হেথায় বাতায়নপাশে
রয়েছি বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
কোথায় গো, সখা কোথা গো!
যাহারা যাহারা গিয়েছিল রণে,
সবাই ফিরিয়া এসেছে ভবনে,
প্রিয়-আলিঙ্গনে প্রণয়িনীগণ
কাঁদিয়া হাসিয়া মুছিছে নয়ন
কোন জ্বালা নাহি জানে।
আমিই কেবল একা আছি প'ড়ে
পরিশ্রান্ত অতি— আশা ক'রে ক'রে—
নিরাশ পরাণ আর ত রহে না,
আর ত পারি না, আর ত সহে না,
আর ত সহে না প্রাণে।
এস গো, সখা, এস গো!
একাকী হেথায় বাতায়নপাশে
একেলা বসিয়া, সখা, তব আশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই,
এস গো, সখা, এস গো!—
আসে সন্ধ্যা হয়ে আঁধার আলয়ে—
একেলা রয়েছি বসি,
যে যাহার ঘরে আসিতেছে ফিরে,
জ্বলিছে প্রদীপ কুটীরে কুটীরে,
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়নদ্বারে

আঁধার প্রান্তরে চেয়ে আছি হা রে—
আকাশে উঠিছে শশী।
কত দিন আর রহিব এমন,
মরণ হইলে বাঁচি রে এখন!
অবশ হৃদয়, দেহ দুরবল,
শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল,
যেতেছে দিবস নিশি!
কোথায় গো সখা, কোথা গো!
কত দিন ধ'রে, সখা, তব আশে
একেলা বসিয়া বাতায়নপাশে—
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথপানে চেয়ে রয়েছি সদাই—
কোথায় গো সখা, কোথা গো!

অপ্সরার উক্তি

অদিতিভবন হইতে যখন
আসিতেছিলাম অলকাপুরে—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন,
শারদ তটিনী বহিছে দূরে!
সাঁঝের কনকবরণ সাগর
অলস ভাবে সে ঘুমায়ে আছে,
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ
গউরীশিখর গিরির কাছে।
দেখিনু সহসা বীর একজন
সমরসাগরে গিরির মতন—
পদতলে আসি আঘাতে লহরী,
তবুও অটল-পারা।

বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই,
শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই—
উরস-বরমে বরষার মত
বরিষে বাণের ধারা।
অশনিধ্বনিত ঝটিকার মেঘে
দেখেছি ত্রিদশপতি—
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙিছে,
তিনি সে মহান্ অতি!
এমন উদার শান্ত ভাব বুঝি
দেখি নি তাঁহারো কভু।
পৃথ্বী নত হয় যাঁহার অসিতে,
স্বরগ যে জন পারেন শাসিতে,
দুরবল এই নারীহৃদয়ের
তাঁহারে করিনু প্রভু।
দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখাছায়া
মাথার উপরে তাঁর,
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি
নাশিতে বাণের ধার।
প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে,
দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিল
আকুল হৃদয় মোর।
থামিল সমর, জয়ী বীর মোর
উঠিলা তরণী-'পরে,
বহিল মৃদুল পবন, তরণী
চলিল গরবভরে।
গেল কত দিন— পূরব গগনে
উঠিল জলদরেখা,
মুহু ঝলকিয়া ক্ষীণ সৌদামিনী
দূর হ'তে দিল দেখা।

ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ,
অশনি সরোষে জ্বলি
মাথার উপর দিয়া তরণীর
অভিশাপ গেল বলি।
সহসা ভ্রূকুটি' উঠিল সাগর,
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল
সহসা কিসের লাগি।
দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর
অধীর হইল হেন—
ভাঙ্গে-বিভোলা মহেশের মত
নাচিতে লাগিল যেন।
তরণীর 'পরে একেলা অটল
দাঁড়ায়ে বীর আমার,
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত
বাজিছে হৃদয় তাঁর।
দেখিতে দেখিতে ডুবিল তরণী,
ডুবিল নাবিক যত—
যুঝি যুঝি বীর সাগরের সাথে
হইল চেতনহত।
আকাশ হইতে নামিয়া ছুঁইনু
অধীর জলধিজল,
পদতলে আসি করিতে লাগিল
উরমিরা কোলাহল।
অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
কেশপাশ চারি ধার—
সাগরের কানে ঢালিতে লাগিনু
সুধীরে গীতের ধার।

গীত

কেন গো সাগর এমন চপল
এমন অধীরপ্রাণ,
শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান !
পূরণিমানিশি আসিবে যখন
আসিবে যখন ফিরে—
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
খুলিয়ে দিব গো ধীরে !
যত হাসি তার পড়িবে তোমার
বিশাল হৃদয়-'পরে,
কত আনন্দে উরমি জাগিবে তখন
নাচিবে পুলকভরে !
তবে থাম গো সাগর, থাম গো,
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ ?
আমি লহরীশিশুরে করিব তোমার
তারার খেলেনা দান।
দিক্‌বালাদের বলিয়া দিব,
আঁকিবে তাহারা বসি
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়
একটি একটি শশী।
তটিনীরে আমি দিব গো শিখায়ে
না হবে তাহার আন,
তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে আনিবে কুসুম
করিবে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেমধারা
করাবে তোমারে পান !
তবে থাম গো সাগর, থাম গো,
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ ?

যদি উরমিশিশুরা নীরব নিশীথে
ঘুমাতে নাহিক চায়,
তবে জানিও সাগর ব'লে দিব আমি
আসিবে মৃদুল বায়—
কানন হইতে করিয়া তাহারা
ফুলের সুরভি পান
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে
ঘুম পাড়াবার গান !
অমনি তাহারা ঘুমায়ে পড়িবে
তোমার বিশাল বুকে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে দেখিবে তখন
চাঁদের স্বপন সুখে !
যদি কভু হয় খেলাবার সাধ
আমারে কহিও তবে—
শতেক পবন আসিবে অমনি
হরষ-আকুল রবে—
সাগর-অচলে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
হাসিয়া সফেন হাসি
মাথার উপরে ঢালিও তাহার
প্রবালমুকুতারাশি !
তবে রাখ গো আমার কথা,
তবে শুন গো আমার গান,
তবে থাম গো সাগর, থাম গো,
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ ?
দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগরবালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতামালা,
গাহিতেছিল গো গান,
আঁধার-অলক কপোলের শোভা
করিতেছিল গো পান !
কেহবা হরষে নাচিতেছিল

হরষে পাগল-পারা,
কেশপাশ হ'তে ঝরিতেছিল
নিটোল মুকুতাধারা !
কেহ মণিময় গুহায় বসিয়া
মৃদু অভিমানভরে
সাধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।
এমন সময়ে শতেক উরমি
সহসা মাতিয়ে উঠেছে সুখে,
সহসা এমন লেগেছে আঘাত
আহা সে বালার কোমল বুকে !
ওই দেখ দেখ— আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতারাশি !
ওই দেখ দেখ - হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি !
ওই দেখ দেখ— নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিনমুখে,
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ীবুকে !
থাম গো সাগর, থাম গো— থাম গো
হোয়ো না অমন পাগল-পারা—
আহা, দেখ দেখি সাগরললনা
ভয়ে একেবারে হয়েছে সারা !
বিবরণ হয়ে গিয়েছে কপোল,
মলিন হইয়ে গিয়েছে মুখ,
সভয়ে মুদিয়া আসিছে নয়ন
থরথর করি কাঁপিছে বুক !
আহা, থাম তুমি থাম গো—
হোয়ো না অধীরপ্রাণ,
রাখ গো আমার কথা,

ওগো শোন গো আমার গান!
যদি না রাখ আমার কথা,
যদি না থাকে প্রমোদ তব,
তবে জানিও সাগর জানিও
আমি সাগরবালারে কব।
তারা জোছনা-নিশীথে ত্যজিয়া আলয়
সাজিয়া মুকুতাবেশে
হাসি হাসি আর গাহিবে না গান
তোমার উপরে এসে।
যে রূপ হেরিয়া লহরীরা তব
হইত পাগল-মত,
যে গানে মজিয়া কানন ত্যজিয়া
আসিত বায়ুরা যত।
আধখানি তনু সলিলে লুকান',
সুনিবিড় কেশরাশি
লহরীর সাথে নাচিয়া নাচিয়া
সলিলে পড়িত আসি,
অধীর উরমি মুখ চুমিবারে
যতন করিত কত,
নিরাশ হইয়া পড়িত ঢলিয়া
মরমে মিশায়ে যেত।
সে বালারা আর আসিবে না,
সে মধুর হাসি হাসিবে না,
জোছনায় মিশি সে রূপের ছায়া
সলিলে তোমার ভাসিবে না,
তবে থাম গো সাগর, থাম গো—
কেন হয়েছ অধীরপ্রাণ,
তুমি রাখ এ আমার কথা,
তুমি শোন এ আমার গান।

দেখিতে দেখিতে শতেক উরমি
সাগর-উরসে ঘুমায়ে এল,
দেখিতে দেখিতে মেঘেরা মিলিয়া
সুদূর শিখরে খেলাতে গেল।
যে মহাপবন সাগরহৃদয়ে
প্রলয়খেলায় আছিল রত,
অতি ধীরে ধীরে কপোল আমার
চুমিতে লাগিল প্রণয়ী-মত।
গীতরব মোর দ্বীপের কাননে
বহিয়া লইয়া গেল সে ধীরে—
"কে গায়" বলিয়া কাননবালারা
থামিতে কহিল পাপিয়াটিরে।
বীরেরে তখন লইয়া এলাম
অমরদ্বীপের কাননতীরে,
কুসুমশয়নে অচেতন দেহ
যতন করিয়া রাখিনু ধীরে।
চেতন পাইয়া উঠিল জাগিয়া,
অবাক্ রহিল চাহি,
পৃথিবীর স্মৃতি ঢাকিয়া ফেলিনু
মায়াময় গীত গাহি।
নূতন জীবন পাইয়া তখন
উঠিল সে বীর ধীরে,
সহসা আমারে দেখিতে পাইল
দাঁড়ায়ে সাগরতীরে।
নিমেষ হারায়ে চাহিয়া রহিল
অবাক্ নয়ন তার,
দেখিয়া দেখিয়া কিছুতেই যেন
দেখা ফুরায় না আর!
যেন আঁখি তার করিয়াছে পণ
এইরূপ এক ভাবে

নিমেষ না ফেলি চাহিয়া চাহিয়া
পাষাণ হইয়া যাবে।
রূপে রূপে যেন ডুবিয়া গিয়াছে
তাহার হৃদয়তল,
অবশ আঁখির পলক ফেলিতে
যেন রে নাইক বল!
কাছে গিয়া তার পরশিনু বাহু,
চমকি উঠিল হেন—
তিখিনী তিখিনী অশনি-সমান
বিঁধেছে যে দেহে শত শত বাণ,
নারীর কোমল পরশটুকুও
তার সহিল না যেন!
কাছে গেলে যেন পারে না সহিতে,
অভিভূত যেন পড়ে সে মহীতে,
রূপের কিরণে মন যেন তার
মুদিয়া ফেলে গো আঁখি,
সাধ যেন তার দেখিতে কেবল
অতিশয় দূরে থাকি!

নায়কের উক্তি

কি হ'ল গো, কি হ'ল আমার!
বনে বনে সিন্ধুতীরে, বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
কি যেন হারান' ধন খুঁজি অনিবার।
সহসা ভুলিয়ে যেন গিয়েছি কি কথা!
এই মনে আসে-আসে, আর যেন আসে না সে,
অধীর হৃদয়ে শেষে ভ্রমি হেথা হোথা!
এ কি হ'ল এ কি হ'ল ব্যথা!
সম্মুখে অপার সিন্ধু দিবস যামিনী
অবিশ্রাম কলতানে কি কথা বলে কে জানে,

লুকান' আঁধার প্রাণে কি এক কাহিনী।
সাধ যায় ডুব দিই, ভেদি গভীরতা
তল হ'তে তুলে আনি সে রহস্য কথা।
বায়ু এসে কি যে বলে পারি নে বুঝিতে,
প্রাণ শুধু রহে গো যুঝিতে!
পাপিয়া একাকী কুঞ্জে কাঁপায় আকাশ,
শুনে কেন উঠে রে নিশ্বাস!
ওগো, দেবি, ওগো বনদেবি,
বল মোরে কি হয়েছে মোর!
কি ধন হারায়ে গেছে, কি সে কথা ভুলে গেছি,
হৃদয় ফেলেছে ছেয়ে কি সে ঘুমঘোর।
এ যে সব লতাপাতা হেরি চারি পাশে
এরা সব জানে যেন তবুও বলে না কেন!
আধখানি বলে, আর ছলে ছলে হাসে!
নিশীথে ঘুমাই যবে কি যেন স্বপন হেরি,
প্রভাতে আসে না তাহা মনে,
কে পারে গো ছিঁড়ে দিতে এ প্রাণের আবরণ—
কি কথা সে রেখেছে গোপনে।
কি কথা সে!
এ হৃদয় অগ্নিগিরি দহিতেছে ধীরি ধীরি
কোন্ খানে কিসের হুতাশে!

অপ্সরার উক্তি

হ'ল না গো হ'ল না!
প্রেমসাধ বুঝি পূরিল না।
বল সখা, বল, কি-করিব বল,
কি দিলে জুড়াবে হিয়া!
বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়াছি ফুল,
তুলেছি গোলাপ, তুলেছি বকুল,

নিজ হাতে আমি রচেছি শয়ন
কমলকুসুম দিয়া।
কাঁটাগুলি সব ফেলেছি বাছিয়া,
রেণুগুলি ধীরে দিয়েছি মুছিয়া,
ফুলের উপরে গুছায়েছি ফুল
মনের মতন করি—
শীতল শিশির দিয়েছি ছিটায়ে
অনেক যতন করি।

হ'ল না গো হ'ল না,
প্রেমসাধ বুঝি পূরিল না!
শুন ওগো সখা, বনবালারে
দিয়েছি যে আমি বলি,
প্রতি শাখে শাখে গাইবে পাখী
প্রতি ফুলে ফুলে অলি।
দেখ চেয়ে দেখ বহিছে তটিনী,
বিমল তটিনী গো।
এত কথা তার রয়েছে প্রাণে,
বলিবারে চায় তটের কানে,
তবুও গভীর প্রাণের কথা
ভাষায় ফুটে নি গো!
দেখ হোথা ওই সাগর আসি
চুমিছে রজত বালুকারাশি,
দেখ হেথা চেয়ে চপল চরণে
চলেছে নিঝরধারা।
তীরে তীরে তার রাশি রাশি ফুল
হাসি হাসি তারা হতেছে আকুল,
লহরে লহরে ঢলিয়া ঢলিয়া
খেলায়ে খেলায়ে হতেছে সারা।

হ'ল না গো হ'ল না,
প্রেম সাধ বুঝি পূরিল না।
তবে শুনিবে কি সখা গান ?
তবে খুলিয়া দিব কি প্রাণ ?
তবে চাঁদের হাসিতে নীরব নিশীথে
মিশাব ললিততান ?
আমি গাব হৃদয়ের গান।
আমি গাব প্রণয়ের গান।
কভু হাসি কভু সজল নয়ন,
কভু বা বিরহ কভু বা মিলন,
কভু সোহাগেতে ঢলঢল তনু
কভু মধু অভিমান।
কভু বা হৃদয় যেতেছে ফেটে,
সরমে তবুও কথা না ফুটে,
কভু বা পাষাণে বাঁধিয়া মরম
ফাটিয়া যেতেছে প্রাণ!

হ'ল না গো হ'ল না,
মনোসাধ আর পূরিল না।
এস তবে এস মায়ার বাঁধন
খুলে দিই ধীরে ধীরে—
যেথা সাধ যাও, আমি একাকিনী
ব'সে থাকি সিন্ধুতীরে।

গান

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,

সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্ !
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায় !
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায় !
সাধের স্বপন যায় রে যায় !
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে—
রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে—
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ !
কি জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তার
তবে থাক্ তবে থাক্ !

প্রভাতী

শুন 	নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম 	এখনো ভাঙিল না কি !
দেখ, 	তোমারি দুয়ার-'পরে

সখি এসেছে তোমারি রবি।
শুনি, প্রভাতের গাথা মোর
দেখ ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি।
তবে তুমি গো সজনি জাগিবে না কি,
আমি যে তোমারি কবি।
শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
তবে নব জীবনের গান।
প্রভাতজলদ, প্রভাতসমীর,
প্রভাতবিহগ, প্রভাতশিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলি
মিশাবে মধুর তান!
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি—
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি!
শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী-আরসীর 'পরে
অপরূপ রূপরাশি।
তবে থেকে থেকে ধীরে হুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।

কামিনী ফুল

ছি ছি সখা কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে
কামিনীকুসুম ছিল বন আলো করিয়া—
মানুষপরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান ত কামিনী সতী কোমল কুসুম অতি
দূর হ'তে দেখিবারে, ছুঁইবারে নহে সে—
দূর হ'তে মৃদু বায় গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে!
পরশিতে রবিকর শুকায়েছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না-ছুঁলে নয়!
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া!
মানুষপরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

লাজময়ী

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে, ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠে না।

অভিমানে যাই দূরে, কথা তার নাহি. ফুরে,
চরণ বারণ-তরে উঠে উঠে, উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি
চেয়ে থাকে, লাজবাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি দেখে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি তখন কিসের লাগি
মরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ি তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবরিষার স্রোতে লাজ তবু ছুটে না!

প্রেমমরীচিকা

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

ও কথা বোল' না তারে— কভু সে কপট না রে,
আমার কপালদোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ!
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালবাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবনকল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়?— সে যদি কপট হয়
তবে সত্য ব'লে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময়?— কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।

ও কথা বোল' না তারে, কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন—.
প্রেমমরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন।

গোলাপবালা

গোলাপের প্রতি বুল্‌বুল্‌

রাগিণী বেহাগ

বলি, ও আমার গোলাপবালা,
বলি, ও আমার গোলাপবালা,
তোল মুখানি, তোল মুখানি,
কুসুমকুঞ্জ কর আলা।
বলি, কিসের সরম এত ?
সখি, কিসের সরম এত ?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত ?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চাঁদিমা তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল এমন সময় কোথা ?
প্রিয়ে, তোল মুখানি, আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !
আমি এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কানে,

প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
আর কেহ শুনিবে না, কেহ জাগিবে না,
প্রেমকথা শুনি প্রতিধ্বনিবালা
উপহাস সখি করিবে না,
পরিহাস সখি করিবে না।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
সখি, একটি চুম্বন দাও!
গোপনে একটি চুম্বন দাও!
সখি, তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি আমি,
আমি সারারাত ধ'রে, প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারাদিন ধ'রে গাহিব সজনি
তোমারি প্রণয়গান!
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,
দূরে মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে মজিয়া সে প্রেমগানে,
সবে চাহিবে আকাশপানে,
তারা ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণগান।
তবে মুখানি তুলিয়া চাও!
সুধীরে মুখানি তুলিয়া চাও!
নীরবে একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন দাও!

হরহৃদে কালিকা

কে তুই লো হরহৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারীর সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে ?
নাই হোথা সুখ-আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের— পৃথিবীর ভাবনা !
আছে শুধু ওই রূপে বুকখানি ভরিয়ে—
আছে শুধু ওই রূপে মনে মন মরিয়ে।
বুকের জলন্ত শিরে রক্তরাশি নাচায়ে,
পাষাণ পরাণখানি এখনও বাঁচায়ে,
নাচিছে হৃদয়মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ী কামিনী,
শোণিততরঙ্গে ছুটে প্রস্ফুরিত দামিনী।
ঘুমায়েছে মনখানা, ঘুমায়েছে প্রাণ গো,
এক স্বপ্নে ভরা শুধু হৃদয়ের স্থান গো !
জগতে থাকিয়া আমি থাকি তার বাহিরে,
জগৎ বিদ্রূপছলে পাগল ভিখারী বলে—
তাই আমি চাই হতে, আর কিবা চাহি রে !
ভিখারী করিব ভিক্ষা বাঘাম্বর পরিয়ে,
বিমোহন রূপখানি হৃদিমাঝে ধরিয়ে।

একদা প্রলয়শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে !
অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিশাবে তারা,
অমনি এ জগতের রাশরজ্জু টুটিবে।
আলোকসর্ব্বস্ব হারা অন্ধ যত গ্রহ তারা।
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহাশূন্যে ছুটিবে !
ঘুম হ'তে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয় জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
প্রলয়ের তালে তালে ওই বামা নাচিবে,
প্রলয়ের তালে তালে এই হৃদি বাজিবে !

আঁধারকুন্তল তোর মহাশূন্য জুড়িয়া
প্রলয়ের কালঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া!
অন্ধকারে দিশাহারা কম্পমান গ্রহ তারা
চরণের তলে আসি পড়িবেক গুঁড়ায়ে,
দিবি সেই বিশ্বচূর্ণ নিঃশ্বাসেতে উড়ায়ে!
এমনি রহিব স্তব্ধ ওই মুখে চাহিয়া—
দেখিব হৃদয়মাঝে কেমনে ও বামা নাচে
উন্মাদিনী, প্রলয়ের ঘোর গীতি গাহিয়া!
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে—
ঘোর স্তব্ধ, মহাস্তব্ধ, মহাশূন্য রহিবে
আঁধারের সিন্ধুরবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান্ জলধির নাই ঊর্মি, নাই তীর—
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপি রব আমি ভাসিয়া!
তখনো র'বি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে?

ভগ্নতরী

গাথা

প্রথম সর্গ

ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার,
দিবা হল অবসান—
ঘুমায় সাঁঝের সাগর, করিয়া
কনককিরণ পান।
অলস লহরী তটের চরণে
ঘুমে পড়িতেছে ঢুলি,

এ উহার গায়ে পড়েছে এলায়ে
ভাঙ্গাচোরা মেঘগুলি।
কনকসলিলে লহরী তুলিয়া
তরণী ভাসিয়া যায়—
উড়িয়াছে পাল, নাচিছে নিশান,
বহে অনুকূল বায়।
শত কণ্ঠ হতে সাঁঝের আকাশে
উঠিছে সুখের গীত,
তালে তালে তার পড়িতেছে দাঁড়,
ধ্বনিতেছে চারি ভিত।
বাজিতেছে বীণা, বাজিতেছে বাঁশি,
বাজিতেছে ভেরী কত—
কেহ দেয় তালি, কেহ ধরে তান,
কেহ নাচে জ্ঞানহত।
তারকা উঠিছে ফুটিয়া ফুটিয়া,
আকাশে উঠিছে শশী,
উছলি উছলি উঠিছে সাগর
জোছনা পড়িছে খসি।
অতি নিরিবিলি নিরালায় দেখ
না মিশিয়া কোলাহলে
ললিতা হোথায় পতি সাথে তার
বসি আছে গলে গলে।
অজিতের গলে বাঁধি বাহুপাশ
বুকেতে মাথাটি রাখি
ঢলঢল তনু, গল'গল' করা
ঢুলুঢুলু দুটি আঁখি।
আধো-আধো হাসি অধরে জড়িত,
সুখের নাহি যে ওর,
প্রণয়বিভল প্রাণের মাঝারে
লেগেছে ঘুমের ঘোর।

পরশিছে দেহ নিশীথের বায়ু
অতি ধীর মৃদুশ্বাসে,
লহরীরা আসি করে কলরব
তরণীর আশে-পাশে।
মধুর মধুর সকলি মধুর,
মধুর আকাশ ধরা,
মধুরজনীর মধুর অধর
মধু জোছনায় ভরা।
যেতেছে দিবস, চলেছে তরণী
অনুকূল বায়ুভরে।
ছোট ছোট ঢেউ মাথাগুলি তুলি
টলমল করি পড়ে।
প্রণয়ীর কাল যেতেছে, তুলিয়া
শত বরণের পাখা,
মৃদুবায়ুভরে লঘু মেঘ যেন
সাঁঝের-কিরণ-মাখা।
আদরে ভাসিয়া গাহিছে অজিত
চাহি ললিতার পানে
মরম-গলানো সোহাগের গীত
আবেশ-অবশ প্রাণে।—

গান

পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল্।
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল!
আদরের ধন তুমি আদরে রাখিব আমি,
আদরিণি, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি-
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব আঁখিজলে আঁখিজল।

হরষে কভু বা গাইছে ললিতা
অজিতের হাত ধরি,
মুখপানে তার চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমে আঁখি দুটি ভরি।—

গান

ওই কথা বল সখা, বল আর বার,
ভালবাসো মোরে তাহা বল বার-বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভালবাসো মোরে তাহা বল গো আবার!

...

সান্ধ্য দিক্‌বধূ স্তব্ধ ভয়ভারে,
একটি নিশ্বাস পড়ে না তার;
ঈশান-গগনে করিছে মন্ত্রণা
মিলিয়া অযুত জলদভার।
তড়িতছুরিতে বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ফেলিছে আঁধারে শতধা করি,
দূর ঝটিকার রথচক্ররব
ঘোষিছে অশনি ত্রিলোক ভরি।
সহসা উঠিল ঘোর গরজন,
প্রলয়ঝটিকা আসিছে ছুটে।
ছিন্ন মেঘজাল দিশ্বিদিকে ধায়,
ফেনিল তরঙ্গ আকুলি উঠে।
পাগলের মত তরীযাত্রী যত
হেথা হোথা ছুটে তরণী-'পরে—
ছিঁড়িতেছে কেশ, হানিতেছে বুক,
করে হাহাকার কাতর স্বরে!
ছিন্নতার বীণা যায় গড়াগড়ি,
অধীরে ভাঙিয়া ফেলেছে বাঁশি—

ঝটিকায় স্বর দিতেছে ডুবায়ে
শতেক কণ্ঠের বিলাপরাশি।
তরণীর পাশে নীরব অজিত,
ললিতা অবাক্-হিয়া
মাথাটি রাখিয়া অজিতের কাঁধে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া।
কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজনে মিলি ?
মুকুতাশয়নে সাগরের তলে
ঘুমাইবে নিরিবিলি।
দুইটি প্রণয়ী বাঁধা গলে গলে
কাছাকাছি পাশাপাশি,
পশিবে না সেথা দ্বেষ কোলাহল
কুটিল কঠোর হাসি।
ঝটিকার মুখে হীনবল তরী
করিতেছে টলমল্—
উঠিছে, নামিছে, আছাড়ি পড়িছে,
ভিতরে পশিছে জল।
বাঁধিল ললিতা অজিতের বাহু
দৃঢ়তর বাহুডোরে,
আদরে অজিত ললিতা-অধর
চুমিল হৃদয় ভ'রে।
ললিতা-কপোলে বাহিয়া পড়িল
নয়নের জল দুটি—
নবীন সুখের স্বপন, হায় রে,
মাঝখানে গেল টুটি।
"আয় সখি আয়" কহিল অজিত—
হাত ধরাধরি করি
দুজনে মিলিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল
আকুল সাগর-'পরি।

দ্বিতীয় সর্গ

নবরবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া
নিশার আঁধাররাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।
ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী
মেঘকোলে ঘুমাইয়া পড়েছে দামিনী।
থেকে থেকে স্বপনেতে চমকিয়া চায়,
ক্ষীণ হাসিখানি হেসে আবার ঘুমায়।
শান্ত লহরীরা এবে শ্রান্ত পদক্ষেপে
তীর-উপলের 'পরে পড়ে কেঁপে কেঁপে।
দ্বীপের শৈলের শির প্লাবিত করিয়া
অজস্র কনকধারা পড়িছে ঝরিয়া।
মেঘ, দ্বীপ, জল, শৈল, সব সুরঞ্জিত—
সমস্ত প্রকৃতি গায় স্বর্ণ-ঢালা গীত।
বহু দিন হতে এক ভগ্নতরী জন
করিছে বিজন দ্বীপে জীবনযাপন।
বিজনতাভারে তার অবসন্ন বুক,
কত দিন দেখে নাই মানুষের মুখ।
এত দিন মৌন আছে না পেয়ে দোসর,
শুনিলে চমকি উঠে আপনার স্বর।
সুরেশ প্রভাতে আজি ছাড়িয়া কুটীর
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল সাগরের তীর।
বিমল প্রভাতে আজি শান্ত সমীরণ
ধীরে ধীরে করে তার দেহ আলিঙ্গন।
নীরবে ভ্রমিছে কত— একি রে— একি রে—
সুমুখে কি দেখিতেছি সাগরের তীরে?
রূপসী ললনা এক রয়েছে শয়ান,
প্রভাতকিরণ তার চুমিছে বয়ান—

মুদিত নয়ন দুটি, শিথিলিত কায়,
সিক্ত কেশ এলোথেলো শুভ্র বালুকায়।
প্রতিক্ষণে লহরীরা চলিয়া বেলায়
এলানো কুন্তল ল'য়ে কত না খেলায়!
বহু দিন পরে যথা কারামুক্ত জন
হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন
বহু দিন পরে হেরি মানুষের মুখ
উচ্ছ্বসি উঠিল সুখে সুরেশের বুক।
দেখিল এখনো বহে নিশ্বাসসমীর,
এখনো তুষারহিম হয় নি শরীর।
যতনে লইল তারে বাহুতে তুলিয়া,
কেশপাশ চারি পাশে পড়িল খুলিয়া।
সুকুমার মুখখানি রাখি স্কন্ধোপরে,
দ্রুত পদে প্রবেশিল কুটীরভিতরে।
কতক্ষণ-পরে তবে লভিয়া চেতন
ললিতা সুধীরে অতি মেলিল নয়ন।
দেখিল যুবক এক রয়েছে আসীন,
বিশাল নয়ন তার নিমেষবিহীন—
কুঞ্চিত কুন্তলরাশি গৌর গ্রীবা-'পরে
এলাইয়া পড়ি আছে অতি অনাদরে।
চমকি উঠিল বালা বিস্ময়ে বিহ্বল,
সরমে সম্বরে তার শিথিল অঞ্চল।
ভয়েতে অবশ দেহ, দুরু দুরু হিয়া—
আকুল হইয়া কিছু না পায় ভাবিয়া।
সহসা তাহার মনে পড়িল সকলি—
সহসা উঠিল বসি নববলে বলী।
সুরেশের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া
পাগলের মত বালা উঠিল কহিয়া,
"কেন বাঁচাইলে মোরে কহ মোরে কহ—
দুই প্রণয়ীর কেন ঘটালে বিরহ?

অনন্ত মিলন যবে হইল অদূর—
যার হতে ফিরাইয়া আনিলে নিঠুর !
দয়া কর একটুকু দুখিনীর প্রতি,
দিও না তাপসবর বাধা এক রতি—
মরিব— নিভাব প্রাণ সাগরের জলে,
মিলিব সখার সাথে নীলসিন্ধুতলে,
উপরে উঠিবে ঝড়, উর্ম্মি শৈলাকার,
নিম্নে কিছু পশিবে না কোলাহল তার !”

তৃতীয় সর্গ

মরমের ভার বহি দারুণ যাতনা সহি
ললিতা সে কাটাইছে দিন।
নয়নে নাই সে জ্যোতি হৃদয় অবশ অতি,
শরীর হইয়া গেছে ক্ষীণ।
আলুথালু কেশপাশ, বাঁধিতে নাহিক আশ,
উড়িয়া পড়িছে থাকি থাকি।
কি করুণ মুখখানি, একটি নাইক বাণী,
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত দুটি আঁখি।
যে দিকে চরণ ধায় সে দিকে চলেছে হায়,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই মনে।
গাছের কাঁটায় ধার ছিঁড়িছে আঁচল তার,
লতাপাশ বাধিছে চরণে।
একাকী আপনমনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
যাইত সে তটিনীর তীরে—
লতায় পাতায় গাছে আঁধার করিয়া আছে,
সেইখানে শুইত সুধীরে।
জলকলরবরাশি প্রাণের ভিতরে আসি
ঢালিত কি বিষাদের ধারা !

ফাটিয়া যাইত বুক, বাহুতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ'ত সারা।
কাননশৈলের পায়ে মধ্যাহ্নে গাছের ছায়ে
মলিন অঞ্চলে রাখি মাথা
কত কি ভাবিত হায়, উচ্ছ্বসি উঠিত বায়,
ঝরিয়া পড়িত শুষ্ক পাতা।
গভীর নীরব রাতে উঠিয়া শৈলের মাথে
বসিয়া রহিত একাকিনী—
তারা-পানে চেয়ে চেয়ে কত-কি ভাবিত মেয়ে,
পড়িত কি বিষাদকাহিনী!
কি করিলে ললিতার ঘুচিবে হৃদয়ভার
সুরেশ না পাইত ভাবিয়া—
কাতর হইয়া কত যুবা তারে শুধাইত,
আগ্রহে অধীর তার হিয়া—
"রাখ কথা, শুন সখি, একবার বল দেখি
কি করিব তোমার লাগিয়া?
কি চাও, কি দিব বালা, বল গো কিসের জ্বালা?
কি করিলে জুড়াবে ও হিয়া?"
করুণ মমতা পেয়ে সুরেশের মুখ চেয়ে
অশ্রু উচ্ছ্বসিত দরদরে—
ললিতা কাতর রবে রুদ্ধকণ্ঠে কহে তবে,
"সখা গো ভেব না মোর তরে!
আমারে দিও না দেখা, বিজনে রহিব একা
বিজনেই নিপাতিব দেহ।
এ দগ্ধ জীবন মোর কাঁদিয়া করিব ভোর,
জানিতেও পারিবে না কেহ!"
সুরেশ ব্যথিতহিয়া একেলা বিজনে গিয়া
ভাবিত, কাঁদিত আনমনে—
প্রাণপণ করি তার তবুও ত ললিতার
পারিল না অশ্রুবিমোচনে।

স্থরেশ প্রভাতে উঠি সারাটি কানন লুটি
তুলিয়া আনিত ফুলভার,
ফুলগুলি বাছি বাছি গাঁথি লয়ে মালাগাছি
ললিতারে দিত উপহার।
নির্ঝরে লইত জল, তুলিয়া আনিত ফল
আহারের তরে বালিকার।
যতন করিয়া কত পর্ণশয্যা বিছাইত,
গুছাইত ঘরখানি তার।

... ...

শীতের তীব্রতা সহি তপনকিরণে দহি
করিয়া শতেক অত্যাচার,
মনের ভাবনা-ভরে অবসন্ন কলেবরে
পীড়া অতি হল ললিতার।
অনলে দহিছে বুক, শুকায়ে যেতেছে মুখ,
শুষ্ক অতি রসনা তৃষায়—
নিশ্বাস অনলময়, শয্যা অগ্নি মনে হয়,
ছটফট করে যাতনায়।
ত্যজিয়া আহার পান সারা-রাত্রি-দিনমান
স্থরেশ করিছে তার সেবা,
তৃষার্ত্ত অধরে তার ঢালিছে সলিলধার,
ব্যজন করিছে রাত্রি দিবা।
নিশীথে সে রুগ্নঘরে একটি শিলার-'পরে
দীপশিখা নিভ'নিভ' বায়ে—
জ্যোতি অতি ক্ষীণতর, দু পা হয়ে অগ্রসর
অন্ধকারে যেতেছে হারায়ে।
আকুল নয়ন মেলি কাতর নিশ্বাস ফেলি
একটিও কথা না কহিয়া
শিয়রের সন্নিধানে স্থরেশ সে মুখপানে
একদৃষ্টে রহিত চাহিয়া।

বিকারে ললিতা যত বকিত পাগল-মত,
ছটফট করিত শয়ানে—
ততই সুরেশ-হিয়া উঠিত গো ব্যাকুলিয়া,
অশ্রুধারা পূরিত নয়নে।
যখনি চেতনা পেয়ে ললিতা উঠিত চেয়ে,
দেখিত সে শিয়রের কাছে
ম্লানমুখ করি নত নিস্তব্ধ ছবির মত
সুরেশ নীরবে বসি আছে।
মনে তার হত তবে এ বুঝি দেবতা হবে,
অসহায়া অবলা বালারে
করুণাকোমল প্রাণে এ ঘোর বিজন স্থানে
রক্ষা করে নিশার আঁধারে।
অশ্রুধারা দরদরি কপোলে পড়িত ঝরি,
সুরেশের ধরি হাতখানি
কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণে আঁখি তুলি মুখপানে
নীরবে কহিত কত বাণী!
রোগের অনলজ্বালা সহিতে না পারি বালা
করিত সে এ-পাশ ও-পাশ,
হেরিয়ে করুণাময় সুরেশের আঁখিদ্বয়
অনেক যাতনা হত হ্রাস।
ফল-মূল-অন্বেষণে যুবা যবে যেত বনে
একেলা ঠেকিত ললিতার।
চাহিত উৎসুকহিয়া প্রতি শব্দে চমকিয়া,
সমীরণে নড়িলে দুয়ার।
বনে বনে বিহরিয়া ফুল ফল আহরিয়া
সুরেশ আসিত যবে ফিরে—
আঁখি পাতা বিমুদিত অতি মৃদু উঠাইত,
হাসিটি উঠিত ফুটি ধীরে।
দিন রাত্রি নাহি মানি বনৌষধি তুলি আনি
সুরেশ করিছে সেবা তার।

রোগ চলি গেল ধীরে, বল ক্রমে পেলে ফিরে,
স্বস্থ হল দেহ ললিতার।
রোগশয্যা তেয়াগিয়া মুক্ত সমীরণে গিয়া
মনসুখে বনে বনে ফিরি
পাখীর সঙ্গীত শুনি সিন্ধুর তরঙ্গ গুনি
জীবনে জীবন এল ফিরি।

চতুর্থ সর্গ

বসন্তসমীর আসি কাননের কানে কানে
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালে নব যৌবনের গানে।
এক ঠাঁই পাশাপাশি ফুটে ফুল রাশি রাশি—
গলাগলি ফুলে ফুলে, গায়ে গায়ে চলাচলি।
খেলি প্রতি ফুল-'পরে সুরভিরাশির ভরে
শ্রান্ত সমীরণ পড়ে প্রতি পদে টলি টলি।
কোথায় ডাকিছে পাখী খুঁজিয়া না পায় আঁখি—
বনে বনে চারি দিকে হাসিরাশি বাস্তগান।
দুরগম শৈল যত ঢাকা লতা গুল্মে শত
তাদের হরিত হৃদে তিল মাত্র নাই স্থান।
ললিতার আঁখি হতে শুকায়েছে অশ্রুধার,
বসন্তগীতের সাথে বাজিছে হৃদয় তার
পুরাণো পল্লব ত্যজি নবকিশলয়ে যথা
চারি দিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা,
তেমনি গো ললিতার হৃদয়লতাটি ঘিরে
নবীন হরিতপ্রেম বিকশিছে ধীরে ধীরে।
ললিতা সে সুরেশের হাতে হাত জড়াইয়া
বসন্তহসিত বনে ভ্রমিত হরষমনে,
করুণ চরণক্ষেপে ফুলরাশি মাড়াইয়া।
একটি দুর্গম শৈল সাগরে পড়েছে ঝুঁকি—

অতি ক্লেশে সেথা উঠি বসিয়া রহিত দুটি,
সায়াহ্নকিরণ জলে করিত গো ঝিকিমিকি।
লহরীরা শৈল-'পরে শৈবালগুলির তরে
দিন রাত্রি খুদিতেছে নিকেতন শিলাসার।
ফুল-ভরা গুল্মগুলি সলিলে পড়েছে ঝুলি,
তরঙ্গের সাথে সাথে ওঠে পড়ে শতবার।
বিভলা মেদিনীবালা জোছনামদিরা-পানে,
হাসিছে সরসীখানি কাননের মাঝখানে,
সুরেশ যতনে অতি বাঁধি তরুশাখাগুলি
নৌকা নিরমিয়া এক সরসে দিয়াছে খুলি—
চড়ি সে নৌকার 'পরে জ্যোৎস্নাসুপ্ত সরোবরে
সুরেশ মনের সুখে ভ্রমিত গো ফিরি ফিরি,
ললিতা থাকিত শুয়ে কোলে তার মাথা থুয়ে,
কখন বা মধুমাখা গান গেয়ে ধীরি ধীরি।
কখন বা সায়াহ্নের বিষণ্ন কিরণজালে,
অথবা জোছনা যবে কাঁপে বকুলের ডালে,
মৃদু মৃদু বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ লাগি,
সহসা ললিতাহৃদি আকুলি উঠিত যদি,
সহসা দুয়েক কথা স্মরণে উঠিত জাগি,
সহসা একটি শ্বাস বাহিরিত আনমনে,
দুইটি অশ্রুর রেখা দেখা দিত দুনয়নে—
অমনি সুরেশ আসি ধরি তার মুখখানি
কহিত করুণ স্বরে কত আদরের বাণী।
মুছাইত আঁখিধারা যতন করিয়া অতি,
শরতমেঘের মত হৃদয়-আঁধার যত
মুহূর্তে ছুটিত আর ফুটিত হাসির জ্যোতি।
অমনি সে সুরেশের কাঁধে মুখ লুকাইয়া
আধো কাঁদি আধো হাসি হৃদয়ের ভাররাশি
সোহাগের পারাবারে দিত সব বিসর্জিয়া।

পঞ্চম সর্গ

নারিকেল-তরুকুঞ্জে বসিয়া দোঁহায়
একদা সেবিতেছিল প্রভাতের বায়—
সহসা দেখিল চাহি প্রাণপণে দাঁড় বাহি
তরণী আসিছে এক সে দ্বীপের পানে,
দেখিয়া দোঁহার হিয়া উঠিল গো উথলিয়া
বিস্ময়হরষ আর নাহি ধরে প্রাণে!
হরষে ভাবিল দোঁহে দেশে যাবে ফিরে,
কুটীর বাঁধিবে এক বিপাশার তীরে।
দুখ শোক ভুলি গিয়া একত্রে দুইটি হিয়া
সুখে জীবনের পথে করিবে ভ্রমণ,
একত্রে দেখিবে দোঁহে সুখের স্বপন।

উঠিল তরণী-'পরে, অনুকূলবায়ুভরে
স্বদেশে করিল আগমন—
বাঁধিয়া পরণশালা না জানিয়া কোন জ্বালা
করিতেছে জীবনযাপন।
নির্ঝর কানন নদী দ্বীপের কুটীর যদি
তাহাদের পড়িত স্মরণে,
ছুটিতে মগন হয়ে অতীতের কথা লয়ে
ফুরাতে নারিত সারাক্ষণে
আধ' ঘুমঘোরে প্রাতে পল্লবমর্ম্মর-সাথে
শুনি বিপাশার কলস্বর—
স্বপনে হইত মনে দূর সে দ্বীপের বনে
শুনিতেছে নির্ঝরঝর্ঝর!
দ্বীপের কুটীরখানি কল্পনায় মনে আনি
ভাবিত সে শূন্য আছে পড়ি,
ভগ্ন ভিতে উঠে লতা, গৃহসজ্জা হেথা হোথা
প্রাঙ্গণে যেতেছে গড়াগড়ি,
হয়ত গো কাঁটাগাছে এত দিনে ঘিরিয়াছে
ললিতার সাধের কানন—

এত দিনে শাখা জুড়ি ফুটেছে মালতীকুঁড়ি
দেখিবার নাই কোন জন।
সেই যে শৈলেতে উঠি বসিয়া রহিত দুটি,
নারিকেলকুঞ্জটির কাছে—
চারি দিকে শিলারাশি ছড়াছড়ি পাশাপাশি
তাহারা তেমনি রহিয়াছে।
মজিয়া কল্পনামোহে কত কি ভাবিত দোঁহে,
মাঝে মাঝে উঠিত নিশ্বাস,
অতীত আসিত ফিরে, গায়ে যেন ধীরে ধীরে
লাগিত সে দ্বীপের বাতাস।
একদা চাঁদিনী রাতি দুজনে প্রমোদে মাতি
গেছে এক বিজন কাননে—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা কহিতে কহিতে কথা
কত দূরে গেল আন্‌মনে।
সহসা সে বিভাবরী আইল আঁধার করি—
গগনে উঠিল মেঘরাশি,
পথ নাহি দেখা যায়, ক্ষণে ক্ষণে ঝলকায়
বিদ্যুতের পরিহাসহাসি।
প্রতি বজ্রগরজনে, ললিতা শঙ্কিতমনে
সুরেশে জড়ায় দৃঢ়তর।
অবসন্ন পদ তায় প্রতি পদে বাধা পায়,
তরাসেতে তনু থর থর।
ঝলিল বিদ্যুৎ-শিখা, ভগ্ন এক অট্টালিকা
অদূরেতে প্রকাশিল তথা—
কক্ষ এক হতে তার মুমূর্ষু আলোকধার
কহে কি রহস্যময় কথা!
চলিল আলয়-পানে দোঁহে আশ্বাসিত প্রাণে,
সহসা জাগিল নীরবতা—
উঠিল সঙ্গীতস্বর, বালার হৃদয়-'পর
প্রবেশিল দু-একটি কথা—

"পাগলিনী, তোর লাগি কি আমি করিব বল্।
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল।"

কাঁপিছে বালার বুক, নীল হয়ে গেছে মুখ,
কপোলে বহিছে ঘর্ম্মজল—
ঘুরিছে মস্তক তার, চরণ চলে না আর,
শরীরে নাইক বিন্দুবল।
তবুও অবশমনে অলক্ষিত আকর্ষণে
চলিল সে ভীষণ আলয়ে -
অঙ্গন হইয়া পার খুলি এক জীর্ণ দ্বার
গৃহে পদার্পিল ভয়ে ভয়ে।
ভগ্ন ইষ্টকের 'পরে দীপ মিট্ মিট্ করে,
বিদ্যুৎ ঝলকে বাতায়নে—
ভেদি গৃহভিত্তি যত বটমূল শত শত
হেথা হোথা পড়িছে নয়নে।
বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা
পুরুষ একটি শ্রান্তকায়—
অতি শীর্ণ দেহ তার, এলোথেলো জটাভার,
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি ভায়।
জ্যোতিহীন নেত্র তাঁর, পাতাটিও তুলিবার
নাই যেন আঁখির শকতি—
দ্বারে শুনি পদধ্বনি হৃদয়ে বিস্ময় গণি
তুলে মুখ ধীরে ধীরে অতি।

সহসা নয়নে তার জ্বলিল অনল,
সহসা মুহূর্ত্তত্তরে দেহে এল বল।
"ললিতা" "ললিতা" বলি করিয়া চীৎকার—
দু-পা হয়ে অগ্রসর কম্পবান কলেবর
শ্রান্ত হয়ে ভূমিতলে পড়িল আবার।
করুণ নয়নে অতি ললিতা-মুখের প্রতি
অজিত রহিল স্তব্ধ একদৃষ্টে চাহি—
দীপশিখা অতি স্থির, স্তব্ধ গৃহ সুগভীর,

চারি দিকে একটুকু সাড়াশব্দ নাহি।
দুই হাতে আঁখি চাপি থর থর কাঁপি কাঁপি
মূর্ছিয়া ললিতা বালা পড়িল অমনি!
বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জিল অশনি—
জীর্ণ গৃহ কাঁপাইয়া ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ, গৃহ পূরিল আঁধারে।

পথিক

প্রভাতে

উঠ, জাগ তবে— উঠ, জাগ সবে—
হের ওই হের, প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরণ গো!
নিশার ভীষণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণচরণ গো!
মাথায় বিজয়কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয়কিরণমাল,
বিজয়বিভায় উজলি উঠেছে
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল!
উষা নববধূ দাঁড়াইয়া পাশে—
গরবে সরমে সোহাগে উলাসে
মৃদু মৃদু হেসে সারা হল বুঝি,
বুঝিবা সরম রহে না তার!
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,

অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
　　হাসি সে বারণ সহে না আর !
এস এস তবে— ছুটে যাই সবে,
　　কর কর তবে ত্বরা—
এমন বহিছে প্রভাতবাতাস,
　　এমন হাসিছে ধরা !
সারা দেহে যেন অধীর পরাণ
　　কাঁপিছে সঘনে গো,
অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
　　অধীর হৃদয় মম
　　প্রভাতবিহগসম
নব নব গান গাহিতে গাহিতে
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
　　উড়িবে গগনে গো !
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
　　অতি দূর— দূর যাব,
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
　　কত শত গান গাব !
কি গান গাইবে ?　কি গান গাইব !
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হৃদয়ের গান, জীবনের গান—
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
　　অতি দূর দূর যাব !
কোথায় যাইবে ?　কোথায় যাইব !
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
　　সমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়—
কুসুমকাননে, অচল শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,

মণিমুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায় !
দেখ চেয়ে দেখ পথ ঢাকা আছে
কুসুমরাশিতে রে,
কুসুম দলিয়া যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে !
ফুলে কাঁটা আছে ? কই ! কাঁটা কই !
কাঁটা নাই— নাই— নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমনে থাকিবে ভাই !
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয় !
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয় !
ত্বরা ক'রে আয় ত্বরা ক'রে আয়,
যাই মোরা যাই চল্ ।
নিঝর যেমন বহিয়া চলিছে
হরষেতে টলমল—
নাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে,
হাসিতেছে খল খল্ !
তরুণ মনের উছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাতসমীর,
ছুটেছে কোথায় ?— কে জানে কোথায় !
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া, তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল্ ।

আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব অহরহ,
এক সাথে মোরা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমণ,
বহিছে এমন প্রভাতপবন,
হাসিছে এমন ধরা!
যে যাইবি আয়— যে থাকিবি থাক্—
যে আসিবি কর্ ত্বরা!

—

আমি যাব গো!—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান
দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো!
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়,
শতবার আশা করি শতবার ভেঙ্গে যায়—
আমি যাব গো!
সারারাত ব'সে আছি, আঁখি মোর অনিমেষ।
প্রাণের ভিতর দিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,
চারি দিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ।
ভগ্ন আশা ভগ্ন সুখ ধূলিমাখা জীর্ণ স্মৃতি।
সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে,
একটি আধটি ইঁট খসিতেছে নিতি নিতি—
আমি যাব গো!
নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায়!—
এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে পশে সুর ভয়ে ভয়ে,
প্রতিধ্বনি মৃতুল জাগায়—
তারা ভগ্ন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়!

তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি !
কত স্বপ্ন হায় !
কত দীপালোক— কত ফুল— কত পাখী !
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি !
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে !
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙা মুখ কপোলে কপোল রাখে !
কত স্বপ্ন হায় !
হৃদয় চমকি উঠি চারি দিকে চায়,
দেখে গো কঙ্কালরাশি হেথায় হোথায় !
সে দীপ নিভিয়া গেছে,
সে ফুল শুখায়ে গেছে,
সে পাখী মরিয়া গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চিরতরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চিরতরে নিমীলিত।—
আমি যাব গো !
দেখি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো !
এ ভগ্ন বীণার তন্ত্রী ছিঁড়েছে সকল আর—
দুটি বুঝি বাকি আছে তার !
এখনো প্রভাতে যদি হরষিতপ্রাণ
এ বীণা বাজাতে যাই চমকি শুনিতে পাই
সহসা গাহিয়া উঠে যৌবনেরি গান
সেই দুটি তার।
টুটে গেছে, ছিঁড়ে গেছে বাকি যত আর।
যুগ-যুগান্তের এই শুষ্ক জীর্ণ গাছে
দুটি শাখা আছে—
এখনো যদি গো শুনে বসন্তপাখীর গীত,
এখনো পরশে যদি বসন্তমলয়বায়,
দু-চারিটি কিশলয়

এখনো বাহির হয়,
এখনো এ শুষ্ক শাখা হেসে উঠে মুকুলিত,
একটি ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চায়,
ফুটো-ফুটো হয় যবে ঝরিয়া মরিয়া যায়।
এ ভগ্ন বীণার দুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ করেছে আজি গো—
নবযৌবনের গান ললিতরাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে
শ্মশানেতে হাসিমুখ শিশুটির প্রায়—
লইয়া মাথার খুলি আধ-পোড়া অস্থিগুলি
প্রমোদে ভস্মের 'পরে ছুটিয়া বেড়ায়।
তোমরা তরুণ পাখী উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখী এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমনে থাকে!
সাধ— তোমাদেরি, সাথে যায়,
সাধ— তোমাদেরি গান গায়,
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরাণো কণ্ঠ মোর
বাজিবে না সুরে?
নাহয় নীরবে রব', নাহয় কথা না কব—
শুনিব তোদেরি গান এ শ্রবণ পূরে।
এই ছিন্ন জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণপণে—
পথমাঝে শ্রান্ত যদি হই অতিশয়
তবে— দিস্ রে আশ্রয়।
পথে যে কণ্টক আছে কি ভাবিলি তার?
কত শুষ্ক জলাশয়— কত মাঠ মরুময়—
পর্ব্বতশিখরশায়ী বিস্তৃত তুষার!
কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি
ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্ত্তের জল—

হা দুর্ব্বল তুই তার কি ভাবিলি বল!
ভাবিয়া ত কাটায়েছি সারাটি জীবন,
ভাবিতে পারি না আর, জীবন দুর্ব্বহ ভার-
সহিব এ পোড়া ভালে যা আছে লিখন।
যদি প্রতি পদে পদে অদৃষ্টের কাঁটা বিঁধে,
প্রতি কাঁটা তুলে তুলে কত আর চলি!
নাহয় চরণে বিঁধি মরিব গো জ্বলি।
আমি যাব গো।

মধ্যাহ্ন

“আর কত দূর?” “যত দূর হোক্
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।”
“এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়
কণ্টক বিষম গো।”
“প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।”
“ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন কেন!
ছি ছি ছি সামান্য ব্যথায় অধীর
শিশুর মতন হেন!”
“যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।”
“তাহাই ব’লে কি আধ’ পথ হ’তে
ফিরে যেতে সাধ হয়?”
“তবে চল যাই— যত দূর হোক্
ত্বরা চল সেই দেশ—

বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"বল দেখি তবে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে ?
পাব কি আবার শ্যামল কানন
ঘন ছায়াময় গাছে ?"
"হয়ত বা পাবে হয়ত পাবে না,
হয়ত বা আছে হয়ত নাই !"
"ওই যে সুদূরে দূরদিগন্তরে
শ্যামল কানন দেখিতে পাই।"
"শ্যামল কানন— শ্যামল কানন—
ওই যে গো হেরি শ্যামল কানন—
চল, সবে চল হসিত-আনন,
চল ত্বরা চল, চল গো যাই !"
"ও যে মরীচিকা"— "ও কি মরীচিকা ?"
"মরীচিকা ?" "তাই হবে !"
"বল, বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন্ খানে তবে ?"

অবশ চরণ হেন উঠিতে চাহে না যেন—
পারি না বহিতে দেহভার।
এ পথের বাকি কত আর !
কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
ছেলেবেলা এক দিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বলেছিনু—
"সারা পথ আমাদের হবে না বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অৰ্দ্ধপথে না যাইতে যত বাল্যসখা

কে কোথায় চ'লে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্তপদে দীর্ঘ পথ ভ্রমিলাম একা।
নিরাশাপুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ?
ভগ্ন-আশাভিত্তি-'পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উনমাদ-হেন?
আঁধার কবরে সেথা মৃত ঘটনার
কঙ্কাল আছিল প'ড়ে, স্মৃতি নাম যার।
এক দিন ছিল যাহা তাই সেথা আছে,
আর কভু হবে না যা তাই সেথা আছে—
এক দিন ফুটেছিল যে ফুল-সকল
তারি শুষ্ক দল,
এক দিন যে পাদপ তুলেছিল মাথা
তারি শুষ্ক পাতা,
এক দিন যে সঙ্গীত জাগাত রজনী
তারি প্রতিধ্বনি,
যে মঙ্গলঘট ছিল দুয়ারের পাশ
তারি ভগ্ন রাশ!
সে প্রেতভূমিতে আমি ছিনু রাত্রি দিন
প্রেতসহচর!
কেহ বা সমুখে আসি দাঁড়ায়ে কাঁদিত
শীর্ণকলেবর।
কেহ বা নীরবে আসি পাশেতে বসিয়া,
দিন নাই রাত্রি নাই, নয়নে পলক নাই,
শুধু ব'সে ছিল এই মুখেতে চাহিয়া।
সন্ধ্যা হ'লে শুইতাম, দীপহীন শূন্য ঘর—
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
কেহ পায়, কেহ পাশে,
কেহ বা শিয়রে ব'সে শত প্রেতসহচর!
কেহ শত সঙ্গী ল'য়ে আকাশমাঝারে র'য়ে

ভাবশূন্য স্তব্ধমুখে করিত গো নেত্রপাত—
এমনি কাটিত দিন, এমনি কাটিত রাত !
কেন হেন দেশ ত্যজি আইলাম হা—রে—
ফুরাত জীবনদিন চিন্তাহীন ভয়হীন,
মরিয়া গো রহিতাম মৃত সে সংসারে—
মৃত আশা, মৃত সুখ, মৃতের মাঝারে !
আবার নূতন করি জীবনের খেলা
আরম্ভ করিতে কি গো সময় আমার ?
ফুরায়ে গিয়েছে যবে জীবনের বেলা
প্রভাতের অভিনয় সাজে কি গো আর ?
তবে কেন চলিলাম ?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম ?
এখন ফিরিতে নারি অতি দূর— দূর পথ,
সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাকো আর—
শ্রান্ত হইয়াছি বড়, বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই—
অতি দূর— দূর পথ— বসি একবার।

"আর কত দূর ?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ ?" "যেথা হোক্ নাক'
তবুও যাইতে হবে—
পথে কাঁটা আছে, শুধু ফুল নহে,
তাহাও জানিও সবে !
হয়ত যাইব কুসুমকাননে,
হয়ত যাইব না—

হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব,
হয়ত পাব না— ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব!
শুনিলে সকল, এখন তোমরা
কে যাইবে মোর সাথ?
যে থাকিবে থাক, যে যাইবে এস—
ধর সবে মোর হাত।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই—
বহু দূর পথ রহিয়াছে বাকি,
চল ত্বরা ক'রে যাই।"
"ও পথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে যাইব।" "পশ্চিমে যাইব।"
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হ'ল ব'লে,
অধিক সময় নাই।"

যেও না ফেলিয়া মোরে, যেও নাকো আর—
মুহূর্ত্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই,
যেও না, বড়ই শ্রান্ত এ দেহ আমার।

"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তরগামী।"
"দক্ষিণে চলিনু।" "পশ্চিমে চলিনু।"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক, যে আসিবে এস,
মোরা ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চ'লে, সন্ধ্যা হল ব'লে,
অধিক সময় নাই।"

—

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল
দক্ষিণে কেহ বা যায়, পশ্চিমে কেহ বা যায়,
কেহ বা উত্তরে চলি গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারি ধার—
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভুঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে,
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, মুদে আসে আঁখিপাতা,
অসাড় দুর্ব্বল কলেবর।
কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম?
দক্ষিণাবাতাস বহা ফুরায়েছে এ জীবনে,
হৃদয়ে উত্তরবায় করিতেছে হায় হায়—
আমি কেন আইলাম বসন্তের উপবনে?
জানিস কি হৃদয় রে, শীতের সমাধি-'পরে
বসন্তের কুসুমশয়ন?
অরুণকিরণময় নিশার চিতায় হয়
প্রভাতের নয়ন-মেলন?

যৌবনবীণার মাঝে আমি কেন থাকি আর—
মলিন, কলঙ্ক-ধরা একটি বেস্থরা তার!
কেন আর থাকি আমি যৌবনের ছন্দ-মাঝে,
নিরর্থ অমিল এক কানেতে কঠোর বাজে!
আমার আরেক ছন্দ, আমার আরেক বীণ—
সেই ছন্দে এক গান বাজিতেছে নিশিদিন।
সন্ধ্যার আঁধার আর শীতের বাতাসে মিলি
সে ছন্দ হয়েছে গাঁথা মরণকবির হাতে—
সেই ছন্দ ধ্বনিতেছে হৃদয়ের নিরিবিলি,
সেই ছন্দ লিখা আছে হৃদয়ের পাতে পাতে!
তবে কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম!
তবে যত দিন বাঁচি রহিব হেথায় পড়ি—
এক পদ উঠিব না, মরি ত হেথায় মরি—
প্রভাতে উঠিবে রবি, নিশীথে উঠিবে তারা,
পড়িবে মাথার 'পরে রবিকর বৃষ্টিধারা।
হেথা হতে উঠিব না, মৌনব্রত টুটিব না—
চরণ অচল রবে অচল পাষাণ-পারা।
দেখিস, প্রভাত কাল হইবে যখন,
তরুণ পথিক দল করি হর্ষকোলাহল
সমুখের পথ দিয়া করিবে গমন,
আবার নাচিয়া যেন উঠে না রে মন!
উল্লাসে অধীরহিয়া দুখশ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উনমাদ-হেন
ভুলিস নে— ভুলিস নে— সায়াহ্নেরে যেন!

পরিশিষ্ট

বাল্মীকিপ্রতিভা

গীতিনাট্য

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য । দস্যুগণ

কাফি

প্রথম দস্যু । আজকে তবে মিলে সবে কর্‌ব লুঠের ভাগ,
এসব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ ।

দ্বিতীয় দস্যু । কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন্‌,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা !

প্রথম । এত বড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে একি হাসি তামাসা ?
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড — খবরদার রে খবরদার !

দ্বিতীয় । হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্‌পা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নষ্ট এম্‌নি যে আকার !

তৃতীয় । এম্‌নি যোদ্ধা উনি পিঠেতেই দাগ—
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ ।

প্রথম । আর যে এসব সহে না প্রাণে, নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ, কোথা রে লাঠি কোথা রে ঢাল ?

সকলে । হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্‌পা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নষ্ট এম্‌নি যে আকার !

বাল্মীকি প্রতিভা।

গীতি-নাট্য।

বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে।

রচিত ও অভিনীত।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি দ্বারা

মুদ্রিত।

ফাল্গুন ১৮০২ শক।

মূল্য ।০ চারি আনা।

বাল্মীকির প্রবেশ

খাম্বাজ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি·মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি ?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী !
রাজা প্রজা, উঁচু নীচু, কিছু না গণি !
ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় !

পিলু

প্রথম দস্যু। এখন কর্ব্ব' কি বল্ !
সকলে। (বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব' কি বল্ !
প্রথম দস্যু। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল !
সকলে। বল্ রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি বল্ !
প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
ক'রে দিই রসাতল।
সকলে। ক'রে দিই রসাতল।
সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল—
বল্ রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি বল্ !

ঝিঁঝিট

বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্ !
অমানিশা আজিকে পূজা দেব কালীকে—
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,
বলি নিয়ে আয়।

[বাল্মীকির প্রস্থান

রাগিণী বেলাবতী

সকলে মিলিয়া। তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ !
দয়া মায়া কোন্ ছার। ছারখার হোক্ !
কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল—
প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল—
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ !

ঝংলা ভূপালি

সকলে। (উঠিয়া) কালী কালী বলো রে আজ—
বল হো, হো হো, বল হো, হো হো, বল হো—
নামের জোরে সাধিব কাজ—
হাহাহা হাহা হাহাহা হাহাহা !
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়—
জয়, জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়—
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয় !

[গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ

দেশ-বেহাগ

বালিকা। এ কি এ ঘোর বন ! এনু কোথায় !—
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না !

কি করি এ আঁধার রাতে !
কি হবে মোর, হায় !
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে—
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায় !

পিলু

প্রথম দস্যু। (বালিকার প্রতি) পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে ?
সিধে রাস্তা দেখতে চাস্ ?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, সুখে থাকৃবি বার মাস !
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ ! হাঃ হাঃ হাঃ !
দ্বিতীয় দস্যু। (প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই
কেমন সে ঠাঁই ?
প্রথম। মন্দ নহে বড়,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়—
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !
তৃতীয়। আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে !
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা। বাল্মীকি স্তবে আসীন

কানাড়া

বাল্মীকি। নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে,
মহাসমরপ্রমত্ত মাতঙ্গিনী,
কম্পে রণাঙ্গন পদভারে একি!
থরহর মহী সমুদ্র, পর্ব্বত ব্যোম,
সুরনর শঙ্কাকুল— কে এ অঙ্গনা!

[বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ]

কাফি

দস্যুগণ। দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা জালে না পড়ে ধরা!
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেল' ত্বরা!

কানাড়া

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ, হয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা ত্বরায়!
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্ দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়!

গারা ভৈরবী

বালিকা। কি দশা হ'ল আমার, হায়!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্ত্তের তরে, মা গো, দেখা দেও আমারে—
জনমের মত বিদায়!

সিন্ধু ভৈরবী

বাল্মীকি। এ কেমন হ'ল মন আমার!
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে।
পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো— সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

পরজ

প্রথম দস্যু। আরে, কি এত ভাবনা, কিছু ত বুঝি না—
দ্বিতীয় দস্যু। সময় ব'হে যায় যে!
তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো ত হ'ল না—
চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব বাহ্ রে!
বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে যা রে যা!
প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?
দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও বাহ্ রে!

বাঙ্গালী

বাল্মীকি। শোন্ তোরা শোন্, এ আদেশ—
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে!
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর' এখনি রে!

[যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য। বাল্মীকি

খাম্বাজ

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে!
কে পুরাবে মোর শূন্য এ হিয়া,
জুড়াবে প্রাণ সুধাবরিষণে!

[প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

নটনারায়ণ

দস্যুগণ। আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল চল চল এখনি যাই!

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়,
রক্তপাতে পাস্ রে ভয়—
লাজে মোরা ম'রে যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই!

[দস্যুগণের প্রস্থান

হাম্বির

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না, হায়!
হল না গো হল না হায়, হায়!

গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে ?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।
কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন— দিবস রজনী চলিয়া যায়—
দিবস রজনী চলিয়া যায়—
কত কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কি করিব জানি না গো !
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা— ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি—
কোন আর নাহি কাজ !
কি করি কি করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো,
কি করিব জানি না যে !

[ব্যাধগণের প্রবেশ ও একটি ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি লক্ষ]

সিন্ধু ভৈরবী

বাল্মীকি। থাম্ থাম্ ! কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ !
ছুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উলাসে গাহিতেছে গান !

প্রথম ব্যাধ। রাখ' মিছে ওসব কথা, কাছে মোদের এস নাক হেথা,
চাই নে ওসব শাস্তর-কথা, সময় ব'হে যায় যে।

বাল্মীকি। শোন শোন মিছে রোষ কোরো না !

ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ !

[একটি ক্রৌঞ্চকে বধ]

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

বাহার

কি বলিনু আমি !— একি সুললিত বাণী রে !
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা—
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে !
পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
একি !— হৃদয়ে একি এ দেখি !—

ঘোর অন্ধকার-মাঝে একি জ্যোতি রে !
অবাক্ !— করুণা এ কার ?

[সরস্বতীর আবির্ভাব]

ভূপালি

বাল্মীকি । একি এ, একি এ, স্থিরচপলা !
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা ।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে
আ মরি কমলপুতলা !

[দেবীর অন্তর্ধান] [ব্যাধগণের প্রস্থান

টোড়ী

বাল্মীকি । কোথা লুকাইলে ?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার !
সব গেছে চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে ?

[লক্ষ্মীর আবির্ভাব]

সিন্ধু

লক্ষ্মী । কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দুনয়নে
কিসের দুখে ?
কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি
মলিন মুখে ।
কমলা যারে চায় বল সে কি না পায়, দুখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে ।
ত্যজিয়া কমলাসনে এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে
হের গো চোখে ।

টোড়ী

বাল্মীকি। আমার কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!
তুমি ত নহ সে দেবী, কমলাসনা,
কোরো না আমারে ছলনা!
এনেছ কি ধন মান? তাহা যে চাহে না প্রাণ—
দেবি গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না
তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্, হয় হোক্—
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না, এস না, এস না এ দীনজনকুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না!

[লক্ষ্মীর অন্তর্ধান ও সরস্বতীর পুনরাবির্ভাব]

বাহার

বাল্মীকি। এই যে হেরি গো দেবী আমারি!
এবে কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জলন্ত কবিতা তারকা সবে—
এ কবিতার মাঝে তুমি কে গো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল বনে বনে একি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে—
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি!

তুমিই কি দেবী ভারতী কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ?
তুমি ধন্য গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমারি।

গৌড় মল্লার

হৃদয়ে রাখ, গো দেবি, চরণ তোমার।
এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃতরাশি—
আলোয় করেছ আলো, স্নেহের প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনবালা, অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার।
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে—
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
'হা দেবী' 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার—
হেরিব জগত শুধু আঁধার ! আঁধার !

—

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
আইনু এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্ তাহা, শোন্ !
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান !

তোর গানে গ'লে যাবে সহস্র পাষাণপ্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষন।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্‌বধূ আকুল নয়নজলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত ব'বে!
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া,
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া।
শুনিতে শুনিতে, বৎস, তোর সে অমর গীত'
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত'।
যত দিন আছে শশী, যত দিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি মহাকবি!
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবিবালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত!
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার!
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার!

গ্রন্থপরিচয়

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল।

[ ] বন্ধনী-চিহ্নে প্রদত্ত ইংরেজি তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

কবি-কাহিনী

রচনার দিক দিয়া 'বন-ফুল' পূর্ববর্তী হইলেও 'কবি-কাহিনী'ই পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা এবং ইহা একটি সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। সংবৎ ১৯৩৫ [৫ নভেম্বর ১৮৭৮] ইহা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৩। ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

কবি-কাহিনী প্রথম বৎসরের 'ভারতী'র (১২৮৪ সাল) পৌষ হইতে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। কবির বয়স তখন ষোলো বৎসর। এই পুস্তক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

এই কবি-কাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ-আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। —প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১০৮

এই উক্তির মধ্যে সামান্য একটু ভুল আছে ; রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে থাকিতে এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি বিলাত যাত্রা করেন। 'কবি-কাহিনী' ৫ নবেম্বর প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত পুস্তক তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-উল্লিখিত "উৎসাহী বন্ধু"ই 'কবি-কাহিনী'র প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

বন-ফুল

'বন-ফুল' রবীন্দ্রনাথ-লিখিত সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। ইহা ১২৮৬ সালে [৯ মার্চ ১৮৮০] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৩। ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

এই কাব্যের রচনাকাল অন্ততঃ আরো চার বৎসর পূর্বে। কারণ, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'-নামক মাসিক পত্রে (সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস) ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ

হইতে ১২৮৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, অগ্রহায়ণ সংখ্যা পত্রিকা ১৪ই ফাল্গুন প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে কয়েক সংখ্যা পত্রিকায় (পৌষ, ফাল্গুন ১২৮২; বৈশাখ, আষাঢ় ১২৮৩) 'বন-ফুল' বাহির হয় নাই।

ভগ্নহৃদয়

এই বিচিত্র নাট্য-কাব্যখানি ১৮০৩ শকে [২৩ জুন ১৮৮১] মুদ্রিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৯৬। ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

সমগ্র পুস্তক মোট ৩৪ সর্গে সমাপ্ত। ১২৮৭ সালের কার্তিক হইতে ফাল্গুন অবধি 'ভারতী' পত্রে ধারাবাহিকভাবে ইহার প্রথম ছয় সর্গ বাহির হয়।

'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—

বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। "ভগ্নহৃদয়" নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল।... 'ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো।'
—প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১২৭

এই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি 'ভারতী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে'র "উপহার"-রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময় "উপহার"টি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে।

'ভগ্নহৃদয়' স্বতন্ত্রাকারে বিলুপ্ত হইলেও ইহার বহু অংশ সংগীতরূপে রবীন্দ্রনাথের নানা সংগীত ও কাব্য -সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে। আজও গাওয়া হইয়া থাকে বা গাওয়া যাইতে পারে তাহা গীতবিতান, বিশেষতঃ উহার প্রচল তৃতীয় খণ্ড (১৩৭৬ বা ১৩৭৯), দেখিলে বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে (আশ্বিন ১৩০৩) ভগ্নহৃদয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলেও যেমন ইহার কয়েকটি গান আছে তেমনি ২২টি সর্গ হইতে (মোট সর্গসংখ্যা ৩৪) অন্যূন ২৯টি রচনাংশ, স্বয়ংপূর্ণ কবিতা হিসাবে, 'বাসকসজ্জা' 'শ্যামা' 'চাঞ্চল্য' প্রভৃতি শিরোনামে "কৈশোরক" অংশে (দ্রষ্টব্য পৃ. ৫-১৫) দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ বর্জনের অপমান এটিকে সহিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, নানা রূপে রূপান্তরে সামগ্রিক রবীন্দ্র-রচনাধারায় সূক্ষ্মভাবে ইহার সত্তা মিলিয়া মিশিয়া আছে।

রুদ্রচণ্ড

'রুদ্রচণ্ড' কবির প্রথম নাটক (গীতিনাট্য নহে)। ইহা ১৮০৩ শকে [২৫ জুন ১৮৮১] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৩। 'রুদ্রচণ্ড' পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ইহার দুইটি গান গীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত; উহাই সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারে "ফুলের ইতিহাস" নামে শিশু কাব্যে স্থান পাইয়াছে।

'রুদ্রচণ্ডে'র গান দুইটি ১৩০৩ সালে প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র "কৈশোরক" অংশে স্থান পাইয়াছিল।

কালমৃগয়া

এই গীতিনাট্য ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে [৫ ডিসেম্বর ১৮৮২] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮। বর্তমানে ইহা তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানে পুনর্মুদ্রিত।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট "অনেকগুলি গান পরিবর্ত্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে 'কাল-মৃগয়া' গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।" ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ (শনিবার) তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো-ভবনে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সম্মিলন উপলক্ষে 'কালমৃগয়া' অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন—

> বাল্মীকি-প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথকর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে ষ্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল— ইহার করুণরসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।… অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। —প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৩৯, ১৪১

'কালমৃগয়া'র প্রথম তিনটি দৃশ্যের গানগুলি এবং চতুর্থ দৃশ্যের প্রথম তিনটি গান প্রতিভাসুন্দরী দেবী -কৃত স্বরলিপিসহ ১২৯২ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'বালক' পত্রিকায় বাহির হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক। ১৮০৫ শকের ভাদ্র মাসে [১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯। ইহা অদ্যাবধি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

'বিবিধ প্রসঙ্গে'র শেষ রচনা "সমাপন" (সূচীতে "সমাপন ও উৎসর্গ", পুস্তকের জন্যই বিশেষ ভাবে লিখিত) ব্যতীত সকল প্রবন্ধই 'ভারতী'তে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।—

মনের বাগান-বাড়ি	শ্রাবণ ১২৮৮	ফল ফুল	আশ্বিন ১২৮৮
গরীব হইবার সামর্থ্য	শ্রাবণ ১২৮৮	মাছ ধরা	আশ্বিন ১২৮৮
কিন্তু-ওয়ালা	শ্রাবণ ১২৮৮	ইচ্ছার দাম্ভিকতা	আশ্বিন ১২৮৮
দয়ালু মাংসাশী	শ্রাবণ ১২৮৮	অভিনয়	আশ্বিন ১২৮৮
অনধিকার	বৈশাখ ১২৮৯	খাঁটি বিনয়	আশ্বিন ১২৮৮
অধিকার	বৈশাখ ১২৮৯	ধরা কথা	আশ্বিন ১২৮৮
আত্মীয়ের বেড়া	মাঘ ১২৮৮	অন্ত্যেষ্টিসংকার	আশ্বিন ১২৮৮
বেশী দেখা ও কম দেখা	মাঘ ১২৮৮	ক্রত বুদ্ধি	আশ্বিন ১২৮৮
বসন্ত ও বর্ষা	ভাদ্র ১২৮৮	লজ্জাভূষণ	মাঘ ১২৮৮
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল	ফাল্গুন ১২৮৮	ঘর ও বাসাবাড়ি	মাঘ ১২৮৮
আদর্শ প্রেম	ফাল্গুন ১২৮৮	নিরহঙ্কার আত্মম্ভরিতা	মাঘ ১২৮৮
বন্ধুত্ব ও ভালবাসা	ফাল্গুন ১২৮৮	আত্মময় আত্মবিস্মৃতি	মাঘ ১২৮৮
আত্মসংসর্গ	ফাল্গুন ১২৮৮	ছোট ভাব	পৌষ ১২৮৮
বধিরতার সুখ	ফাল্গুন ১২৮৮	জগতের জন্ম-মৃত্যু	পৌষ ১২৮৮
শূন্য	ভাদ্র ১২৮৮	অসংখ্য জগৎ	পৌষ ১২৮৮
স্ত্রৈণ	ভাদ্র ১২৮৮	জগতের জমিদারী	পৌষ ১২৮৮
জমা খরচ	ভাদ্র ১২৮৮	প্রকৃতি পুরুষ	চৈত্র ১২৮৮
মনোগণিত	ভাদ্র ১২৮৮	জগৎ-পীড়া	চৈত্র ১২৮৮
নৌকা	ভাদ্র ১২৮৮		

নলিনী

এই নাট্যকাব্যটি ১২৯১ সালে [১০ মে ১৮৮৪] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬। ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

নলিনীর আংশিক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে বর্তমান। ইহার আলোচনা হইতে নলিনীর রচনা সম্পর্কে কিছু তথ্যও জানা যায়; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-বিবরণ : নলিনী। বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫, পৃ. ১৭৯।

পরবর্তী 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) গীতিনাট্যের বিজ্ঞপ্তিতে 'নলিনী'র সহিত উহার সাদৃশ্যের বিষয়ে কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু উল্লেখ করা যায়, 'নলিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' উভয় রচনারই মূলগত প্রেরণা 'মায়ার খেলা'য় সার্থকভাবে পুনশ্চ সক্রিয় হইয়াছে।

শৈশবসঙ্গীত

এই কবিতাসংগ্রহ পুস্তকটি ১২৯১ সালে [২৯ মে ১৮৮৪] প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪৯। ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

'শৈশবসঙ্গীতে'র নিম্নলিখিত কবিতাগুলি 'ভারতী'তে এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।—

ফুলবালা	কার্তিক ১২৮৫	কামিনী ফুল	ভাদ্র ১২৮৭
দিকবালা	আষাঢ় ১২৮৫	প্রেমমরীচিকা	ফাল্গুন ১২৮৬
প্রতিশোধ	শ্রাবণ ১২৮৫	গোলাপবালা	অগ্রহায়ণ ১২৮৭
ছিন্ন লতিকা	অগ্রহায়ণ ১২৮৪	হরহৃদে কালিকা	আশ্বিন ১২৮৭
ভারতী-বন্দনা	মাঘ ১২৮৪	ভগ্নতরী	আষাঢ় ১২৮৬
লীলা	আশ্বিন ১২৮৫	পথিক	পৌষ ১২৮৭
অপ্সরা-প্রেম	ফাল্গুন ১২৮৫		

অতীত ও ভবিষ্যৎ, ফুলের ধ্যান, প্রভাতী, লাজময়ী —এই চারিটি কবিতা একেবারেই বর্তমান কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। তন্মধ্যে শেষোক্ত কবিতা, অবশ্য, ইতঃপূর্বে ভগ্নহৃদয়ের সপ্তম সর্গে সূচনাতেই (দ্রষ্টব্য পৃ. ১৮১-৮২) অনিলের গান-রূপে ব্যবহার করা হইয়াছিল। উভয়ে সামান্য পাঠভেদ আছে (উভয়ত্র পঞ্চম ছত্র দ্রষ্টব্য)— 'লাজময়ী' অভিনব পাঠ হিসাবেই পুনর্মুদ্রিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কাব্য গ্রন্থাবলীতে (১৩০৩। পৃ. ৮) পুনশ্চ ইহার পরিবর্তন ও ২ ছত্র বর্জন করা হয়।

বাল্মীকিপ্রতিভা

ইহা ১৮০২ শকের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্ভবতঃ বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতিনাট্যের অনুষ্ঠানপত্র-হিসাবে। 'ভারতী'র তৎকালীন প্রচ্ছদ-

পট এই পুস্তকের মলাট হইয়াছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৩। আন্দাজ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। পুস্তকটিও এই দিনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল।... আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই [বিদ্বজ্জনসমাগম] সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল —ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যেই বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল —বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।... বাল্মীকি-প্রতিভায় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের দুই এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

—প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৩৮-৪১

১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে [২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬] পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, 'কালমৃগয়া'র কিয়দংশ তখনই ইহাতে যুক্ত হয়। এই নাটিকার পরবর্তী সংস্করণ মূল রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে এবং বর্তমানে-প্রচলিত গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত গ্রন্থগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীপুলিনবিহারী সেন -সংকলিত রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী। ১৩৭৯)।

প্রথম প্রকাশকালে (১৩৪৭) রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয় রচনা করেন সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উহার কিছু কিছু তথ্য সংযোজন ও সম্পাদনা করিয়াছেন শ্রীকানাই সামন্ত ১৩৬৯ ও ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মুদ্রণে।

সংশোধন। ৩০২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নেপথ্যসংগীতে শেষ ছত্রের পূর্বে 'ফুলটির মৃদুপ্রাণ হায়' এই ষষ্ঠ ছত্র সংযোজিত হইয়াছে।

৩৫৯ পৃষ্ঠায় চতুর্দশ ছত্রে বর্তমান সংস্করণে যে পরিবর্তিত পাঠ পাওয়া যাইবে তাহাই 'ভারতী' পত্রে মুদ্রিত শুদ্ধ পাঠ।

বৈশাখ ১৩৬৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী